# নানা রূপে নানা নামে জগন্মাতা

নিগূঢ়ানন্দ

(পৃথিবীর বর্ণাত্মক মাতৃদেবীদের পরিচয়)

# নানা রূপে নানা নামে

# জগন্মাতা

(পৃথিবীর বর্ণাত্মক মাতৃদেবীদের পরিচয়)

নিগূঢ়ানন্দ

সাহিত্যম্ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

## সাহিত্যম্ প্রকাশিত
## এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

❖

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আত্মা ও পরমাত্মা

❖

মাতৃতত্ত্ব, একান্নপীঠ ও পৃথিবীর মাতৃসাধনা

## আরম্ভ কথন

ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লোকে প্রকৃতির অন্তরালে একটি বিশেষ শক্তি কাজ করে এমন বিশ্বাস করত। সেই শক্তিই প্রাকৃতিক সব ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এমন বিশ্বাস ছিল। এই শক্তিকে কেউ চিন্তা করত দেবতা জ্ঞানে, কেউ দেবী জ্ঞানে। যে যার আরাধ্য বা আরাধ্যা শক্তিকে নিজের নিজের মত করে রূপ দিয়ে পূজা করত। যারা রূপ দিতে পারত না তারা কোন একটা কিছুকে সামনে রেখে তারই মধ্যে শক্তির উপস্থিতি লক্ষ করে তাকে আরাধনা ক'রে খুশি রাখার চেষ্টা করত। যেমন, পাথর খণ্ড। এ ধরনের পূজাকেই বলে aniconic. কেউবা পাহাড়পর্বত, নদনদী, সাগর, গাছ, মৎস্য, জন্তু-জানোয়ার, কীটপতঙ্গ এ-সবের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই সব রূপের মধ্যেই সেই শক্তির পুজো করত। এর ফলে সর্বপ্রাণবাদী প্রাচীন বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞান যখন তার মধ্য বয়সে ত্রিমাত্রার জগতে তখন এ ধরনের বিশ্বাস মানুষের কাছে হাস্যকর প্রতীয়মান হয়েছিল। বিজ্ঞান আজ বহুমাত্রিক অবস্থা প্রাপ্ত হলে ত্রিমাত্রীয় বিজ্ঞানের বহু বিশ্বাস আজ ভেঙে পড়ছে। এর ফলে এমন একটা সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব ধরা পড়ছে যেখানে অফুরন্ত প্রাণ ও মানসশক্তি প্রবাহিত। অব-আণবিক জগৎ বিশ্লেষণ করাতে গিয়ে ধরা পড়েছে যে, সেখানে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনাময় মানসক্রিয়া চলেছে। এই মানসক্রিয়া বিশ্বের সর্বত্রই প্রবহমান। সুতরাং প্রকৃতির অন্তরালে একটি মানস শক্তি যে বিরাজমান— প্রাচীনদের, বর্বরদের ও অসভ্যদের সেই চিন্তা আজ অবহেলায় দূরে ঠেলে ফেলে দেবার নয়। সেই মানস শক্তি, জড়ে অজড়ে, প্রাণে অপ্রাণে সর্বত্রই রয়েছে। যে যে কামনা করে, যা কামনা করে, সেই আকাঙ্ক্ষিত জিনিষের অন্তস্থ মানস শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তা পেয়ে যায়। ইদানিং বৃক্ষাদির মানস শক্তির সঙ্গে সপ্রেম সম্পর্ক স্থাপন করে দেখা গেছে যে, তারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দ্রুত ফল দান করে। বড় বড় সাধকেরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করতে পারতেন প্রকৃতিশক্তির সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্থাপন করে। অজটিল প্রাচীন মন হয়তো সহজেই সেই প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল। মানসক্রিয়ার মাত্রাকে যে যে স্তরে রাখতে পেরেছিল— প্রকৃতির সেই সেই স্তরের সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল। তাদের চিন্তা-মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী

প্রকৃতিশক্তি নানা রূপে, নানা নামে তাদের কাছে ধরা পড়েছিল। সেইসব চিন্তা তরঙ্গ নিয়েই পৃথিবীতে দেশে দেশান্তরে নানা দেবদেবী আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ভারতীয়রা সমগ্র প্রকৃতিকেই মহিলাত্মিকা বলে মনে করেন। যে শক্তি দ্বারা এই প্রকৃতির সৃষ্টি সেই শক্তিকেই তাঁরা মনে করতেন মহিলা-শক্তি। মহিলা-শক্তি সেই শক্তি— যার লীলার এক সময় শেষ আছে। পুরুষ হলেন সেই অবস্থা যার কোনদিন কোন ভাবেই রূপান্তর ঘটেনা। তিনি পূর্ণ। ভারতীয়রা মহাশূন্যতাকেই সেই পুরুষরূপে কল্পনা করেছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই অবর্ণনীয় পুরুষের অব্যক্ত ইচ্ছার বেগে সৃষ্ট। যেখানে রূপ আছে, সেখানেই তা সীমিত। রূপের উদ্ভব আছে, বিকাশ আছে, লয়ও আছে। কিন্তু সেই অরূপ, অসীম, অব্যয়ের অর্থাৎ পুরুষের কোন বিকার নেই, লয়ও নেই। কিন্তু রূপের কল্পনার মধ্যে, রূপের মধ্যে যেসব দেবদেবী আছেন— তাঁদের লয় আছে। দেব-দেবীরাও অমর নন। তাঁদের বিভিন্ন মাত্রার অবস্থান হেতু কেউ কেউ দীর্ঘ, দীর্ঘতর বা দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী এই যা।

ভারতীয় তন্ত্র-দর্শনে শূন্যতার বুকে অব্যক্ত কারণে আলোড়নের ফলে জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানও আজ বলছে যে, Total energy of the universe is absolute zero. অর্থাৎ শূন্যতা থেকেই সবকিছুর আবির্ভাব হয়েছে— বিজ্ঞান আজ সে-রকম মনে করে। যে অব্যক্ত আলোড়নে অরূপ থেকে রূপের প্রকাশ ঘটেছিল তা হল শূন্যতার অভ্যন্তরস্থ আবেগের বিস্ফোরণের ফলে জাত তরঙ্গের জন্য। এই তরঙ্গগুলিই হল শক্তির এক একটি ধাপ। বিস্ফোরণের শব্দ থেকেই এই তরঙ্গগুলির উদ্ভব হয়েছিল। সেই শব্দই ভারতীয় ওঁ, শব্দ ব্রহ্মাণ। তন্ত্রমতে একান্নটি বর্ণতরঙ্গে জগতের সৃষ্টি হয়েছিল। একান্নতম তরঙ্গে অণু আত্মপ্রকাশ করে। অণু-পরমাণুর পারস্পরিক যোগে বস্তু জগতের সৃষ্টি হয়। এই একান্নটি তরঙ্গই সংস্কৃত একান্নটি বর্ণ। আদি বর্ণ উচ্চারণের বাইরে। আর পঞ্চাশটি উচ্চারিত ও প্রতীকী রূপময়। তরঙ্গবাহিত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই উৎপত্তির কথাই একান্ন শাক্তপীঠরূপী রূপক গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই বর্ণগুলির অপরিসীম ক্ষমতা। পারস্পরিক যোগাযোগে অসংখ্য ভাব তৈরি করতে পারে। সেই কারণেই ভাষা প্রাণশক্তিময় ও ক্রমবর্ধমান। এই একান্নটি বর্ণের প্রত্যেকটির অন্তরালে শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় অবস্থিত। সেই মাত্রাগুলি বিভিন্ন নাম ও রূপ লাভ করেছে। তাই বর্ণের সাহায্যে কোন পুরুষদেবতা রূপ এসে থাকলে মূলত তিনিও প্রকৃতিভুক্ত ও পুরুষ-প্রকৃতি মাত্র। মাতৃরূপে এলে তিনি নারী-প্রকৃতি। মূলত এই শক্তি মহিলাত্মিকা শক্তি। সেই জন্য পৃথিবীর মাতৃসাধনা সম্পর্কে আলোচনাকালে বর্ণের ভিত্তিতেই সেই আলোচনা করার চিন্তা ক'রে আমি প্রথম গ্রন্থটি লিখেছি— যার নাম 'মাতৃতন্ত্র, একান্নপীঠ ও পৃথিবীর মাতৃসাধনা'। ঐ গ্রন্থে

একান্ন পীঠের উদ্ভব ও বর্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি দেখিয়ে স্বর বর্ণাত্মিকা মাতৃদেবীদের একটি পরিচয় দিয়েছি। এই মাতৃদেবীরা পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, তাঁদের সম্পর্কে অফুরন্ত কৌতূহল সৃষ্টি হয়। সুতরাং স্বরবর্ণাত্মিকা মাতৃদেবীদের পরিচয় দেবার পর লেখকের কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। বর্ণের ভিত্তিতে মাতৃদেবতাদের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধরবার অসম্ভব ইচ্ছা জাগে। সেই কারণেই দুঃসাহস করে ব্যঞ্জনবর্ণাত্মিকা মাতৃদেবীদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি জন্ম যায় ব'লে ও আনন্দ মেলে ব'লে।

এই মাতৃদেবীদের পরিচয় দিতে গিয়ে দেখেছি যে, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দেশে, তাদের চিন্তা-মাত্রার তারতম্য হেতু বিভিন্ন নামে ও রূপে তাঁদের কল্পনা করেছেন। সেই বিভিন্ন নাম ও রূপ রীতিমত কৌতুকাবহ। সেই জন্য ব্যঞ্জন-বর্ণাত্মিকা মাতৃদেবতাদের পরিচয় গ্রন্থে গ্রন্থটির নামকরণ করা হল— 'নানা রূপে নানা নামে জগন্মাতা'। অর্থাৎ সেই মাতৃশক্তি জগন্মাতা যার চোখে যে রূপে যে নামে ধরা পড়েছিল তার পরিচয়।

প্রকৃতপক্ষে একা কোন ব্যক্তির পক্ষেই একাজ অসম্ভব। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যে আমি রচনা করছি এ দাবি করছি না। বহু রূপ ও বহু নাম হয়তো বাকি থেকে যাচ্ছে। এ শুধু আরম্ভ। পরবর্তী কেউ এসে আরও বহু রূপ ও নামের অসংখ্য মাতৃদেবতা এতে যুক্ত ক'রে কলেবর বৃদ্ধি করবেন। সেই অপূর্ণ রূপ, নাম, তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য আমন্ত্রণ রইল। সকলের চেষ্টায় বিশ্ব'মায়ের পরিচয় সর্বাঙ্গীন হোক।

ব্যঞ্জনবর্ণাত্মিকা মাতৃদেবতাদেরও সমগ্র পরিচয় বর্তমান গ্রন্থটিতে দেওয়া গেল না। মহামায়ার করুণা হলে ম-বর্ণ থেকে বাকি বর্ণগুলি নিয়ে শেষ খণ্ডটি আগামী পুস্তক মেলায় বা তার আগেই প্রকাশ করব। পাঠক পাঠিকাদের আন্তরিক পঠন ও সহযোগিতা আশা করছি। কিন্তু সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

বিনীত
লেখক

# পৃথিবীর ব্যঞ্জন বর্ণাত্মক মাতৃ দেবতা

## ক

১। **ক্যাল্লিস্টো-আর্টেমিস :** প্রাচীন গ্রীসের আর্কেডিয়ান পুরাণ-কাহিনীতে ক্যালিস্টো ভালুকে রূপান্তরিতা হয়েছিলেন। আসলে তিনি গ্রীকদেবী আর্টেমিসেরই এক ভিন্নরূপ। দেবী আর্টেমিস যে ভালুক পূজার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্টেমিসকে এমন কতকগুলি উৎসবে পূজা করা হত যা দেখে মনে হয়— প্রাচীন কালে দীক্ষা নেবার সময় যে উৎসব করা হত এ তারই সঙ্গে যুক্ত। এই উৎসবে কিশোরী মেয়েরা নৃত্য করত। এদের বয়স ছিল পাঁচ থেকে দশের মধ্যে। অনুষ্ঠানটি ছিল পঞ্চবার্ষিকী। এই অনুষ্ঠান না করলে কোন মেয়েরই বিবাহ হতে পারত না। এই উৎসবে অনেক সময় ভালুক বলি দেওয়া হত। তবে সাধারণতঃ বলি দেওয়া হত ছাগল বা হরিণী।

ভালুক পূজোর ধারা এসেছিল পশুপূজার ধারা থেকে। এই পশুপূজার ধারা এসেছিল দুটি বিশ্বাস থেকে, যেমন, শিকারের পশু পাবার জন্য ও নানা পশু থেকেই মানব প্রজাতির নানা ধারা এসেছে এরকম মনে করার জন্য, অর্থাৎ পশুকে অভিজ্ঞান হিসেবে ধরে নিয়ে পূজা করার জন্য। পশু-পূজার এই প্রথা থেকে পশুতে মনুষ্যাকৃতি বা মানব জাতির গুণ আরোপ করা হত। শক্তিকে প্রাচীন মানুষের অনেকেই মহিলাত্মিকা বলে মনে করতেন। এই জন্যই ভারতবর্ষে শাক্ত দেবীদের এত প্রাধান্য, যেমন, 'কালী', 'দুর্গা' ইত্যাদি। তবে ভালুকদেবী হিসেবে শক্তিপূজো প্রাচীন কেল্ট জাতির মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। অরটিও নামে তাদের এক উল্লেখযোগ্য ভালুকদেবী ছিলেন।

২। **কমেনি :** প্রাচীন কালে অনেকেই প্রাচীন কিছু ঝোপ ঝাড়ের পূজো করত। এই ধরনের ঝোপ ঝাড়কে ভাল বাংলায় বলে কুঞ্জ। আমাদের দেশে বৃন্দাবনেও এমন কিছু কুঞ্জ ছিল। বৃন্দাবন শব্দটির মধ্যেই এমন ধরনের বিশ্বাস জড়িয়ে আছে। বৃন্দাবন অর্থ একদল দেবীর কুঞ্জ। কমেনি এমনই কোন এক দেবী। প্রাচীন রোমানরা কুঞ্জ পূজা করতেন। দুটি বৃক্ষতো তাদের কাছে খুবই বিখ্যাত ছিল,— ক্যাপিটোলাইন-এর ওক্ বৃক্ষ ও প্যালাটাইনের ডুমুর জাতীয় বৃক্ষ। ওক্ বৃক্ষ ছিল জুপিটারের প্রতীক। ডুমুর জাতীয় বৃক্ষ রুমিনালিসের প্রতীক।

বসন্তের শক্তি নুমিনা ছিলেন দুঃখ নাশিকা ও আরোগ্য দায়িকা দেবী। আরোগ্যের দেবী হিসেবে জুতুরনা ছিলেন আরও বিখ্যাত। তাঁর পরেই জনপ্রিয়তায় স্থান ছিল 'কমেন্নি'। বিশ্বাস ছিল যে, তিনি স্বাভাবিক ভাবে শিশু সন্তানের জন্মদানে সাহায্য করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন। কাব্যের দেবী হিসেবেও তিনি রোমানদের কাছে শ্রদ্ধা পেতেন। যেমন আমাদের দেবী সরস্বতী, মূলতঃ তিনিও ছিলেন তেমনিই বসন্তের দেবী। আমাদের দেশে বাসন্তিবাস পরা বাগ্‌দেবীকে দেখেও মনে হয় বসন্তের সঙ্গে তাঁরও নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

৩। **করমেনটিস্ :** রোমান সঙ্গীতাদি ও কারুকলাদির দেবীদের মধ্যে সর্বপ্রধানা ছিলেন দেবী করমেনটিস। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং আমাদের দেশের বিধাতার মত নবজাতকের ললাটে তার ভাগ্য লিখে দিতেন। দেবী ষষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর কিছু মিল আছে।

৪। **করণা :** ইনি প্রাচীন রোমের এক আরোগ্যের দেবী। তাঁর বাসস্থান পাহাড়ে। সুস্বাস্থ্যের জন্য এঁকে উপাসনা করা হ'ত। তিনি কতকগুলি জাদুক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। স্ট্রিজেস নামে এক ধরনের রক্তলিপাসু শিশুভূতকে তিনি শিশুদের দেহ থেকে তাড়িয়ে দিতেন। এ জন্য এক ধরনের গাছের ডগা দিয়ে তিনবার খৃষ্টীদের বাড়ি ঢোকার পথ স্পর্শ করতেন। এক হাতে দু'মাস বয়সের এক শূকর ছানার নাড়িভুঁড়ি ধরে বাড়ির উঠানে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিতেন। তারপর এক ধরনের মন্ত্র আওড়াতেন। সব শেষে রুগীর গৃহের জানালায় হ্যাথোর্ন গাছের ডাল ঝুলিয়ে দিতেন যাতে রোগ নিরাময় হয়। এ দেবী ছিলেন সম্পূর্ণই রোমানদের লৌকিক দেবতা। আমাদের দেশে যেমন শীতলা, মা ষষ্ঠী, পঞ্চানন ঠাকুর প্রমুখ আঞ্চলিক দেবদেবী আছেন তেমনই। শীতলার মূর্তি যদি বিশ্লেষণ করা যায়— তাহলে এই ধরনের জাদুক্রিয়ার সঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যাবে। এক্ষেত্রে করণার সঙ্গে শীতলার বেশ মিল রয়েছে।

৫। **কেরিডোয়েন :** ইনি এক কেল্ট দেবী। বাস করতেন লেক-টেজিড-এ। স্বামীর নাম টেজিড ভোয়োল। তাঁদের সন্তান অবাগ্‌দু এত কুৎসিৎ ছিলেন যে দেবী কেরবিডোয়েন তার রূপ পরিবর্তনের জন্য জাদু কড়াইয়ে এক ধরনের ঔষধ তৈরি করার প্রয়াস চালান। এই ঔষধ জ্বাল দিতে হবে এক বছর একদিন ধরে। জ্বালাতে জ্বালাতে ঔষধির তলানী এত কমে যাবে যে, মাত্র তিন ফোঁটা অবশিষ্ট থাকবে। এই জীবনীশক্তি বর্ধক সুরা নাড়বার ভার পড়ে গুইওন-এর উপর। ভুলক্রমে এই ঔষধ পেয়ে যান গুইওন নিজেই।

কেরিডোয়েন-এর জাদু কড়াইয়ের তিনটি গুণ ছিল,— অক্ষয়ত্ব, প্রেরণা ও নবজীবন। এই জন্য যে সব কেল্টিক দেবতা এই জাদুকড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের উর্বরা শক্তির দেবতা বা দেবী রূপে কল্পনা করা হ'ত। দেবীদের

সঙ্গেই এই কড়াইয়ের যোগ ছিল বেশি। কারণ, মায়েরা জন্ম দিতেন বলে তাঁদের উর্বরাশক্তির প্রতীক বলে ভাবা হ'ত। এ থেকেই পৃথীমাতার কল্পনা এসেছিল। কেল্টদের জাদু-কড়াই হিন্দু চিন্তার যোনি তুল্য। কেরৃরিডোয়েন-এর মত ব্রানওয়েন নামে হ্রদের এক দেবী ছিলেন। গল্প আছে ব্রানওয়েনের ভাই ব্রান, আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজাকে এই ধরনের একটি কড়াই উপহার দিয়েছিলেন। এই কড়াইতে কোন নিহত ব্যক্তিকে ছুড়ে দিলে সে পরদিন আবার বেঁচে উঠতো। একটি হ্রদ থেকে উঠে জনৈক মানব ও জনৈকা মানবী এই কড়াইটি ব্রানকে দিয়েছিলেন।

'অবগাদ্দু'র জন্য তৈরি প্রাণদায়িকা সুরা গুইওন নিজে খেয়ে ফেললে কেরৃরিডোয়েন ভয়ানক রেগে যান। তাঁর ক্রোধাগ্নি থেকে বাঁচার জন্য গুইওন পালাতে শুরু করেন। নিজেকে লুকাবার জন্য গুইওন গমের দানার রূপ ধরেন। দেবী কেরৃরিডোয়েন মুরগির রূপ ধরে তাকে খেয়ে ফেলেন। পরে তাকে জন্ম দিয়ে সমুদ্রে ছুড়ে দেন। সেখানে সে ট্যালিজিন নামে পরিচিত হয়। আসলে গল্পটি কেল্টদের জন্মান্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। দেবী কেরৃরিডোয়েন-এর এই কাহিনী সম্ভবতঃ ডাইহ্ নদীর মোহনার দক্ষিণ-অঞ্চলস্থ কোন স্থানে রচিত হয়েছিল। কেরৃরিডোয়েন ও টেজিড ছিলেন স্বাঁন্না নদীর তলদেশের দেবদেবী। তাদের কড়াই ছিল স্বর্গের রহস্যময় কড়াই। এই কড়াই জল-জলাভেরও ইঙ্গিতবহ।

কেল্টিক কাব্যে কেরৃরিডোয়েনকে যেমন জীবনীশক্তিপ্রদায়িনী দেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে তেমনই কাব্যের দেবী হিসেবেও বন্দনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ চারণ-কবিরা তাঁর গুণকীর্তন করতেন। কড়াই বা কটাহ ছিল প্রেরণার প্রতীক মাত্র। আরও প্রাচীন যুগে এই কড়াই ছিল উর্বরাশক্তির প্রতীক। সুতরাং অনেকে সেইজন্য কেরৃরিডোয়েনকে উর্বরাশক্তির দেবী বলে মনে করেন। হয়তো বা উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে তিনি ছিলেন আইরিশ ব্রিগিট-এর মত পৃথ্বী মাতা। তাঁর সঙ্গে পশু হিসেবে যুক্ত ছিল শূকর ছানা। এই পশুকে পূর্বে শস্যশক্তি হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। পরে শূকর ছানাটি উর্বরাশক্তির দেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়। গুইওন যে জাদু-কড়াই থেকে প্রাণদায়িনী সুরা পান করেছিলেন তাকে অনেকে দেবতাদের জগৎ থেকে প্রাণদায়িনী বিদ্যা চুরি করে আনার স্মারণিকা বলে মনে করেন। ট্যালিজিনকে অনেকে কেরৃরিডোয়েন-এর সন্তান বলে মনে করেন, যেমন, ওগমা ছিলেন ব্রিগিট-এর সন্তান। ট্যালিজিনও কাব্যের দেবতা ছিলেন। আসলে কেরৃরিডোয়েন-এর গুণই পরবর্তী কালে তাঁর উপর বর্তেছিল।

৬। **কোমেডোবি** ঃ কোমেডোবি হলেন কেল্টদের একদল নদীদেবী। নদী-তন্ত্রের সঙ্গে এরা যুক্ত। নদীমাতা বিরাট অঞ্চল প্লাবিত করে উর্বর করে তুলতো। এই ব্যাপক ক্ষমতার জন্য নদী-শক্তিকে একদল দেবীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

কোনেডোবি এই ধরনেরই আঞ্চলিক কোন মাতৃদেবীগোষ্ঠী ছিলেন। পরে নানা স্থানেই পুরুষ দেবতারা এসে তাঁদের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। তবে শক্তি হিসেবে মাতৃদেবীদের অস্তিত্ব ছিল দেবতাদেরও পূর্বের। পরবর্তী কালে পূজার বেদীতে পুরুষ দেবতারা প্রাধান্য বিস্তার করে বসলেও সর্বত্রই মাতৃদেবীদের একেবারে হটিয়ে দিতে পারেননি। কোনেডোবি মাতৃদেবী-গোষ্ঠী তারই সাক্ষ্য দেয়।

৭। **কনকরডিয়া ঃ** ইনি একজন রোমান দেবী। খ্রীঃ পূর্ব ৩৬৭ অব্দে প্রথম তাঁকে লক্ষ্য করা যায়। এই সময় ডিক্টেটর এম. ফিউরিয়াস ক্যামিলাস, যেরাম-এর উত্তর প্রান্তে প্লেবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবসানের স্মরণিকা হিসেবে এই দেবীর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। খ্রীঃ পূর্ব ১২১ অব্দে গ্রাক্কি সংক্রান্ত একটি গোলমালের শেষে এল. অপিমিয়াস মন্দিরটি পুনরুদ্ধার করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর ১৬ই জানুয়ারী টাইবেরিয়াস নতুন করে এই মন্দিরটি 'কনকরডিয়া অগাস্টা'-র নামে উৎসর্গ করেন। এই সময়ই এসকুইলাইন-এ লিভিয়া পোর্টিকাস, লিভিয়াতে এই দেবীর উদ্দেশে একটি বেদী নির্মাণ করেন।

দেখা যায়- খ্রীঃ পূর্ব ২১৮ অব্দে গল বিদ্রোহের সময় প্রিটর এল. ম্যানিলাস কনকরডিয়ার উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথা মত খ্রীঃ পূঃ ২১৬ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী ক্যাপিটোলাইনে কনকরড মন্দিরের কাছে একটি ছোট বেদী নির্মাণ করা হয়। এখানে খ্রীঃ পূর্ব ৪০৪ অব্দে মূল কনকরড মন্দিরের কাছে আগেই এ উদ্দেশে একটি বেদী নির্মিত হয়েছিল। খ্রীঃ পূর্ব ১৬৪ অব্দে মার্সিয়াস ফিলিপ্পাস দেবীর একটি মূর্তি বসান। উদ্দেশ্য ছিল পূর্বেকার বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে যেন শান্তি ফিরে আসে। খ্রীঃ পূর্ব ৪৪ অব্দে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে ভেবে সিনেট সীজারের সম্মানে কনকরডিয়া নোভার একটি মন্দির নির্মাণের আদেশ দেয়। খ্রীঃ পূর্ব- ১০ অব্দে অগাস্টাস কনকরডিয়ার উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে তাতে মূর্তি স্থাপন করেন। খ্রীস্টীয় ১৬ অব্দে স্ক্রিবোনিয়াস লিবো আত্মহত্যা করলে সিনেট কনকরডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে পূজো দিয়েছিল। সম্রাট নিরো কনকরডিয়ার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন। রাজকীয় মুদ্রায় তাঁর মূর্তি ছাপানো হত। ক্রমে ক্রমে কনকরডিয়া পূজা রোমান সাম্রাজ্যের নানা অংশে নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কোন নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাই রূপ ধরে কনকরডিয়া দেবীর রূপ নিয়েছিল।

৮। **কেটিইট্রো, কোটাইটো, কোটিস ঃ** ইনি গ্রীক জগতে প্রাচীন থ্রেসের এক দেবী। ইনি পবিত্র বারি সিঞ্চন করে পূত করাতেন। পূতকরণের ভাবটাই এখানে দেবী রূপে খোদিত হয়ে আছে। প্রাচীন কালে নানা ভাবে নানা দেশে দীক্ষার সময় লোককে শুদ্ধ করা হত— আমাদের দেশে যেমন পবিত্র গঙ্গাজলে

শুদ্ধ করা হয়। বহুদেশে পবিত্রকরণের নানা পদ্ধতি আছে। বর্বরদের মধ্যে দেখা যায় কোথাও দেহ শুদ্ধ করার জন্য সারা দেহে কাদা লেপে দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার কিছু আদিবাসী ও ফিজির আদিবাসিদের মধ্যে দেখা যায়, দীক্ষার সময় সারাদেহ কাঠকয়লা দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে কাদা। সব শেষে দেহ ধুইয়ে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম আফ্রিকার নানা স্থানেও এই ধরনের পুঃতকরণের পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। নামকরণের সময়ও এই ভাবে জাতককে শুদ্ধ করা হয়। এ-সময় দেহ থেকে ময়লা ও কাদা ধুয়ে দেওয়ার অর্থ হল প্রাক্তন জীবন থেকে নতুন জীবনে প্রবেশ করানো। পবিত্র জলে স্নান করে শুদ্ধ হওয়াতো একটি সার্বিক ব্যাপার। এই শুদ্ধিকরণ ব্যাপারটিকেই রূপ দান করে প্রাচীন গ্রেসে কোটাইটো বা কটাইট্রো বা কোটিস দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল।

৯। ক্রিব্রবি : ইনি প্রাচীন কেল্টদের এক দেবী। দেবী কেররিডোয়েন ও দেবতা টেজিড ভোয়েল-এর কন্যা। তার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শকদের তিনি চিত্তহরণ করেন বলে গল্প আছে। এ দেখে মনে হয় তিনি ছিলেন 'প্রেমের দেবী'। তাঁর এই ভূমিকা ভারতবর্ষে পালন করতেন কাম বা মদন দেব। তবে ভারতবর্ষে মদনদেব কখনও পূজার বেদীতে স্থাপিত হননি। তাঁর সহধর্মিণী রতিও পূজা পাননা।

১০। কুলসু লেপার্নি : ইনি ইটালীর প্রাচীন ইউট্রাসকানদের এক মৃত্যুদেবী।

১১। কদেশ : ইনিই ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিতা অস্টোরেথ দেবী। গ্রীকরা এঁকে অস্টার্টে বলতেন। কি ভাবে এই নামের উৎপত্তি তা জানা যায় না। তবে তাঁর কাজের ধরা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি ছিলেন যৌন প্রণয় ও জন্মদায়িনী দেবী। এই দেবীরই এক নাম ছিল কদেশ। কদেশ-এর অর্থ মন্দিরের বারবনিতা। তাঁর মূর্তির মধ্যে অ-মিশরীয় প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সিংহের উপর। ভারতের দেবী কালীর মত তিনি নগ্না। বস্ত্র পরানো হলেও তা আটসাঁট, যেন দেহে লেগে রয়েছে। তাঁর এক হাতে রয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্ম। আর এক হাতে সর্প। তাঁর মধ্যে যে আকর্ষণী গুণ ও ধ্বংসের গুণ দুইই রয়েছে তা বোঝানোর জন্যই দু'হাতে দু'-ধরনের প্রতীক দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে একসঙ্গে রেশেফ্ ও ইথাইফ্যাল্লিক মিনের সঙ্গে তৃতীয় সত্তা হিসেবে দেখা যায়। ব্যাবিলনীয় শাস্ত্রে তাকে অমরুরু-হাদাদ-রেশেফ্ পত্নী হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তিতে এই দেবীকে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় ধরনের যে মূর্তি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি লম্বা ধরনের উষ্ণীষ পরে আছেন। গলায় রয়েছে হার। পায়ে নূপুর বা খাড়ু এবং কোমরে মেখলা। দেবীর দুইহাত রয়েছে কুচযুগের উপর। তৃতীয় ধরনের যে মূর্তি তাঁর পাওয়া যায় তাতে তাঁকে দেখা যায় শৃঙ্গমণ্ডিত অবস্থায়। দেখতে অনেকটা মিশরের দেবী হ্যাথরের মত। চতুর্থ ধরনের মূর্তিতে দেখা যায় তাঁর ঠোঁট পাখির

ঠোঁটের মত। কানে রয়েছে বড় দুল। এখানে দেবীর উপর সাইপ্রাস দ্বীপের ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। পঞ্চম ধরনের মূর্তিতে দেবীকে ঘোমটাবৃত অবস্থায় দেখা যায়। এই মূর্তিতে হিত্তিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন কন্নানবাসীদের কাছে এই দেবীর বিশেষ ধরনের মর্যাদা ছিল, যেমন বাঙ্গালীর কাছে মা কালীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যে জন্য দেবী কালিকা বাঙ্গালীর বিশেষ আরাধ্যা হিসেবে শাস্ত্রে উল্লেখিতা হয়েছেন, যেমন, 'কালিকা বঙ্গ দেশেচ'।

১২। **ককেৎ :** ইনি প্রাচীন মিশরের এক দেবী। তিনি ককুর সহধর্মিণী। ককু অর্থ অন্ধকার। ককেৎ হল মহিলা অন্ধকার। মিশরীয় সৃষ্টি-তত্ত্বে চার জোড়া ব্যাঙ ও সর্প-মস্তিষ্ক যুক্ত দেবদেবী আছেন। এই চার জোড়া দেবদেবীর মধ্যে ককু ও ককেৎ হল এক জোড়া। সব মিলিয়ে আছেন আটজন দেবদেবী। (১) ককু ও (২) ককেৎ-এর পর আর বাকি ক'জন হলেন (৩) নুনু (পুরুষাত্মক আদি সলিল বা আদি মানস শক্তি), (৪) নুনেৎ (মহিলাত্মিকা আদি মানস শক্তি), (৫) হেহ (পুরুষাত্মক দেশশক্তি), (৬) হেহৎ (মহিলাত্মিকা দেশ শক্তি), (৭) নি-উ (ঋণাত্মক পুরুষ শক্তি) ও (৮) নিনুৎ (ঋণাত্মিকা মহিলা শক্তি)। মিশরীয় অষ্টাদশ রাজবংশের সময় এদের উদ্দেশে পূজো দেওয়া হ'ত। এই চার জোড়া দেবদেবীর মধ্যে চারটি মহিলা শক্তিকে যদি দেখা যায় তাহলে ককেৎ-কে ঋগ্বেদের রাত্রি সূক্তের দেবী বলে মনে হবে, যাঁকেই পরে আদ্যাশক্তি কালী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে ব'লে ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা মনে করেন। নুনেৎ-কে ভারতীয় ব্রহ্মাণী বলেও কল্পনা করা যেতে পারে। হেহৎকে কল্পনা করা যেতে পারে ভারতীয় তন্ত্রের দেশশক্তি তারা হিসেবে। নিনুৎকে পিতামহ ব্রহ্মার সহধর্মিণী সরস্বতী বা সাবিত্রী রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। কিংবা অর্ধনারীশ্বরের নারী অংশ বা দেবী দুর্গা রূপে কল্পনা করা যেতে পারে, যিনি আদি অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত অবস্থা সৃষ্টি করেন। ইনিই নিগেটিভ চার্জ সম্পন্ন ইলেক্ট্রন। এদের নিয়েই প্রাচীন মিশরে ওগদোয়াদ (OGDOAD)-এর কল্পনা করা হয়েছিল। এই ওগদোয়াদ-এ ছিলেন চারজন পুরুষ দেবতা— নুনু, হহ, আমোন ও কুক এবং তাঁদের প্রত্যেকের মহিলাত্মিকা শক্তি।

১৩। **কালী :** ভারতে শাক্ত তন্ত্রের ইতিহাসে কালী এক বিশেষ ধরনের দেবী। তিনি আদ্যা শক্তি বা Primordial Energy. বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখতে গেলেও মহৎভাবে উদ্ভাসিতা। তাঁর সেই মহান দিকটি আলোচনার আগে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁকে কি ভাবে দেখা হয়েছে আই লক্ষ্য করে নেওয়া যাক।

সাধারণ দৃষ্টিতে ঐতিহাসিকেরা কালীকে অসভ্য বর্বরদের চিন্তাজাত এক দেবী বলে মনে করেন। পূর্ব ভারতের নানা প্রান্তে গ্রামদেবী হিসেবে তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁকে ভয়ঙ্করী দেবী হিসেবেই দেখা হয়। রোগ শোক মহামারী দেখা দিলে এই

দেবীকে শান্ত করার জন্য গ্রামের থানে তাঁর পূজা দেওয়া হয়।

কালী পুজার ধরা নিম্নতম পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এখানকার আদিবাসীরা গ্রামদেবতা হিসেবে কালী পূজা করেন কালো পাঁঠা বলি দিয়ে। ভোগ দেওয়া হয় ভাত, কলা ও নানা প্রকার ফলমূল দিয়ে। তবে এদের কাছে কালীর কোন মূর্তি নেই। মাটির ঢিবি তৈরি করে তার চার কোণে চারটি পা-এর মত জিনিষ তৈরি করা হয়, দেখতে অনেকটা শজারুর মত। তবে মন্দিরে যখন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন দেখানো হয় চার হাত। রঙ অত্যন্ত কালো। এই চার হাতের এক হাতে বর, এক হাতে অভয় এবং অপর দুই হাতের এক হাতে খড়্গ ও অপর হাতে নরমুণ্ড দেখানো হয়। দক্ষিণ হস্তদুটিতে থাকে বর এবং অভয়। বাম হস্তদুটিতে খড়্গ ও নরমুণ্ড। দুই কানে পরেন দুটি মৃত নরদেহ। গলায় পরেন নরমুণ্ড মালা। লোলুপ জিহ্বা নেমে আসে চিবুকের কাছে। দৈত্যদের কর্তিত হাত দিয়ে বস্ত্র তৈরি করে কোমরে পরেন। হাতগুলো হাঁটু অবধি বা পায়ের গোড়ালী অবধি ঝুলে থাকে। রক্তপান করার জন্য দেখা যায় বুক বেয়ে রক্ত ঝরছে। চোখ রক্ত বর্ণ— যেন মদ্যপান করে আছেন। ভূমিতে শায়িত তাঁর স্বামী শিবের বুকের উপর তিনি এক পা তুলে দাঁড়িয়েছেন, এমন দেখা যায়। আর এক পা থাকে শিবের জঙ্ঘার উপর।

দেবীর উদ্দেশে বলি দেওয়া হয় পায়রা ও ছাগল। কখনও কখনও কালে ভদ্রে মোষ বলিও দেওয়া হয়। খড়্গকে মন্ত্রপূত করে এক কোপে বলি দেবার নিয়ম। পশুর কাঁধ থেকে নির্গত শোণিত নিয়ে কপালে তিলক কাটার জন্য ভক্তজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এ ধরনের বলি দুর্গা পূজায় তিন দিন ধরে বিশেষভাবে দেওয়া হয়।

এ ধরনের যে পূজো, সেটা দেবীর ভয়ঙ্করী দিকের পূজো। কিন্তু দেবীর মঙ্গলদায়িনী রূপও আছে। সেই রূপে তাঁকে রক্ষাকালী, ভদ্রাকালী ইত্যাদি বলা হয়। রক্ষাকালী বা ভদ্রকালী হিসেবে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য রোগশোক মহামারীর সময় গ্রামের থানে পূজো দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন তথ্যও পাওয়া যায় যে, এই দেবীর থানে পূজো দেবার পর মহামারী ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেছে।

এই মহাশক্তি 'দেবী' নামেও প্রসিদ্ধা। দেবী হিসেবে কখনও তাকে উমা, গৌরী, পার্বতী, হৈমবতী ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। কিন্তু দেবীর রণদেহী মূর্তি হিসেবে তাঁকে বলা হয় দুর্গা। দুর্গা অর্থ হল দুর্জেয়া। অনেকে দুর্গরক্ষিণী ব'লেও তাঁকে দুর্গা নামে ডাকা হয় বলে মনে করেন। কালী হিসেবে তাঁর অর্থ কৃষ্ণবর্ণা। চণ্ডী বা চণ্ডিকা হিসেবে ভয়ঙ্করী। দেবী ভৈরবী নামেও প্রচণ্ডা।

বিহারে নওরাত্রে চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে বিশেষভাবে মন্ত্র পড়ে একটি মাটির

ঘটে দেবীর শক্তিকে ধরবার চেষ্টা করা হয়। মন্দিরের উঠোন গোময়ে লেপে শুদ্ধ করা হয়। ঘটে জল ভরে আম্রপল্লব বসিয়ে দেওয়া হয়। এর পর শস্যকণা ভ'রে একটি সরা ঘটের মুখে বসিয়ে দিয়ে হলুদ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পরে পুরোহিত এই ঘটে দেবী-শক্তিকে প্রবেশ করানোর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করেন। এই সময় তাঁকে সংযম পালন করে ফলাহারে থাকতে হয়। হোম করে এই পূজা সাঙ্গ হয়। হোমে দেবীর ঘটের সামনে চিনি, মাখন, তিল ইত্যাদি পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবীকে আহ্বান করা হয়। ঘটের চারদিকে ছড়ানো লাল রঙের গুঁড়োর সঙ্গে সেই ভস্ম মিশিয়ে গৃহস্থের বাড়িতে এসে গৃহীর কপালে পরিয়ে দেন পুরোহিত। জড় বস্তুতে শক্তি আছে এ ধরনের বিশ্বাসের এ হল একপ্রকার অতি স্থূল পর্যায়। এর দ্বারা কি লাভ হয় জানা নেই। তবে এ ধরনের বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে ক্ষতিকর তুক্‌তাক্ করা যায় বর্তমান গ্রন্থের লেখকের সে ধরনের বিশ্বাস আছে। কি অপবিজ্ঞান যে এই সব তুক্‌তাকের পেছনে কাজ করে জানিনা। তবে এ-সব বন্ধ হওয়া দরকার। কারণ, এতে মানুষের যেমন ক্ষতি হয় আত্মারও তেমনই অকল্যাণ হয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় এ তা নয়।

এই ধরনের শক্তিপুজোর দুটো ধারা আছে :— একটি হল দক্ষিণাচারী বা দক্ষিণমার্গী অপরটি বামাচারী বা বামমার্গী। দক্ষিণাচারীদের পুজোয় মদ্য মাংস মৈথুন সহকারে দেবীকে পূজা করা হয়না। অপরপক্ষে বামাচারীদের পুজোয় মদ, মাংস মৈথুন সহকারে পুজো করা হয়। উদ্দেশ্য এক ধরনের সিদ্ধি অর্জন করা। এই সিদ্ধি দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করা ও শত্রু নিধন করাই উদ্দেশ্য। এক ধরনের কুমারী পূজার মাধ্যমেও এই ধরনের শক্তি আহ্বান করা হয়। কুমারী নারী সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে :— 'যাবৎ পুষ্পং ন বিন্দ্যতে' অর্থাৎ নারী ততক্ষণই কুমারী যতক্ষণ সে বিকাশের পূর্বাবস্থায়। যে শক্তি কুমারীরূপে স্থিতা সেই শক্তি হল 'সিসৃক্ষু'— ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে তুলনীয়া— অর্থাৎ potential শক্তির সঙ্গে তুলনীয়া। নারী যখন জীবনী শক্তি তখন kinetic energy.

তবে দক্ষিণাচারী ও বামাচারী ক্রিয়া সম্পর্কে ভিন্ন ধারণাও আছে। বৈদিক সাধারণ পূজার ধারা ধরে যে পূজা করা হয় তাই দক্ষিণাচারী। প্রচলিত প্রথার উল্টোভাবে যে সাধনা করা হয় তাই বামাচারী। তবে এই বামাচারী যে তথাকথিত তন্ত্রের মৈথুন সহকারে আচার, তা নয়। এই জন্যই অনেকে একে বামাচারীও বলে অর্থাৎ মহিলা সহকারে অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য, মৈথুন ইত্যাদি সহকারে আচার। কিন্তু মরমিয়ারা এর ভিন্নধরনের ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা এই শক্তিকে মানব দেহস্থ কুল বা শক্তি বলে মনে করেন। এই শক্তি মানবদেহের মস্তিষ্কের সহস্রারস্থ কূটস্থানের শক্তি যা মানব-দেহের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নির্গত হয়ে মূলাধার অঞ্চলে এসে potential energy রূপে বিরাজ করে। সেখান থেকে তাকে বিপরীত

গতিতে প্রবাহিত ক'রে কূটস্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থাৎ উল্টো বা বামদিকে ফিরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি বা আচারকেই বলে বামাচার। মূলতঃ যোগে কুলকুণ্ডলিনীকে উর্ধ্বগতি করার আচারই হল বামাচার। কুল বা দেহস্থ শক্তিকে অর্থাৎ প্রাণশক্তিকে উর্ধ্বগামী করার যাঁরা সাধনা করেন তাঁদেরই বলা হয় কৌল।

'কালিকা বঙ্গ দেশে চ' বলে একটা কথা থাকলেও অর্থাৎ 'বাঙ্গালীর পূজার দেবী 'কালী এরকম একটা কথা থাকলেও 'কালী পূজা তাঁর তন্ত্ররহিত ধারাতে ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত। এক্ষেত্রে দেবী আদি নরগোষ্ঠীর spirit জাতীয় শক্তি। যুক্ত প্রদেশের অর্থাৎ বর্তমান উত্তর প্রদেশের ভুইয়াদের আরাধ্য দেবীও 'কালী। ঠাকুরানী মাতারূপে তিনি হয়তো আদি নরগোষ্ঠীর দেবী, যেমন সিংভূমের ভুইয়াদের পৌরি বা পহারী দেবী।

'কালীর মন্দির হল খড়ের ছাউনি দেওয়া সাধারণ এক কুঁড়ে মাত্র। মাটি দিয়ে তৈরী একটি বেদীই হল দেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। বৈগাদের এক ধরনের পুরোহিত এই শক্তির পুজো করে। এরকম আরও কিছু শক্তিরও তারা সাধনা করে, যেমন, ধরতী মাতা, হরিয়ারী দেবী ইত্যাদি। হরিয়ারী দেবী হলেন শস্যের দেবী। বৈগারা তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য মদ ও মুরগি বলি দিয়ে পুজো দেয়।

শৈব-সাহিত্যে এই শক্তি শিবের সহধর্মিণী হিসেবে চিহ্নিতা। শিবের শক্তি হিসেবে তাঁকে বহু নামে ডাকা হয়,— যেমন, দেবী, উমা, গৌরী, পার্বতী, দুর্গা, ভবানী, কালী, কপালিনী চামুণ্ডা ইত্যাদি। হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে দেখা যায় সব দেবতারই একজন করে শক্তি বা সহধর্মিনী আছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে শিবের এই সহধর্মিনীটিই দেখা দিয়েছেন। শিবের সহধর্মিণী হলেও শিব অপেক্ষা তিনি কোনরকমেই নিকৃষ্ট নন। শিবের সঙ্গে তাঁর এই সমমর্যাদার সম্পর্কই তাঁকে ভারতবর্ষে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিরূপে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য প্রাচীন মিশরেও এই ধরনের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ছিল,— যার নাম 'আতুম'।

দেবীর অসংখ্য নাম ও নানা ধরনের চরিত্র এটাই প্রমাণ করে যে, হয়তো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা নরগোষ্ঠী দ্বারা পূজিতা শক্তি বা দেবীরা একসময় তাঁর মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। এই ভাবেই শিবের সহধর্মিণী রূপে এসে গেছেন সুদূর দক্ষিণের কন্যাকুমারীর কুমারী দেবী। ঠিক এমনই ভাবেই এসেছেন অম্বিকা (বাজসনেয়ী সংহিতাতে তাঁকে রুদ্রের ভগিনী হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পুরাণে তাঁকে শিবের সহধর্মিণী হিসেবে বলা হয়েছে।) আদিতে এই অম্বিকা ছিলেন মাতৃস্থানীয়া শক্তিসমূহের প্রতিনিধি বিশেষ। এইভাবেই কুশিক জাতির দেবী কৌশিকী হিসেবে এবং কাত্য জাতির দেবী কাত্যায়নী হিসেবে এই মহামাতৃকার অঙ্গীভূতা হয়েছেন।

রূপদী পুরাণ কাহিনীর মতে উমা ছিলেন হিমালয় দুহিতা— যাঁকে শিব

বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এর আগে এই উমাকে যখন উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, 'কেন' উপনিষদে, তখন তাঁকে কোন দিব্য মহিলা সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি ব্রহ্মণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আদিতে তিনি কোন স্বতন্ত্র দেবী ছিলেন। সম্ভবতঃ হিমালয়ের কোন মহিলার বিদেহী শক্তি। পরে শিবের পত্নী হয়েছেন। বিন্ধ্যারণ্যে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীও শিবের পত্নী হিসেবে স্বীকৃতা। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দেবীকে অগ্নির সঙ্গেও যুক্ত দেখা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে অগ্নির সাতটি জিহ্বার মধ্যে দুটি জিহ্বার নাম করা হয়েছে কালী ও করালী। অগ্নির এই সাতটি জিহ্বা হয়তো আদিতে কোন আদি নরগোষ্ঠীর সাতটি ভয়ঙ্করী মহিলাশক্তি ছিল। দেবী দুর্গার মধ্যে এখনও তাঁর সেই ভয়ঙ্করিতা রয়ে গেছে। এই জন্য আজও দুর্গা পূজা বলি সহকারে করা হয়। কাইভনিক নির্ঋতি দেবীর ভয়ঙ্করিতার সঙ্গেও তার কোন সংযোগ আছে। এ সব দেখে এটাই বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নানা নরগোষ্ঠী যে বিভিন্ন মাতৃদেবতার পুজো করত, তাঁরা সবাই ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির একীকরণ প্রচেষ্টা থেকে এক মহাশক্তির মধ্যে মিশে গেছেন। এই মেশানোর জন্য নানা ধরনের গল্প তৈরি করা হয়েছে, যেমন দক্ষযজ্ঞনাশ রূপ গল্প ফেঁদে একান্ন শাক্তপীঠে নানা আঞ্চলিক মাতৃদেবীদের এনে এক মহাদেবীর অঙ্গিভূতা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর শত বা সহস্র নামকরণের যে প্রবণতা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করা যায় তারও ইতিহাস ঠিক অনুরূপ। কোন এক মহান দেবতা বা দেবী অন্যান্য আঞ্চলিক দেবতা বা দেবীকে গ্রাস করেই এই নামগুলি পেয়েছেন। শুধুমাত্র শিব ও তাঁর শক্তির মধ্যেই যে এই সব বিভিন্ন ধারা বা বিশ্বাসকে একত্রে মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা নয়। যে-কোন গোষ্ঠীর আরাধ্য দেবদেবীকে তারাও এমনি মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এমন প্রচেষ্টা বিষ্ণুর অবতাররূপ গল্পের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁর দশ অবতার রূপ হয়তো দশটি নরগোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ দেবতাকে একসূত্রে আনার চেষ্টা থেকেই হয়েছে। এই শিব ও শক্তি এবং বিষ্ণু আদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে ছিলেন বলে মনে হয় না। পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই অঙ্গীভূত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মও যে এইভাবে অব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দ্বারা পরবর্তীকালে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে 'কালী' রূপে মহাদেবী মাতৃকাশক্তি নানা স্থানে নানারূপে অধিষ্ঠিতা। এই মাতৃশক্তিকে 'দেবী' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করে সর্বোত্তমা রূপে দেখানো হয়েছে। যেমন তাঁর স্বামীকে বলা হয়েছে মহাদেব বা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কোথাও এই দেবীকে কালো বলা হয় কারণ তিনি ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণা। কালো বলেই এই দেবীর নাম 'কালী', সাধারণে এইরকম ধারণাই প্রবল। কিন্তু তা ঠিক নয়। কালের অর্থাৎ সময়ের জন্মদান করেছেন বলেই তিনি 'কালী'। সেকথা পরে

আলোচনা করা যাবে। তিনি নরমাংস খান, তাঁর অনন্ত ক্ষুধা, লোকের মধ্যে এরকম একটা ধারণাও আছে। তাঁর এ ক্ষুধা মেটার নয়।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর স্বভাবে তিনি কল্যাণময়ী দেবী রূপেই চিত্রিতা। গ্রামের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হিসেবেই তাঁকে বেশী দেখা যায়। অনেক সময়ই তাঁকে ধরিত্রী মাতা হিসেবেও দেখা যায়। তাঁর ভূমিকা মিশরের আইসিস দেবীর মত। তাঁকে অবশ্য বহুক্ষেত্রেই কোন মূর্তি ছাড়া প্রতীকের মাধ্যমেও দেখানো হয়। গ্রামের থানে সিঁদুর লিপ্ত ত্রিশূল পুঁতে রাখা হয়। কারো উপর দেবীর ভর হলে এই ত্রিশূল দ্বারা তাঁর জিহ্বা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। বিবাহ উৎসবে এই দেবীকে শাড়ি দেওয়া হয়। মাতৃরূপে দেবীর ছোট ছোট ছবি তৈরি করে অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শিশুদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন গ্রামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা' নামেও পরিচিতা। এক্ষেত্রে দেবীর বেদী এমন দুর্গম স্থানে স্থাপিত হয় যে, সাধারণে সেখানে যেতে পারে না। স্থানটি হয় কোন অন্ধকার গুহায়, সংকীর্ণ উপত্যকায়, দুর্গম পাহাড়ের কিনারে বা নদীর উৎসমুখে। নদীর উৎসমুখে ভারতের একান্ন শাক্তপীঠে মাতৃশক্তির এরকম কয়েকটি পীঠ আছে, যেমন, কালীগণ্ডকীর উৎস মাসতং-এর গণ্ডকীপীঠ, অমরকণ্টক তীর্থে নর্মদা নদীর উৎসে নর্মদাতীর, শোন বা শৈলপীঠ ইত্যাদি। এই সব তীর্থকে বহু নৃতত্ত্ববিদ আদিকালে কোন নরগোষ্ঠীর বিদেহী শক্তির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে মনে করেন— পরে যেসব পীঠ মহাদেবীর পীঠ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

কোথাও কোথাও এই দেবী 'চিতরহই' দেবী বা ছেঁড়া বস্ত্রের দেবী বলে পরিচিতা। বেদীর কাছে একটি কণ্টক বৃক্ষ থাকে। ভক্তজনেরা এখানে ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড বেঁধে দেন। উদ্দেশ্য ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে যেন নতুন বস্ত্র জোটে। প্রার্থনা মন্ত্র এই ধরনের :— 'হে দেবী আমরা তোমাকে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিচ্ছি, তুমি আমাদের নতুন বস্ত্র দান কর।' কোথাও কোথাও দেবী আঞ্চলিক নামে প্রসিদ্ধা, যেমন, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। তিনি বিন্ধ্য পাহাড়ের দেবী। গ্রীক জগতেও এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃশক্তি বা মাতৃদেবী ছিল। যেমন এথেন্সের দেবী আথেন বা এথেনা। এরকম ক্ষেত্রে কোনো আঞ্চলিক দেবী মহাদেবীর অঙ্গীভূতা হয়েছেন বলা যায়। যেমন বিন্ধ্যবাসিনী দেবী মহাদেবী সতীর ('কালী, দুর্গা ইত্যাদি) অঙ্গীভূতা হয়েছেন। কোন কোন নরগোষ্ঠী আদি বাসস্থানের দেবীকে আজও স্মৃতিতে বহন করে নিয়ে চলে, যেমন পাখিরা বিদেশে জন্মালেও তাদের যথার্থ মাতৃভূমির গন্ধ পেয়ে সেখানেই ফিরে যায়। (যেমন, সাইবেরিয়ার কোন সাড়স ভারতে জন্মালেও রক্তের মধ্যে সাইবেরিয়ার গন্ধ পেয়ে সেখানেই ফিরে যাবে। একে বলে psi-trailing.) তেমনই বহু নরগোষ্ঠী আদি বাসস্থানের মাতৃদেবীকেই সর্বাপেক্ষা পূজনীয়া বলে মনে করেন। এবং নতুন কোন শক্তির

বৃক্ষে পড়লেও নানাভাবে তাঁকেই সেখানে এনে বসান।

অনেক ক্ষেত্রেই দেবীকে সপ্তভগিনী হিসেবেও দেখা যায়। প্রাচীন মিশরেও এই ধরনের সপ্ত হাথর দেবী লক্ষণীয়। এই সপ্তদেবী বিভিন্ন রোগের দেবী হিসেবে চিহ্নিত। যেমন, 'মরহই' দেবী হলেন কলেরা রোগের দেবী— পশ্চিমবঙ্গে যিনি ওলাবিবি নামে প্রসিদ্ধা। শীতলা দেবী নামে এই দেবীই গুটি রোগের দেবী হিসেবে পূজো পান। ওই জন্যই অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে, গ্রামদেবী কালী পূজার সঙ্গে একই রাতে শীতলা দেবীর পূজাও করা হয়।

কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিলে গ্রামের থানে কালী পূজো দেওয়া হয়। তবে মূর্তি তৈরি করা হয় না। মাটির ঘটে মদ, কাচের চুড়ি, নতুন শাড়ি (সিঁদুর দিয়ে মাতৃমূর্তি অঙ্কিত) একটি টাকা, পিঠে, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে দেবীকে পূজো করা হয়। পূজোর শেষে এ-সব নিয়ে গ্রামের বাইরে কোন তিনরাস্তার মোড়ে রেখে দেওয়া হয়। এতে দেবী প্রসন্না হয়ে রোগাদি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। বিশ্বাস, কেউ যদি এ-সব তুলে নেয় তাহলে সেই রোগ তার উপর গিয়ে পড়বে। যে গ্রামে এই রোগ দেখা দিয়েছিল সেই গ্রাম রেহাই পেয়ে যাবে। যদি কোন গরু, মোষ বা ছাগল এই পথ দিয়ে যায় সে শুকিয়ে যাবে। এদের আর কোন বাচ্চা হবে না। গাভীন গাই থাকলে দুধ শুকিয়ে যাবে। ঘটশুদ্ধো এই সব জিনিসকে বলা হয় নিকশী। কেউ যদি এই সব সরিয়ে নেবার সময় পুরোহিতকে দেখে, তা হলে তার মৃত্যু হয় বলে বিশ্বাস। তিন রাস্তার মোড়ে কেউ এ-সব ছুঁলে তার মৃত্যু হয়। এ-সব বর্তমান লেখক নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রাম থেকে রোগ তাড়াবার আর একটি পদ্ধতি হল দেবীর নামে উৎসর্গ করে কোন কালো পাঁঠা ছেড়ে দেওয়া। একে বলে কালী পাঁঠা। যে গ্রামে এই পাঁঠা যাবে সেই গ্রামে রোগ ছড়াবে। পীড়ো ষাঁড় নামে যে ষাঁড় দেখা যায় তাও এইভাবে উৎসর্গীকৃত কোন ষাঁড়।

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, মনুষ্য সমাজ কৃষিকর্ম আরম্ভ করে একটু সুস্থ হয়ে বসলে মাতৃদেবীদের পূজা শুরু হয়ে যায়। এঁদের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যেমন প্রকৃতি ও বসন্তের দেবী হিসেবে দেখা দেন দুর্গা, ছিন্নমস্তা ও অসীমত্বের আত্মা স্বরূপা কালী, জ্ঞানের দেবী হিসেবে সরস্বতী ইত্যাদি। এঁদের সবারই একটি পরিচয়, সে হল শক্তি। ভারতবর্ষেও মনুর সময় মেয়েরা অত্যন্ত যত্নে লালিত হত। মায়েরা ছিলেন পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণে বড়। এখনও দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে মায়েদের প্রাধান্য বেশি। অর্থাৎ সমাজ যখন মাতৃতান্ত্রিক ছিল তখনই শক্তি মাতৃরূপে মানব সমাজের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে। সেই জন্য হিন্দুদের দেখা যায় মাতৃশক্তিকে তাঁরা এইভাবে সম্বোধন করছেন— 'হে মাতে, তুমি প্রশংসার অতীত। জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে তোমারই উপস্থিতি। সকল জ্ঞানের উৎস তুমিই। সমস্ত নারীরূপের মধ্যে রয়েছে তোমারই

উপস্থিতি।' ইত্যাদি।

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, মাতৃশক্তির কল্পনা পৃথিবী মাতার চিন্তা থেকেই মানুষের মধ্যে এসেছে। যখন ভয়ঙ্করী শক্তি তখন তাঁকে সাপের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে। সাপ মৃত্তিকা গহ্বরে থাকে ও অন্ধকারে বিচরণ করে বেড়ায়। সেইজন্যই দক্ষিণ ভারতের এল্লম্মা মূর্তিতে দেখা যায় তিনি সাপের মূর্তিতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন। দুর্গম্মা রূপে সাপের গর্তের উপর তাঁর মন্দির তৈরি করা হয়। সেইজন্য মারগোমা বৃক্ষকে সবিশেষ সম্মান করা হয়। বুন্দেলখণ্ডে ভিয়ারানী নামে এক দেবীকে পূজা করা হয়। এই নামের অর্থ যিনি মৃত্তিকাতে বাস করেন। পৃথ্বী হিসেবেই সাপকে যখের ধনের অধিকারী হিসেবে দেখা হয়।

মাতৃ-আরাধনার ধারাটাই পৃথ্বী মাতার চিন্তা থেকে এসেছে বলে মনে হয়। তাঁর কল্যাণময়ী রূপ ও ভয়ঙ্করী রূপ উভয়রূপেই তিনি পৃথ্বী মাতার সঙ্গেই যুক্ত। গ্রীকপাত্রে এই জন্য সাপকে ভূমি থেকে উঠছে এরকম অবস্থায় দেখা যায়। ঠিক অনুরূপভাবে পাথরে খোদাই করা দক্ষিণ ভারতের এল্লম্মা মূর্তিতে দেখা যায়। এল্লম্মাতে শুধু দেবীর মস্তিষ্কই দেখা যায়। বাকি দেহ থাকে মৃত্তিকার নিচে। বৌদ্ধ শিল্পে দেখা যায় সর্পদেবী মৃত্তিকা থেকে উঠে ভগবান বুদ্ধের অশ্বকে ধারণ করছেন।

দ্রাবিড় সংস্কৃতিতেই মাতৃদেবীর চিন্তা বেশি করে দেখা যায়। কল্যাণময়ী ও ভয়ঙ্করী উভয়রূপেই তিনি এখানে রয়েছেন। তাঁর দেবী আখ্যার মধ্যেই এই ভাব লুক্কায়িত রয়েছে। এই দেবী যারা বোঝায় তাঁর কন্যারূপ, মাতৃরূপ সব। যেমন, কন্যাকুমারী অবিবাহিতা কন্যা, সর্বমঙ্গলা অর্থাৎ সর্বদা যিনি মঙ্গলদায়িনী এবং শাকম্ভরী, যিনি শস্য বৃদ্ধি করেন। চামুণ্ডা রূপে তিনি অসুর নিধনকারিণী। 'কালী রূপে তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। রজনী রূপে তিনি ভয়ঙ্করী। রক্তদন্তিকা রূপে তিনি রক্তরঞ্জিত দন্তী। পূর্ববঙ্গে 'মায়ের দুটি রূপ দেখা যায়— সিদ্ধেশ্বরী অর্থাৎ পূর্ণসম্রাজ্ঞী ও বৃদ্ধেশ্বরী অর্থাৎ বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী। কিন্তু রোগ শোকাদি মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করলে তিনি কোমলরূপে দেখা দেন— যেমন, রক্ষাকালী বা ভদ্রাকালী হিসেবে। এর অর্থ এই যে, কালী রক্ষাকর্ত্রী ও কল্যাণময়ী। বিহারে তাঁকে 'ক্ষেমকরণী' অর্থাৎ যিনি আশীর্বাদ দান করেন সেইরূপে পূজা করা হয়। মধ্যপ্রদেশে এই দেবী গ্রামে গ্রামে পৃথ্বী দেবী হিসেবেই পূজা লাভ করেন। মনে করা হয়, কলেরা, গুটিরোগ ইত্যাদি তিনি সৃষ্টি করতেও পারেন, দূর করতেও পারেন। গুটি রোগ হলে এই দেবী সেই রুগীর দেহে প্রবেশ করেন বলে ধারণা। সেই জন্য দেখা যায় গুটি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঘরে ধূপ ধুনো দেওয়া হয়। গোবর জলে ঘরের মেঝে নিকিয়ে বা লেপে দেওয়া হয়। রুগীর ঘরে কেউ ঢুকলে জুতো খুলে ঢোকে।

এই মাতৃশক্তির যে কতরূপ আছে তা বলার নয়। গুজরাটের কাছে অনজার নামক স্থানে 'বহুচরাজী' নামে এক দেবীর বেদী আছে। আসলে ইনি হলেন দর্পণ দেবী। এই দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তেরা নিজেদেরই প্রতিবিম্বের পূজো করেন। বরোদাতে ইনিই কোন মহিলা চারণ কবি যিনি দেবীস্তরে উন্নীত হয়েছেন বলে মনে করা হয়। দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কাথিয়াবারে দুটি মাতৃদেবতার পূজো করা হয়। তাঁরা কোন চারণ কবির কন্যা ছিলেন। এই চারণ কবি নিঃসন্তান ছিলেন বলে দরবার থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি কালী মন্দিরে তপস্যা করে দেবীর প্রসাদে দুটি কন্যা লাভ করেন। মায়ের কাছে প্রার্থনার ফলে তাঁদের জন্ম হয়েছিল বলে তাঁরা মায়েরই অংশ বলে বিবেচিতা হন এবং সেই জন্য মাতৃশক্তিরূপে পূজা পেতে থাকেন। সেই জন্যই মাতৃ-আরাধনার ধারার যথার্থ উৎস অজ্ঞাত। কার্লি গুহার মাতৃদেবীর নাম একবীরা। তিনি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্তা। কারণ, এখানেই বুদ্ধদেবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করা হ'ত। এই বেদীকে বলে দগোবা। ভুকতুরিয়া মায়ের যে মন্দির আছে আসলে তা কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর স্মৃতিতেই হয়তো তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম ভারতে তো মাতৃপূজার প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। কাথিয়াবারের প্রত্যেকটি রাজপুতগোষ্ঠীরই নিজস্ব মাতৃদেবী আছেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই রাজপুত দম্পতি এই মায়ের দর্শনে যায়। নকশাত্রের টাকশালে 'আশাপুরী' নামে এক দেবী আছেন, যিনি আশাপূর্ণ করেন। কিন্তু তাঁর চোখের সামনেই রীতিমত চুরি হয়ে যায়।

বরোদার বেচরাজী বেদীতে যে মাতৃশক্তির পূজো হয় তা জড় পদার্থে প্রাণ আরোপ করে পূজোর সামিল। প্রধান পূজারী প্রতি সকালে স্নান ও আচমন সেরে মন্দিরের অভ্যন্তরে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন। সেখানে মূর্তির মাথায় পঞ্চামৃত ঢেলে তারপর ঝাঁঝরি থেকে জল বর্ষণ করেন। দুধ, দই, ঘি, চিনি ও মধু দিয়ে পঞ্চামৃত তৈরী করা হয়। এই পাঁচটি খাদ্য সামগ্রীকে দেবীর খাদ্য বলে মনে করা হয়। এই ব্রাহ্মণেরা বেদ থেকে মন্ত্র পাঠ করেন। মূর্তির উপর আবির ও পুষ্প স্থাপন করা হয়। ধূপ ও কর্পূর পোড়ানো হয়। দিনরাত রূপোর প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। লুচি, চিনি, ঘি ও নারকেল দিয়ে ভোগ দেওয়ার নিয়ম। ভারতীয় পূজায় নারকেল নরবলি প্রথার ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। সকাল সন্ধ্যায় কাঁসর ঘন্টা ইত্যাদি বাজিয়ে আরতি চলে। সন্ধ্যাবেলা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে দেবী মাহাত্ম্য পাঠ করা হয়। দেবীকে ভোগ দেওয়া হয় তিন বেলা, একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে খাদ্য গ্রহণ করে সেই ভাবে। তবে ভোগ যে ভাবেই দেওয়া হোক না কেন, বলি না দিলে দেবী খুশি হন না। বলির রক্ত দেবীর বেদীর উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

হিন্দুদের যত রক্ষণশীল পূজার ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে দেবীপূজা অনেকটা

জড় পদার্থে প্রাণ আরোপ করে পূজা করার মত। মধ্যপ্রদেশের অনেক পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এই দেবীকে তাদের গ্রামদেবতা বলে মনে ক'রে সেইভাবেই পূজা দেয়। যেমন, ধের মাতা অর্থাৎ পৃথ্বী দেবী ; দেশহাই দেবী অর্থাৎ কুটির রক্ষক দেবী ; চিথ্রইয়া দেবী অর্থাৎ ছেঁড়া কাপড়ের দেবী বা ন্যাকড়ার দেবী ; বিন্ধ্যবাসিনী দেবী অর্থাৎ বিন্ধ্যাঞ্চলের দেবী ইত্যাদি। পাঞ্জাবে দেখা যায় অবিবাহিতা মেয়েরা মায়ের প্রতিনিধি হিসেবে পূজো পান। নেপালেও এ ব্যবস্থা আছে। এদের কুমারী বলা হয়। বছরে দু'বার এদের পুজো করা হয়। এখানে মেয়েরা শিব ও পার্বতীর মূর্তি তৈরি করে পুজোর পর নদীতে ভাসিয়ে দেয়। আঞ্চলিক লোকেরা বলে, কোন এক মহিলাকে বালক স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হলে সেই মহিলা আত্মহত্যা করেন। সেই স্মৃতি মনে রেখেই এমন করা হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, শিব-পার্বতীকে শস্যের প্রাণশক্তি বলে মনে ক'রে পুজো দেওয়া হয়। কারণ, তাঁদের মূর্তিকে দূর্বাঘাস ও পুষ্প স্তবকের উপর স্থাপন করা হয়। কিন্তু আরও নানা প্রশ্নের জবাব মেলে না বলে এ তত্ত্বকেও স্বীকার করা যায় না।

এই মাতৃশক্তিকেই রোগ শোকের উৎস ও রোগ নিরাময়কারিণী হিসেবেও দেখা হয়। নানা রোগের নানা মাতৃশক্তি আছেন। তাঁরাই এসব নিয়ন্ত্রণ করেন, যেমন, শীতলা দেবী নিয়ন্ত্রণ করেন গুটি রোগের, মারি মাতা কলেরার। বিহারের গঙ্গোতা চাষীরা মাসে দু তিনবার জগদম্বা বিশ্বমাতার পুজো করে। বিবাহের সময় বা অসুখবিসুখ করলে ভগবতী দেবীর পুজো করা হয়। ছাগ শিশু, ঘি, তুলসী পাতা ও সিঁদুর দিয়ে এই দেবীর পুজো দেওয়ার রীতি। এইভাবে মাতৃশক্তি বিষহরি রূপে সাপের বিষ নামান। একপাত্র জলের দিকে তাকিয়ে গুণিন কি দেখেন তিনিই জানেন! জল নড়ে উঠলে মনে করেন, দেবী তাতে অবতীর্ণা হয়েছেন। এর পর তিনি বিষ নামানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই সব আঞ্চলিক দেবী কি করে যে এক মহামাতৃদেবীর অঙ্গীভূতা হয়েছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা আজও সম্ভব নয়। তবে এই মহাদেবীকে লোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবী কালী বলে মনে করেন।

এই মাতৃসাধনা ভারতবর্ষে শাক্তধর্ম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাকে নির্ভেজাল শক্তির প্রতীক বলে মনে করা হয় বলেই তাঁর নামে যে ধর্ম দেখা দিয়েছে তাকে শাক্তধর্ম বলে। শাক্তধর্মেই তন্ত্র সাধনার এক বিশেষ ধারা আত্মপ্রকাশ করেছে। যার ফলে এই ধর্মে বহু ইন্দ্রিয়জ অনৈতিক দিক দেখা দিয়েছে, যদিও তন্ত্রের যথার্থ অর্থের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। তন্ত্র অর্থ— 'তন্যতে বিস্তারিয়তে জ্ঞানম, অনেন ইতি তন্ত্রম' অর্থাৎ যে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে মুক্তি দান করে তাকেই বলে তন্ত্র। এই শাক্ত ধর্মেরই আরাধ্যা দেবী হলেন, কালী, দুর্গা, পার্বতী, দেবী ও অন্যান্য মাতৃদেবী। এই তন্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন

কাল থেকে। সিন্ধু সভ্যতায় ও প্রাগৈতিহাসিক আরও নানা সাক্ষ্যে তন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমানে আসাম, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও দক্ষিণ ভারত নানা স্থানে এর ব্যাপক প্রসার। এই আধুনিক প্রসারের সূত্রপাত সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে।

একদিকে এর রয়েছে দার্শনিক তত্ত্ব, যার মধ্যে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব ঢুকে গেছে। স্বয়ম্ভু সত্তাকে শাক্তরা শুধু 'এক' বলেই মনে করেন না, মনে করেন, এই সত্তা স্থির ও নিষ্ক্রিয়। এর মধ্যে সম্বিৎ আত্মপ্রকাশ করালেই দ্বৈতভাব দেখা দেয় এবং রূপাত্মিকা মহিলাশক্তি সক্রিয়া হয়ে ওঠে। এই শক্তি আদি সত্তার সঙ্গে একাত্মিভূতা হয়ে ছিল। এই ধরনের চিন্তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈদিক চিন্তার মধ্যে দেখা যায় বলে অনেকে এই মাতৃসাধনার ধারাকেও বৈদিক বলে মনে করেন।

অপরদিকে এই শক্তিতে ব্যক্তিরূপ আরোপ করে পৃথ্বী মাতা রূপে অনার্যরা বহু পূর্ব থেকেই গ্রাম দেবতা হিসেবে এঁর পুজো করতেন— যে গ্রাম মাতার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরই মধ্য থেকে কালী ও মরিয়ম্ম-এর মত মাতৃদেবতা আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বেদেও দেখা যায় পৃথিবী করুণাময়ী মাতৃ রূপে দেখা দিয়েছেন। এর সঙ্গেই বহু আঞ্চলিক মাতৃদেবী একত্রে মিশে গিয়ে মহামাতৃকা রূপে দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

ভারতবর্ষের এই সমধর্মী মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাদামী গুহা-মন্দিরের কথাই ধরা যাক। সেখানে পৃথিবী অনার্যদের ভূমিদেবী বা ভূ-দেবীর সঙ্গে সমার্থবোধক। এই ভূমিদেবী হলেন ধৈর্য ও সহ্যশক্তির প্রতীক। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তাঁর বিশেষ রকম মর্যাদা। দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দিরে দেখা যায়, পাথরে খোদাই করা একটি দেবী মূর্তি রয়েছে। মূর্তি মানে শুধুমাত্র মুখ। শুধু মুখই দেখা যায়। বাকি দেহ রয়েছে মাটির নীচে। এই ধরনের চিন্তাধারা বৌদ্ধশিল্পেও লক্ষ্য করা যায়। সে কথা আগেও বলেছি। গ্রীক দেবী Ge-এর মধ্যেও অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। রাজপুতদের পৃথিবী মাতার নাম গৌরী। প্রতি বছর শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-অনুষ্ঠান হল শস্যবৃদ্ধিতে শক্তি সঞ্চারের প্রতীক। শাকম্ভরী ও অন্নপূর্ণা পূজার মধ্যেও ঠিক একই ধারণা রয়েছে।

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, যেখানে তাঁর ভয়াবহ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে সেখানটাতেই রয়েছে অনার্য প্রভাব। মাতৃশক্তির এই ভয়াবহ দিকটিই লক্ষ্য করা যায়— বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। যেমন, এলম্মা। এলম্মা অর্থ সকলের মা। কিন্তু তাঁর পুজোতে ভয়াবহভাবে পশুবলি দেওয়া হয়। তাঁকে খুশি করার জন্য লোহার হুক বা বড়শি জাতীয় জিনিষে পশু গেঁথে তাকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তোলার যে পদ্ধতি তা অত্যন্ত করুণ। পশুকে এইভাবে বড়শিতে গেঁথে

উপরে তুললে শস্যের চাড়াও মাটি ভেদ করে উঠবে এই ধরনের বিশ্বাস থেকেই এই প্রকার নারকীয় ব্যবহার করা হয়। মারিয়াম্ম হলেন মহামারীর দেবী। তাঁর বেদীতে পোট্রাজ (যার অর্থ বৃষরাজ) শ্রেণীর পুরোহিত মেষের গলা চিরে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। রক্তাক্ত মাংস পিণ্ড মুখে নিয়ে দেবীর দিকে ছিটিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে। বামাচার তন্ত্র মতে বঙ্গদেশেও এইভাবে দেবীকে পুজো করার বিধি আছে। প্রাচীন গ্রীসের ডায়োনিসাস অনুষ্ঠানের সঙ্গেও এর মিল আছে। ভারতবর্ষে একে কাপালিক আচার বলা হয়। তামিলদের পিডারী, সংস্কৃতে যাকে বিবহরি বলা যায়— তিনি হলেন ক্রোধপরায়ণা দেবী। সেই জন্য তাঁর মুখ ও দেহ হল গনগনে আগুনের মত লাল। যখন অনাবৃষ্টি হয়, পশুমড়ক দেখা দেয়, তখন তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা চলে। তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় এবং ষাঁড় বলি দেওয়া হয়। তাঁর শোভাযাত্রার পথে মেষ বলি দিয়ে হয় এবং মদের সঙ্গে মেষরক্ত মিশিয়ে হাওয়ায় তা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, অশুভ শক্তিকে প্রসন্ন করা।

নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, এমনতর অনার্যদেবী থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মে কালী ও 'দেবী'র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁদের থেকে অনার্য বর্বর স্বভাবের কিছুটা ছাঁটকাট করে দেওয়া হয়েছে এই যা। তবু যাঁরা গোঁড়া হিন্দু তাঁরা মনে করেন যে, 'দেবী' বা 'কালীর উদ্ভব বেদ থেকে। অনার্যদের পৃথিবী মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কম।

উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেন, দেবীর মধ্যে এখনও ভয়ঙ্করী দিকটা যথেষ্টই রয়ে গেছে। বিন্ধ্যারণ্যের দেবী বিন্ধ্যবাসিনীরূপে, মুম্বাইয়ের কোলাবা জেলার সাগর গড়ের সপ্তশ্রী দেবী হিসেবে, এঁদের মধ্যে অনার্যত্বের ছাপই যে প্রবল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদিতে এঁদের কোন মূর্তি ছিল না। গুহাতে থাকতেন বিদেহী শক্তি হিসেবে। পাঞ্জাবে এই শক্তিই যুবতী মেয়েদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এই মেয়েরা এমন অঙ্গভঙ্গী করে যাতে জাদুবলে শস্যোদ্গম হয়। নেপালে এই শক্তিই 'কুমারী' রূপে ব্রাহ্মণ দুহিতার মধ্যে পূজিতা হন। তাঁর সঙ্গে থাকেন গণেশ ও মহাকালরূপী শিব। গণেশ থাকেন শিশুরূপে, মহাকাল তাঁর রুদ্রমূর্তিতে। এই কালীকে তিব্বতের মহাযান বৌদ্ধধর্মেও গ্রহণ করা হয়েছে। এই বৌদ্ধকালী সম্ভবতঃ হিন্দুদের অনার্য মাতৃদেবী থেকে এসেছেন। একে বিন্ধ্যবাসিনী 'কালীর সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে। আদি বৈদিক বা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে 'কালী নামে কোন মাতৃদেবীকে দেখা যায় না। তবে এমন মাতৃদেবী আছেন যাঁকে সহজেই 'কালীর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে এই বৈদিক মাতৃশক্তির সঙ্গে 'কালীকে এক করে দেখানোর প্রয়াস চলে। বৈদিক অশুভ শক্তির দেবী নির্ঋতির সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখানো হয়। এরই জন্য তাঁর চরিত্রে ভয়ঙ্করী দিকের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু যখন তাঁকে সিংহবাহনা করে

দেখানো হয়— তখন মনে হয় উৎসে এই শক্তি পশুশক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। ক্রমশঃ মানুষ যখন নিজের সম্পর্কে বেশি করে জানতে পারে তখনই পশুশক্তি থেকে মাতৃশক্তি নারীরূপে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং বলা যায় যে, সারা পৃথিবী ব্যাপী মাতৃসাধনার যে ধারা গড়ে উঠেছিল ভারতীয় শাক্ত তন্ত্র সেই ধারারই একটি শাখা মাত্র, এবং যেভাবে ঈশতার, অশটার্ট বা অশটোরেথ, অফ্রোদিত্, ফ্রিগিয়ান কাইবেলী বা শাইবেলী ও এফেনিয়াসের ডায়ানার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, সেইভাবেই ভারতে শাক্তদেবী সমূহ আত্মপ্রকাশ করেছেন। এঁদের নানা নাম, নানা গুণ। এঁরা প্রত্যেকেই আবার কোন না কোন মহান দেবতার শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছেন। নেপালে কীর্তিপুরের গণেশ বেদীতে আটটি মাতৃমূর্তি আছে। গুজরাটে এঁদেরই কেউ কেউ কিছু চারণ মহিলা কবির প্রেতশক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এই মহিলা চারণ কবিদের কোন না কোন বেদনাদায়ক কারণে দেহত্যাগ ঘটেছিল। এঁদের প্রধান হলেন খোরিয়ার। মাদ্রাজেও বহু মাতৃকা শক্তির উৎস মানবী সত্তা। গঙ্গম্মা আদিতে ছিলেন কোন ব্রাহ্মণ মহিলা। পুরুম্ম হলেন সেই তিন বোনের এক বোন যিনি বিশেষ একটি পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। এই ধরনের শক্তিই পরে কোন মহাদেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যেমন গুজরাটের অম্বা ভবানী। এই দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য পশুবলি দেওয়া হয়। দেবীর উদ্দেশে মদ নিবেদন করা হয়। দেবীর মূর্তি বলতে আছে এক খণ্ড পাথর যা নাকি অস্পষ্টভাবে খোদাই করা। তাতে একটা মনুষ্যমুখের ভাব আছে এই যা। মনুষ্য সত্তা থেকেই এই ধরনের দেবী-শক্তির উদ্ভব।

তবে শক্তি পূজার ধারা অসম ও বঙ্গদেশে যত জনপ্রিয় অন্যত্র কোথাও তত জনপ্রিয় নয়। এখানকার শক্তিপূজার ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, অনার্য ভয়ঙ্করী শক্তির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। পূর্ব ভারতে এক সময় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও এই শক্তিপূজার ধারাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা যায় নি। সাময়িক কালের জন্য আড়ালে চলে গেলেও আবার ফিরে এসেছে।

হতে পারে যে, এই শক্তি পূজার উদ্ভব ঘটেছিল অসমের কামরূপ অঞ্চলে। এবং গৌতম বুদ্ধের অনেক আগেই এই মাতৃশক্তিপূজার ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। এই দেবী ছিলেন শোণিতপ্রিয়া। বলি দেওয়া পশুর মাংস পেলে তিনি তৃপ্ত হন। অসমে এই দেবীর প্রধান রূপ হল কামাক্ষা হিসেবে। কামাক্ষা অর্থ কামের দেবী। এখানে যৌন সম্পর্কিত এমন কিছু কাজ করা হয় যা দেখে মনে হয় না যে, মানব, মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে জীব, তার পক্ষে এ-সব করা সম্ভব। এরই সঙ্গে এই সেদিন পর্যন্ত নরবলি প্রথাও প্রচলিত ছিল। বৈদিক হিরণ্যকশিপুর গল্পে যদিও নরবলির কথা শোনা যায়, তবু বৈদিক ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে নরবলির কোন কথা নেই।

এই জন্যই মনে হয় নরবলি প্রথা এসেছিল কোন অনার্য সংস্কৃতি থেকেই। আগে অসমে দেবী কালিকার বেদীতে নরবলি দেওয়া হ'ত। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ যখন কামাক্ষা মন্দির নির্মাণ করেন তখন বহু সদ্যকর্তিত নরমুণ্ড তাম্রপত্রে বা তামার টাটে দেবীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। কামরূপের বেলতোলাহ্-এর সদিয়া তাম্র-মন্দিরেও অনুরূপ বলিপ্রথা ছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারজন ব্রিটিশ প্রজাকে এই মন্দিরে বলি দেবার জন্য জয়ন্তিয়ার রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

ভারতের শাক্তসাধনায় জয়ন্তী একটি মহাশাক্তপীঠ। একান্ন শাক্তপীঠ নির্ণয় প্রসঙ্গে পীঠনির্ণয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যে—

'জয়ন্ত্যাং বাম জঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর।'

অর্থাৎ জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে পড়েছিল সতীর বাম জঙ্ঘা। দেবীর নাম জয়ন্তী। ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। ঐতিহাসিকদের ধারণা, এই জয়ন্তী এখন বর্তমান বাংলা দেশে। শ্রীহট্ট জেলার কালাজোর বাউরভোগ গ্রামে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে একান্নপীঠের যে তালিকা আছে তাতে স্থানের নির্দেশ হল খাসিয়া শৈলের দক্ষিণে জয়ন্তিয়া পরগণায়। গ্রামের নাম বাউরভোগ। অসমের ইতিহাস লেখক Gait সাহেব তাঁর গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠাতে বলেছেন যে, সতীর বামপদের নিম্নাংশ পড়েছিল জয়ন্তিয়া পরগণার ফালজুরে। ঘাড় পড়েছিল শ্রীহট্ট জেলার অন্য কোনখানে। Gait-এর মতে 'দুর্গাপূজার মহানবমীতে এখানে নরবলি হ'ত। বলি দিতেন রাজা প্রজা উভয়েই। রাজা দিতেন পুত্র সন্তান জন্মালে। সাধারণ মানুষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে। মজার কথা এই যে, বলি যাবার লোক নিজেরা স্বেচ্ছায় এসে জুটতো। ভোগী নামে এমনই একটি শ্রেণী ছিল যারা স্বতস্ফূর্তভাবে 'অই' নামে এক দেবীর কাছে বলি যেত। অই বাস করতেন এক গুহাতে। ভোগীদের মধ্যে যারা অইয়ের ডাক শুনতে পেত তারাই বলির জন্য নির্দিষ্ট হত। এরা তখন সমাজে বিশেষ রকমের সুবিধা পেত। তারা যখন যা খুশি তাই করতে পারত। যে-কোন মহিলাকে ইচ্ছামত উপভোগ করতে পারত। দেবীর বাৎসরিক পুজার দিন এলে তাদের বলি দেওয়া হ'ত। এই বলি প্রথার সঙ্গে এক ধরনের জাদু বিশ্বাসও কাজ করত। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে যে, এখানকার লোকেরা জাদুক্রিয়াকে খুব বড় করে দেখত। পূর্ণ গর্ভবতী মহিলার পেট চিরে বাচ্চা বের করে তার মধ্যে আগামী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত খুঁজত।

অসমের চুটিয়ারা দেবী কালিকার বিভিন্ন রূপ ও নামের পূজা করত। তবে তাঁর পুজো করত নিজেদের উপজাতীয় পুরোহিত দেওরিদের দিয়ে, ব্রাহ্মণদের দিয়ে নয়। 'দেবী' কেশাইখাতি নামে তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়া ছিলেন। কেশাই খাতি অর্থ হল 'কাচামাংস ভক্ষিণী'। এই দেবীর কাছে রীতিমত নরবলি দেওয়া

হ'ত। তবে যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরই বলি দিতে দেওয়া হত। এজন্য বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীও চিহ্নিত ছিল। বলি দেবার জন্য এদের কাছ থেকেই মানুষ নেওয়া হত। বিনিময়ে সেই গোষ্ঠী সমাজে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা পেত। বলি দেবার জন্য যাকে নির্দিষ্ট করা হ'ত, তাকে বিশেষভাবে পালন করা হ'ত যাতে সে হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে। দেবী বলিগ্রহণ করে খুশি হন। সদিয়ার তাম্রমন্দিরে এমনিভাবেই নরবলি দেওয়া হ'ত। এছাড়া ত্রিপুরী, কচারী, কোচ, জয়ন্তি এদের মধ্যেও এই ধরনের বলিপ্রথা ছিল। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে কারনুল জেলার শ্রীশৈলে বা শ্রীপর্বতেও এমন নরবলি হত। গোয়ালিয়রের নারবার-এর পদ্মাবতীর কাছে একটি মন্দিরে চামুণ্ডা (আর এক নাম 'তারা বা 'কালী) বা করালীর কাছেও নরবলি দেওয়া হ'ত।

চুটিয়া বা ছতিয়াদের কাছই খাতি দেবীকে তাম্রেশ্বরীও বলে অনেকে। কেউ কেউ তাঁকে বলেন কেশাইখাতি। বড় কচারি জাতের লোকেরা বলে মহামায়া রণচণ্ডী বা কা-ছই-খাত্তি। চুটিয়া বা ছতিয়াদের মতে বিশ্বস্রষ্টা পরমপুরুষের নাম হল কুন্দী। এই কুন্দীর শক্তি হলেন মামা, অর্থাৎ মহামায়া। এই মহামায়াই হলেন কাছাইখাতি। তান্ত্রিকরা এই কাছাইখাতি দেবীর নিজস্ব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তন্ত্র মতে 'কা' হল শক্তি 'ক' শক্তিমান। সুতরাং 'কা' হল আদ্যাশক্তি মহামায়া বা মা-মা। তাঁরই অপর নাম কামা বা কা-মাতা। তিনি আকাশচারিণী বা ব্যোমতত্ত্বে (খ) প্রাণবায়ুর (য়) বিস্তার স্বরূপিণী অর্থাৎ কামাখ্যা বা কামাক্ষা। তিনি মা ও রাজ্ঞীরূপে আকাশে বিস্তারিতা (আ) হয়ে নিরন্তরধারায় (ত) গতিশীলা (ঈ) অর্থাৎ কা-মা-খা-তি-বা কা-খাই (ছাই, = শাহী)-খা-তী।

বঙ্গদেশে 'দুর্গা পূজার মধ্যেও এই ধরনের কিছু নৃশংসতা ও ছেলেমানুষী রয়েছে। 'কালী পূজার সঙ্গে ঠগীদের বিশেষ চিন্তাধারাও অদ্ভুৎ ধরনের। ইতিহাসে আছে, দেবী-কালিকাকে সেবা করার জন্য ভারতবর্ষে গুপ্ত একটি দল ছিল। তাদের কাছে এই দেবী মৃত্যুর দেবী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন।

এই গুপ্ত দলের সদস্যদের বলা হ'ত ঠগী। তারা মনে করত পৃথিবীর দৈত্যদের হত্যা করার দায়িত্ব 'মা তাদের উপর অর্পণ করেছেন। ঠগীরা পথচারীদের, বিশেষ করে তীর্থযাত্রীদের এই দৈত্য বলে মনে করত। রাস্তায় চলার সময় পথচারীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এরা আকস্মাৎ তাদের কোমরে জড়ানো একখণ্ড রুমাল দিয়ে পথিকের গলায় ফাঁস লটকে দিত। এর পর শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তির হাত পা কেটে দিত। মুখমণ্ডল এমন বিকৃত করত যাতে কেউ মৃত ব্যক্তিকে চিনতে না পারে। দেবী কালিকা এ ধরনের বলিদান পছন্দ করেন বলে তাদের ধারণা ছিল। এর পর তারা এক ধরনের কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাতে মৃতদেহ পুঁতে দিত। তারপর সেখানে তাঁবু খাটিয়ে এক ধরনের ভোজের ব্যবস্থা করত। এই

অনুষ্ঠান ভোজকে বলা হ'ত তুপনি। ভোজন আসরে এক টুকরো বিছানো কাপড়ের উপর বসতেন দলের নেতা। কাছাকাছি তাঁকে ঘিরে বসত অভিজাত ফাঁসুরের দল। যাদের অভিজ্ঞতা কম তারা বসত এই ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাইরে। মায়ের কাছে উৎসর্গ করার জন্য প্রতীক হিসেবে থাকত মাটি খোঁড়ার কোদাল ও এক টুকরো রুপো। দলনেতা ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে গুড় ফেলে দিতেন। এই গুড় ছিল ঠগীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র খাদ্য। এক ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এই গুড় গর্তে ফেলা হ'ত। গুড় ও কোদালের উপর পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত। সমবেত ঠগিরাও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করত। কেউ যদি নতুন সদস্য হ'ত তাকে কাউকে ফাঁসীতে লটকে হত্যা ক'রে নিয়ে আসতে বলা হ'ত। তবে সবাইকে এরা মারত না। মহিলা, কারিগর, চর্মকার, কর্মকার, বিকলাঙ্গ— এদের হত্যা করা হ'ত না। ঠগীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে, শিবের পত্নী কালিকা, যাঁকে দুর্গা ও ভবানীও বলা হয়, তিনিই তাদের ফাঁসীতে লটকে পথচারীদের হত্যা করে লুণ্ঠন করার অধিকার দিয়েছেন। অনেক ব্রাহ্মণও ঠগী ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণ ঠগী থাকলে তিনিই ঠগী অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন।

ঐতিহাসিকদের মতে শিবের পত্নী হিসেবে কালীকে দেখাবার প্রচেষ্টা হয়েছে তাঁকে ভারতের হিন্দুধর্ম স্বীকৃত পূজার বেদীতে তোলার জন্য। নইলে অনার্যদের মধ্যে যে মাতৃচিন্তা ছিল— যে মাতৃদেবীরা নানা ধরনের রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, উর্বরা শক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কালী তাঁদেরই সঙ্গে যুক্ত। পশুবলিতে এই জন্যই দেবীর মন্দির রক্তাক্ত হয়ে থাকে। দেবীর মধ্যে যে ভয়ঙ্করিতা দেখা যায় তা বর্বরদের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। বহু আঞ্চলিক মাতৃদেবী এই পূজার সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে কালীর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। তিনি ভয়ঙ্করী হয়েই আছেন। সে-জন্য তাঁর যে পূজা হয় সেটা তাঁকে প্রসন্ন করার জন্যই হয়। দেবী কালিকার জনচিন্তা পাবার ফলে শৈব ধর্মই বরং অনেকটা পেছনে পড়ে যায়।

প্রাগার্য ভারতে এবং আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা গুণিন নামে পরিচিত। বিশেষ বিশেষ কোন বেদীতে তাঁরা এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, সেইসব বেদীর দেবতা বা দেবী ক্রমে ক্রমে ব্যাপক প্রচার লাভ করেন। এই ভাবেই কালীঘাটের কালী, বিন্ধ্যারণ্যের বিন্ধ্যবাসিনী, অযোধ্যার দেবী পাটন, প্রাক্তন হায়দরাবাদের তুলজাপুরের ভবানী, এঁরা ধর্মের জগতে পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং অন্যান্য আঞ্চলিক মাতৃদেবী অপেক্ষা বড় বলে প্রতীয়মান হয়েছেন।

এমনই মায়ের এক থান আছে বেলুচিস্তানের হিংলাজে। পাহাড়ের গুহায় এই দেবীর বাস। এই দেবীকে হিন্দুরা কালী বলেই মনে করেন। কিন্তু স্থানীয়

মুসলমানেরা এঁকে বলেন বিবি নানী। অনেকে একে ঋগ্বেদের নণিয়া দেবী বলে মনে করতে চান। কিন্তু ইনি সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াতে এক সময় মহামহিমায় বিরাজ করেছেন। ইনি সিরিয়া, পারস্য, আর্মেনিয়া এবং অন্যান্য স্থানে নানা নামে পরিচিতা ছিলেন, যেমন, অনইতি, অনিয়া, অনিতিস, তনইস ; ব্যাবিলনে ইনি ননা নামে পরিচিতা ছিলেন। তবে দেবীর কোন মূর্তি নেই। আশাপূর্ণা দেবীর কাথাড়ি ভক্তেরা প্রায়ই এই দেবী দর্শনে যান। দেবীর থানের কাছে সিঁদুরের দাগ ও রক্তের চিহ্ন দেখে শক্তির ভয়ঙ্করী রূপের কথাই মনে পড়ে। আসলে কালী হলেন পৃথিবীর আদি মাতৃশক্তির প্রতীক। এই দেবীকেই অনেকে হিংলাজ দেবী বলেন। কোঙ্কনের কোলাবা জেলার চিউল পাহাড়ে এই দেবীর একটি মন্দির আছে। গল্প আছে মেবারের কোন এক উগ্র প্রভু এই দেবীর কাছে পুজো দিয়ে একটি ঐশ্বরিক তরবারি লাভ করেছিলেন— যা দিয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বহু স্থান জয় করেছিলেন।

নৃতত্ত্ববিদদের দৃঢ় বিশ্বাস— আদিতে এই দেবী ছিলেন অনার্য নরগোষ্ঠীর জড় পদার্থে প্রাণ আরোপ করা কোন ভূতপ্রেত জাতীয় শক্তি। হিন্দুধর্মেরও নিকৃষ্টতম পর্যায়ে কোন ছোটলোক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই পূজার ধারা বেশি বর্তমান। বাঙালীর মধ্যে কালী পূজার বেশি প্রচলন দেখে সে রকমই মনে হয়। আর্য রক্তের ধারা বাঙালির মধ্যে নেই বললেই চলে।

ভারতবর্ষে যত কুলীন দেবদেবী আছেন, তার মধ্যে অনার্য সম্প্রদায়ের কাছে কালীই বেশি গ্রাহ্য। তার কারণ, এই দেবী আদিতে তাদেরই পূজনীয়া ছিলেন। এরা ছাগল বলি দিয়ে, পিঠে পায়েস দিয়ে, নানা ভাবে কালী পুজো করে। বিহারের গয়া জেলাতে আজও প্রাগার্য ধারাতেই এই দেবীর পুজো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়ের থান গ্রামের প্রান্তদেশে থাকে। কখনও কখনও পাহাড়ী ভূঁইয়াদের 'ঠাকুরাণী মাই' এর মত শূকর বলি দিয়ে তাঁর পুজো হয়। এই শক্তি কালী হিসেবে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করলে তাঁর সেই আদি তেজ ও মর্যাদা দুইই হ্রাস পায়। হিন্দুধর্মে প্রবেশ করে এই দেবী তাঁর ভয়ঙ্করিতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেন। তা সত্ত্বেও হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজেও তিনি ভিন্ন অর্থে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। দেবদেবীদের তাঁরা নিরাকার পরমাত্মার সাকার প্রকাশ বলে মনে করতেন। কালীর মধ্যে তাঁরা ঈশ্বরের মাতৃশক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ দেখেছিলেন। প্রতিমারূপে তাঁর পূজা করা হলেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেকটি মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তি রয়েছে। ভয়ঙ্করী শক্তির প্রতীক হিসেবে সাপও অনেক সময় কালীর মধ্যে প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। চম্বা রাজ্যে 'চিত্রাহী' দেবীকে দেখা যায় ডান হাতে ঘন্টা ও সাপ ধরে আছেন। ওড়িশার জয়পুরে কালীকে দেখা যায় পেছন দিকে চুল আঁচড়ে সাপের ফিতা দিয়ে বেঁধেছেন। দক্ষিণ ভারতে

ভদ্রকালীর মূর্তিতে দু'টো পাখনা দেখা যায়। তিনিও সর্প বিজড়িতা। আমাদের দেশেও যেখানেই 'কালী মূর্তি আছে সেখানে তিনি সাপ বর্জিতা নন। শিবের সর্প হয় তো যৌগিক আদর্শে তাঁর আবর্তিক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, যাকে বলা যায় কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই 'কালীই কুলকুণ্ডলিনী। তবে পৃথক ভাবে 'কালীর সঙ্গে আবার সর্প কেন? সে কি এই কারণে যে, দেবী কালিকা সর্পশক্তিরও নিয়ন্ত্রী দেবী?

মনীষী বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর Soul of India- গ্রন্থে 'কালীকে এমন এক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যাতে এই দেবী আদি নরগোষ্ঠীর বর্বর শক্তির প্রতীক হিসেবেই দেখা দিয়েছেন। তাঁর মতে শক্তি যখন নিতান্তই পশুস্তরে ছিলেন তখন হিন্দুরা তাঁকে জগদ্ধাত্রী রূপে কল্পনা করেছেন। দেবী জগদ্ধাত্রী সিংহ বহনা, অর্থাৎ পশুশক্তি নিয়ন্ত্রিণী হিসেবে পশুশক্তির প্রতীক সিংহের উপর বসে আছেন, অর্থাৎ পশুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই সিংহ হস্তীমুণ্ডের উপর থাবা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ পশুজগতের বিজেতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। শক্তির এই রূপ ম্যামথ যুগের।

উপজাতীয় নরগোষ্ঠী স্তরে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও উপজাতিদের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল সেই সময় তিনি ভয়ঙ্করী শক্তি 'কালীরূপে দেখা দিয়েছেন। সেই জন্য তিনি নরমুণ্ডমালিনী ও নরমুণ্ডধারিণী। তিনি নরহস্তদ্বারা কোটীদেশ আবৃতকারিণীও বটেন। তাঁর বদন রক্ত লোলুপা। সেই ভয়ঙ্করী শক্তির পদতলে ঈশ্বরও নিরুপায় নিষ্ক্রিয়।

শক্তি যখন মানব সভ্যতায় পূর্ণ ভাবে বিকশিতা হয়ে সমাজ রূপে গড়ে উঠেছেন তখন তিনি 'দুর্গারূপে দেখা দিয়েছেন। শক্তি পূর্ণ ভাবে বিকশিতা বলে দশদিক ব্যাপিনী অর্থাৎ দশপ্রহরণধারিণীম। তিনি অসুর শক্তিকে সংযত করে ও পশুশক্তিকে পদানত করে— জ্ঞান, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, পৌরুষ ইত্যাদি নিয়ে পূর্ণ ভাবে বিকাশিতা। সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জ্ঞানরূপে সিদ্ধিদাতা গণেশ, বিদ্যারূপে সরস্বতী, ঐশ্বর্যরূপে লক্ষ্মী ও বীর্যরূপে কার্তিকেয়।

হিন্দুরা পুরাণ কাহিনী ও পুরাণ ভাস্কর্যে প্রতীকের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য রেখে গেছেন। সেইজন্য দার্শনিক মানসের যাঁরা অধিকারী তাঁরা নানা ভাবে 'কালী মূর্তির মধ্যে তার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

'কালীর ইতিহাস ও পুরাণ কাহিনী হল এই ধরনের : পার্বতী-উমা, সতী ও দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলে পুরাণ ও তন্ত্রে যে মহাদেবীর বিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে আরেকটি ধারা এসে মিলেছে— কালিকা ও 'কালীর ধারা। যে-ভাবেই হোক এই 'কালী বা কালিকাই বঙ্গদেশের শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে সর্বেশ্বরী হয়ে উঠেছেন। যে-জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'কালিকা বঙ্গ দেশে চ'।

কি করে 'কালী বা কালিকার ধারাটি ভারতীয় মহাদেবীর ধারার সঙ্গে মিশে গেছে ভারতীয় পুরাণগুলি পাঠ করলে তার মধ্যে এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতীয় হিন্দু মানসিকতা সব কিছুর উৎসই বেদের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করে। অনেকেই তাই মনে করেন যে, বেদের রাত্রিসূক্তকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে যে রাত্রিদেবীর ধারণা গড়ে উঠেছে তিনিই শেষ পর্যন্ত 'কালীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অনেকে আবার বেদের নির্ঋতি দেবী থেকে দেবী কালিকার আবির্ভাব ঘটেছে বলে মনে করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্ঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবীকে 'কৃষ্ণা' ও 'ঘোরা' বলা হয়েছে। যেমন, 'কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতি' 'ঘোরা বৈ নির্ঋতি'। এই নির্ঋতি দেবী ছিলেন পাশহস্তা। এই পাশ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য সেখানে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। তবে নির্ঋতি দেবী ঐ সংক্ষিপ্ত পরিসর অতিক্রম করে আর সম্প্রসারিতা হয়েছেন বলে মনে হয় না। সুতরাং নির্ঋতি দেবীই পরবর্তী কালে 'কালীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন একথা জোর দিয়ে বলা যায়না।

বৈদিক সাহিত্যে 'কালী এই নামটি দেখতে পাওয়া যায় মুণ্ডক উপনিষদে। সেখানে যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বার নাম 'কালী, যেমন, 'কালী করালী চ মনোজবাচ।' তবে এখানে 'কালী আহুতি গ্রহণকারী অগ্নিজিহ্বা মাত্র। দার্শনিক ভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই হল অগ্নির সপ্ত জিহ্বা।

মহাভারতে একাধিক স্থানে 'কালীর উল্লেখ আছে। মহাভারতের 'কালীর সঙ্গে পুরাণের 'কালীর অনেক মিলও আছে। মহাভারতে অশ্বত্থামা রাত্রিবেলা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশের সময় যে 'কালী মূর্তি দেখেছিলেন তিনি রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা ও ভয়ঙ্করী। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতে 'কালীর এই উল্লেখ পরবর্তী কালের সংযোজনা হতে পারে। তবে এখানে 'কালীর মধ্যে দেবীত্বের আভাস নেই বললেই চলে। কালিদাসের কালেও 'কালী প্রধানা দেবীরূপে গৃহীতা হননি। কুমারসম্ভব কাব্যে 'কালী মাতৃকাগণের পশ্চাৎগামিনী ছিলেন। যেমন, 'তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনক প্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে।' রঘুবংশে তাঁকে ঘনকৃষ্ণ রাত্রি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণা তাড়কার মত মনে হয়েছে মাত্র।

মল্লিনাথ কালিকা শব্দের অর্থ কালিকা দেবী করেননি। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন 'ঘনাবলী'। তবে 'কালিদাস' নাম দেখে মনে হয় যে, কবি নিজেকে 'কালীর দাস হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। সে জন্য 'কালীর কিছুটা দেবীত্ব তখনও না ছিল তা নয়। তবে মজার কথা এই যে, 'কালীদাস' না লিখে নিজেকে তিনি লিখেছেন কালিদাস হিসেবে। এ বানান শুধু মহাকবি কালিদাসের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। এ কালির অর্থ করলে দাঁড়ায় লেখার কালির দাস।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে রক্ত লোলুপা এক ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। খিল হরিবংশে মদামাংসপ্রিয়া এই দেবীকে শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা হতে দেখা যায়। কালী প্রসঙ্গেই (ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী) বাসব দত্তায় ভগবতী বা কাত্যায়নীর কথা শুনতে পাই। কাদম্বরীতে দেবীর চণ্ডীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। বাক্‌পতি রাজে (অষ্টম শতাব্দী) 'পর্ণশবরী' বলে যে দেবীর উল্লেখ আছে তিনিও কালী। ভবভূতির মালতীমাধব (সপ্তম শতাব্দী) নাটকে বলিদানে পূজিতা যে ভয়ঙ্করী 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায় তিনিও চামুণ্ডা রূপা কৃষ্ণবর্ণা উগ্রা চামুণ্ডা দেবী। এই কালিকা ও চামুণ্ডা দেবী মহাদেবী পরমেশ্বরীর সঙ্গে মিশে গিয়ে এক শক্তিপ্রবাহের সঙ্গে যুক্তা হয়েছেন। চণ্ডীতে দেখা যায়— দেবী পার্বতীর শরীর কোষ থেকে কৌশিকী দেবী নিসৃতা হলে দেবী পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান। তিনিই তখন হিমাচলবাসিনী 'কালিকা' নামে খ্যাতা হন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবী পার্বতী বা উমার সঙ্গে এই কালিকা দেবীর যোগাযোগ করে আসলে অনার্য এই দেবীকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে তুলে আনার সময়ই এই গল্প ফাঁদা হয়েছিল বলে মনে হয়। কৌশিকী দেবীর গল্পও কুশিক জাতি পূজিতা আদি নরগোষ্ঠীর কোন দেবীকে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দিরে তুলে আনার কাহিনী বলে মনে হয়। কাত্যজাতির দেবী কাত্যায়নীকেও এই ভাবে দুর্গার গল্পের মধ্য দিয়ে আর্যবেদীতে তুলে আনা হয়েছে।

দেবী কালিকার কৃষ্ণবর্ণা হবার আরও কাহিনী আছে। শুম্ভ নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড অসুরদের সঙ্গে নিয়ে দেবীর সন্নিকটবর্তী হলে কোপান্বিতা দেবীর মুখ মসীবর্ণ হল। তাঁর ভ্রুকুটীকুটিল ললাটফলক থেকে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হয়েছিলেন। এই কালীর যে বর্ণনা সেখানে দেওয়া হয়েছে, আধুনিক মৃৎশিল্পে তৈরি কালীর রূপের সঙ্গে তা মিলে যায়। দেবী চণ্ড ও মুণ্ডকে হনন করেছিলেন বলে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা। রক্তবীজদের বদন বিস্তার করে গ্রাস করেছিলেন বলে তিনি শোণিত বদনা। তবে চামুণ্ডা রূপে দেবী দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা নন।

কালীর সঙ্গে এক সময় শিবেরও যোগ হয়ে যায়। শিব কালীর স্বামী রূপে চিহ্নিত হন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তিনি স্বামীর বক্ষারূঢ়া। হিন্দু চিন্তায় স্ত্রী স্বামীর উপর দাঁড়িয়ে আছে এমন কল্পনাই করা যায় না। সাধারণ গল্পে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই ভাবে :— যুদ্ধে অসুর নিধন করতে করতে দেবী এতই আত্মহারা হয়ে পড়েন যে, সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। তখন শিব উন্মত্তা দেবীর পায়ের কাছে নিজেকে শায়িত করে দেন। তাঁর বুকের উপর পা পড়তেই দেবীর চৈতন্য হয়। তিনি লজ্জায় জিব্ কাটেন। সেই জন্যই তিনি জিহ্বা প্রসারিত হয়ে আছেন। দক্ষিণা কালীর প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও আছে :—

'শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম।'
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম।"

শিবের বুকের উপর পা রেখে 'কালী যে দাঁড়িয়ে আছেন তার অর্থ পুরুষের বুক থেকেই শক্তির উদ্ভব হয়েছে। এই পুরুষ, যিনি মূলতঃই ক্রিয়াহীন, তথাপি অব্যক্ত ভাবে নিজের ভেতর থেকে শক্তিকে নির্গত ক'রে শবের মত পড়ে আছেন। এই পুরুষ বা শিবের সঙ্গে 'কালীর সম্পর্ক বিপরীত রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। এর অর্থ— পরম শূন্যতা রূপ পুরুষের বুক থেকে নির্গত হয়ে পুরুষকে আবৃত করেই, অর্থাৎ নিচে পুরুষ উপরে শক্তি এই ভাবে থেকে এই শক্তি জগৎ প্রসব করেছিলেন। পুরুষের সঙ্গে তাঁর সঙ্গমকে এই কারণেই 'বিপরীত রতিক্রিয়া' বলে বর্ণনা করা হয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে, সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলেই শিব অর্থাৎ পরম পুরুষ অর্থাৎ মহাশূন্যতা মহাকাল নামে পরিচিত। এই মহাকালকেই গ্রাস করেন আদ্যাশক্তি কালিকা। কালকে গ্রাস করেন বলেই তিনি 'কালী।

'কালীর বর্তমান যে রূপ বঙ্গদেশে দেখতে পাই সেই রূপ দিয়েছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। স্বপ্নে মা কৃষ্ণানন্দকে আদেশ করলেন, আমাকে মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু তখনও মায়ের কোন রূপ ছিল না। কৃষ্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপে তোমাকে প্রতিষ্ঠিতা করব?' মা জানালেন আগামী কাল ভোরেই আমার রূপ দেখতে পাবি। ঘুম থেকে উঠে ঘরের বার হতেই কৃষ্ণানন্দ দেখলেন, ঘুঁটে কুড়োনীর এক কালো মেয়ে দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। আলীঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়ে, অর্থাৎ দক্ষিণ পা বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। চলন্ত ভঙ্গীতে দৃঢ় ভাবে বাঁ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ হাতে রয়েছে একতাল গোবর। ডান হাতে ঘুঁটে তৈরি করার মত সামান্য একটু। কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিব্ কাটলো সেই মেয়ে। অর্থাৎ লাল টকটকে জিব্ বের করে তার উপর রাখল শুভ্র ঊর্দ্ধদন্তপাটি। কৃষ্ণানন্দের অন্তরে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগল। এই হল 'মায়ের মূর্তি। এই মূর্তিই 'মা তাঁকে দেখালেন। কৃষ্ণানন্দ নিজের হাতে মাটি দিয়ে তৈরি করলেন সেই মূর্তি। তারপর যথারীতি পুজো দিলেন।

নিত্যদিন পুজো দিতেন তিনি নতুন মূর্তি তৈরি করে। পরদিনই আবার বিসর্জন দিতেন গঙ্গাতে। পরে নবদ্বীপের রাজা নিজ ভবনে কার্তিক মাসের নবচন্দ্রোদয়ে বিশাল মূর্তি তৈরি করে মায়ের পূজা আরম্ভ করেন। এই রূপেই 'মা আসেন বাঙ্গালীর ঘরে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে 'মায়ের এই রূপেরই বর্ণনা দেওয়া আছে।

তবে 'মা হিন্দুবেদীতে স্থান লাভ করলেও সংস্কৃত সাহিত্যে 'কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়। বীজ মন্ত্রে 'মায়ের যে পূজা করার পদ্ধতি রয়েছে তাকেও

সংস্কৃতজাত বলে মনে হয়না। হ্রীঁ, ক্লীঁ, হেঁ, ক্রীঁ এই জাতীয় শব্দের মধ্যে সংস্কৃতের গন্ধ নেই। তা ছাড়া ফট্ শব্দের মধ্যেও সংস্কৃতের গন্ধ মেলেনা। ফট্ শব্দের অর্থ সর্বাঙ্গে। যেমন, 'ফট্ স্বাহা'— সর্বাঙ্গে প্রণিপাত করি। অবশ্য যারা সব হিন্দু পূজাকেই বেদজাত বলে মনে করেন, তাঁরা এই বীজ মন্ত্রের মধ্যেও সংস্কৃতের গন্ধ পান। যেমন এই ভাবে শব্দগুলোকে সংস্কৃত বলে দেখাবার চেষ্টা করেন :— ক্রীং (কামনা) = কামনা (ক) প্রাপ্তি শক্তি (র)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অগ্রগতি (ঈ) সৃষ্টি করে তাই হল বীজ মন্ত্র ক্রীঁ। ক্লীঁ বা কামনা = (ক) স্থূলত্বে (ল) পরিণত হয়ে যে অগ্রগতি (ঈ) সৃষ্টি করে তাই হল ক্লীং। এর ভিন্নতর অর্থও আছে, যেন বর্গাদ্য শব্দে 'ক', বহ্নি শব্দে 'র', রতি শব্দে 'ঈ' এবং, তাতে বিন্দু (ˆ) সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে ক্র। অপর পক্ষে নকুলীশ শব্দে 'হ', অগ্নি শব্দে 'র', বামনেত্র শব্দে 'ঈ' অর্ধচন্দ্র শব্দে (চন্দ্রবিন্দু) এই সব মিলে 'হ্রীঁ' ইত্যাদি।

শক্তিপূজায় তন্ত্রে দেহের ষট্‌চক্রের অধিশ্বরী ছটি যে দেবী আছেন, যেমন, ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী, এদেরও উৎস কোন সংস্কৃত শব্দ বলে মনে হয় না। এর মধ্যে কয়েকটা নাম যে বাইরে থেকে আগত তা বেশ বোঝা যায়, যেমন ডাকিনী শব্দ। তিব্বতে 'ডাক' বলে একটি শব্দ আছে— যার অর্থ জ্ঞান বা জ্ঞানী। তারই স্ত্রীলিঙ্গ ডাকিনী অর্থাৎ মহিলা জ্ঞানী। এই শব্দটিই বিকৃত হয়ে 'ডাইনী' শব্দ সৃষ্টি করেছে। ডাইনী বা ডাইন-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল— witch. Witch শব্দের উৎপত্তিও এই একই ধরনের। Anglo-saxon 'wicca' অর্থাৎ The wise one এই শব্দ থেকেই witch শব্দ এসেছে। তবে ডাকিনী শব্দকে যারা সংস্কৃত জাত বলে মনে করেন তাঁরা এর ব্যাখ্যা করতে চান এইভাবে—, যেমন 'ড' বা 'ড়' ডঙ্কানাদের মত বিস্তারিত (আ) হয়ে কাম বা ইচ্ছা (ক) যুক্ত অবস্থাতে ছুটে গেলে তার নাম হয় 'ডাক'।

ষট্‌চক্রের অন্যান্য দেবীর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুটো দেবীর অস্তিত্ব ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া গেছে, যেমন, লাকিনী ও হাকিনী। এই দুই দেবীর সন্ধান মিলেছে ভুটানে। মনে হয়, ষট্‌চক্রের ছটি দেবীর অস্তিত্ব হিমালয় সংলগ্ন দেশগুলিতেই ছিল যাকে বলা হয় মহাচীন। শক্তিপূজার ধারা সেখান থেকেই আসতে পারে। কারণ দেখা যায়, শক্তিপূজায় যে ফুলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি, জবা, তার অস্তিত্ব মহাচীন অঞ্চলেই ছিল— যে জন্য তাকে বলা হয় China Rose.

তন্ত্রে বহু নামের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে, যেমন, মাতঙ্গী = পতিতা স্ত্রীলোক, পিশাচী যোগিনী = তুকতাককারিণী নারী, ডাকিনী = মড়াখেকো রমণী, ইত্যাদি। তন্ত্রমতে ডাকিনী, শাকিনী, লাকিনী ও হাকিনী শব্দের অর্থ যথাক্রমে— জ্ঞানী যোগিনী, সুবেশা যোগিনী, জীর্ণশীর্ণা ক্ষুধাতুরা যোগিনী ও ভীষণ

চিৎকারকারিণী যোগিনী।

তন্ত্রযোগে দেহের যে ষট্ চক্র আছে সেই ষট্‌চক্রের মূলাধার চক্রের দেবীর নাম ডাকিনী ; এর অর্থ গতিময়ী জ্ঞান। ভিন্নমতে এই চক্রের দেবীর নাম শাকিনী। 'শক', শক্তি থেকেই শাকিনী শব্দ এসেছে। এর অর্থও গতিশক্তি। এই ক্ষেত্র হল বস্তুসত্তার ক্ষেত্র। স্বাধিষ্ঠান চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'রাকিনী'। রাকিনী মধ্যমা শক্তি। ভিন্ন মতে এই চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'কাকিনী'। কাকিনী হল মেদের শক্তি। মণিপুর চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'লাকিনী'। লাকিনী অর্থ প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রিত গতিশক্তি। ভিন্ন মতে এই শক্তি জীবের মেদে ক্রিয়াশীলা। অনাহত চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কাকিনী। ইনিও মধ্যমা শক্তি। ভিন্নমতে এঁর নাম রাকিনী। রাকিনী অর্থ রক্তের প্রাণশক্তি। বিশুদ্ধ চক্রের দেবীর নাম শাকিনী। এর অর্থ তৃপ্তিদায়িনী শক্তি। বৌদ্ধ তন্ত্রের মতে এই নামের অর্থ 'সুবেশা যোগিনী।' ভিন্নমতে তার নাম ডাকিনী। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি। অনেকে এই শক্তিকে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তিবর্ধিকা শক্তি বলে মনে করেন। আজ্ঞা চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'হাকিনী' অর্থাৎ যিনি হাঁক দিয়ে শব্দ করেন— অর্থাৎ Big Bang-এর শব্দশক্তি তিনি। বৌদ্ধরা এঁকে বলেন যোগিনী— যিনি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করেন। তিনিই হলেন কৃষ্ণগহ্বর বা Black-hole-এর অভ্যন্তরস্থ বিশৃঙ্খল শক্তি। কারো মতে ইনি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রাণশক্তি।

এই সব নামধাম ও অর্থ লক্ষ্য করার পর তন্ত্রকে বৈদিক সংস্কৃত জাত বলে মনে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ সবই বৈদিক সভ্যতার চৌহদ্দীর মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। নইলে তন্ত্রের ধারায় শক্তিসাধনার ব্যাপারটাই অনার্য। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় এর উপর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। 'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থে প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তন্ত্রতত্ব ঢুকে যাওয়াতেই-এর যথার্থ গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে গেছে। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার ফলে তার আদ্যাশক্তি হারিয়ে গেলেও তন্ত্র যে শোভাহীন হয়ে পড়েছে তা নয়। বরং তন্ত্রের আধ্যাত্মিক রশ্মি অনেক বেশী খুলেছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে কালীর প্রচলিত রূপের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। পার্বতীর একটি প্রশ্নের উত্তরে শিব সেখানে এইভাবে জবাব দিচ্ছেন : হে প্রিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাধকদের কাজের জন্য গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হয়। শ্বেতপীত ইত্যাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয় সর্বভূত সমূহ তেমনই কালীতে প্রবেশ করে। যোগিদের হিতের জন্য সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ হয়েছে। অমৃতত্ব হেতুই এই নিত্য কালরূপা অব্যয়া কল্যাণরূপিণীর ললাটে চন্দ্র চিহ্ন নিরূপিত হয়েছে। নিত্যকালীন চন্দ্র সূর্য অগ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ দর্শন করেন বলে তাঁর তিনটি নয়ন কল্পিত হয়েছে। সর্ব প্রাণীকে গ্রাস করেন বলে

এবং কাল দণ্ডের দ্বারা চর্বণ করেন বলে তাদের রক্তসমূহ এই দেবীর বসনের রূপ নিয়েছে। বিপদে আপদে জীবকে রক্ষা করে নিজ নিজ কার্যে প্রেরণা দেন বলে তাঁর হাতে বর ও অভয় প্রদান করা হয়েছে। রজোগুণজনিত বিশ্বসমূহকে তিনি ব্যাপ্ত করে অবস্থান করেন। এই জন্য তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলে কথিতা হন। মোহময়ী সুরা পান করে সেই সর্বসাক্ষী স্বরূপিণী দেবী কালসৃষ্ট ক্রীড়ামগ্ন সৃষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পবুদ্ধি ভক্তদের জন্য গুণ-অনুসারে দেবীর বিভিন্নরূপ কল্পিত হয়ে থাকে।

সুতরাং যাঁর কাছে দেবীর যে রূপ ধারণার মধ্যে ধরা পড়েছে তিনি সেইভাবেই এই মহাশক্তির রূপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'হিন্দু পূজা রহস্যের তাত্ত্বিক ও যৌগিক ব্যাখ্যা' গ্রন্থে স্বামী হরিহরানন্দ গিরি 'কালীর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন : " 'কালী শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে কাল + ঈ = 'কালী। কালের সঙ্গে 'ঈ'-শক্তি যুক্ত হয়ে 'কালী হয়েছেন। 'ঈ' হচ্ছেন ঈশ্বরী, সগুণব্রহ্ম। 'কালী হচ্ছেন কালকে উপলব্ধি করার প্রাণশক্তি।"

তিনি মহাশক্তির রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : " 'কালী 'যে উলঙ্গ, তার তাৎপর্য আছে। মহাকালী আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে কল্পন করছেন। তাই 'কালী শক্তিরূপে প্রকাশিতা। আমরা যদি কান ঢেকে রাখি তবে শ্রবণশক্তি থাকবে না ; যদি চোখ বুজে থাকি দর্শন শক্তি থাকবে না ; যদি মুখ বন্ধ করে থাকি তবে ভোজন শক্তি, বাক্ শক্তি রহিত হব। শরীরের অন্যান্য শক্তি সম্পর্কেও একই কথা। তাই দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, প্রাণশক্তি, কামশক্তি সবই অনাবৃত রাখতে হবে। 'আবরণ' প্রকাশকে রুদ্ধ করে। সেই জন্যই মহাকালীর মূর্তিকে বিবস্ত্রা করে কল্পনা করা হয়েছে। যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পরিব্যাপ্ত তাঁকে আবৃত করা সম্ভব নয়। এই জন্যই তিনি দিগ্‌বসনা, দিগম্বরা।

সাধারণ লোকের ধারণা, 'কালী তাঁর স্বামীর বুকে পা দিয়েছেন-বলেই লজ্জায় জিব্ কেটেছেন। কিন্তু আসল তাৎপর্য তা নয়। 'কালী আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তির অর্থ হল অদনময়ী। অদন মানে ভোগ। আমরা যা কিছু ভোগ করছি তা শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা করছি না, করছি সর্বাঙ্গ দিয়ে। তবু ভোগের বা আস্বাদনের পাত্র হল জিব্। 'কালী ভোগময়ী। তাই সেই আদ্যাশক্তির লোলুপ জিহ্বা সর্বদা প্রসারিত হয়ে আছে। প্রতি জীবে জীবীভূতা 'কালীর লোলুপতা প্রসারিত।

মহাকালীর কণ্ঠে যে পঞ্চাশটা মুণ্ড দেখি তা পঞ্চাশটি মাতৃকা বা জীবন্ত 'কালী শক্তি। অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি অক্ষর বা বর্ণরূপে তা প্রকাশিত। এই অক্ষরগুলো জীবশরীরের কণ্ঠদেশে ঈশ্বররূপে বিরাজ করে। বর্ণ শব্দ ও বাক্য আকারে প্রতিটি মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে চর্বিত হয়ে মাতৃকারূপে প্রকাশিতা

হয়েছে। নিগুর্ণস্বরূপা 'মা' সেজন্য জীবের মধ্যে জীবীভূতা হয়ে বাঙ্‌ময়ী রূপে সগুণা স্বরূপা সেজেছেন।

'কালী' মূর্তির অধরোষ্ঠে রক্তধারা দেখা যায় একে আমাদের মুখ নিঃসৃত রসাল গন্ধগুচ্ছ বলা যেতে পারে। 'কালী' ভেতর থেকে কলকলরূপে কলন করছেন। ফলে এই বর্ণগুলো জিবে দাঁতে পিষ্ট হয়ে বাক্য ও গল্পের আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা সাধারণ মানুষ সেই কথায় গল্পে আমোদিত হয়ে আছি। সেই রস আস্বাদন করছি।

মহাকালীর দুটি বাম হস্তে রয়েছে মুণ্ড ও খড়্গ। প্রতিজীবে জীবীভূতা হয়ে থাকেন মহাকালী। অন্যায় কাজের সামনে প্রতিটি মানুষ যদি বিবেকী শক্তির দ্বারা নিজের মুণ্ড নিজের হাতে চেপে ধরে রাখতে না পারে তবে তার দ্রুত উত্থান সম্ভব নয়। সে ব্যবহারিক জগতে চলতে গিয়ে অনেক ভুল করবে। ভুল করলে অবশ্য শাস্তি পেতে হবে। খড়্গ শাসনের প্রতীক। আবার জীবরূপী 'কালী' যদি সব সময় তার সমনে এই বিবেকরূপ অস্ত্র দেখে তবে নিশ্চয়ই সে ভুল করবে না। অন্তর্নিবাসী মহাকালের কাছ থেকে বর ও অভয় পাবে। 'কালী' মূর্তির দুটি দক্ষিণ হাতে তাই অভয় ও বরদ মুদ্রা দেওয়া হয়েছে।

'কালীর মূর্তি যে সম্পূর্ণ রূপক তাতে সন্দেহ নেই। আমরা দেখছি মহাকাল শিবের বুকের উপর পা দিয়ে মহাকালী দাঁড়িয়ে আছেন। যিনি মহাকাল, বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তাঁর উপর দিয়ে আমরা চলেছি। অথচ এই জ্ঞান আমাদের নেই। আমরা সবাই নির্গুণ ব্রহ্ম হলেও জীবীভূত মহাকালী হয়ে শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছি। শিব ও কালীর যে মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে তা শুধু এই ভাবেরই প্রতিমূর্তি। মহাকাল ও মহাকালী আসলে দেহতত্ত্ব। শুধু মানুষের দেহের মধ্যে নয়, বিশ্বের অণু পরমাণুতে, সমস্ত জীব শরীরে, যেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানকার সব সত্তায় এই শিবশক্তি প্রকৃতি-পুরুষরূপে মূর্তি ধারণ করেছে। এই ভাবরূপকে মহাকাল ও মহাকালীর মধ্যে অভিব্যক্ত করা হয়েছে।"

আসলে ভারতীয় ভাস্কর্যই হল এক ধরনের প্রতীকী ভাষা। এই ভাষা infinite suggestion পূর্ণ। সুতরাং ভারতীয় ভাস্কর্য একটি মহৎ কবিতার মতই অসীম ইঙ্গিতময়তায় পূর্ণ। ঐ একই মূর্তি থেকে ভিন্নজনে ভিন্ন দ্যোতনা পেতে পারেন।

আমার নিজের মনের মধ্যে 'কালী' সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত এসেছে তা এই ধরনের, যে কথা আমি আমার Revealed Mysteries Of The World Divine গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলেছি। আমার বক্তব্য এই ধরনের : প্রাচীনকালে জনগণের হাতে নৈর্ব্যক্তিক ভাব প্রকাশ করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান ছিল না। যাঁরা যেভাবে পেরেছেন সেভাবেই তাঁরা তাদের ভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

এক্ষেত্রে চিত্র ও ভাস্কর্য তাদের বিরাটভাবে সাহায্য করেছে। চিত্র থেকেই pictorial language-এর উদ্ভব ঘটেছে। সেটাই পরে কীলক লিপি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে ভারতবর্ষে অবশ্য শব্দের উৎপত্তি একেবারে বৈজ্ঞানিক, যে কথা বর্তমানে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। তবুও প্রাচীন ভারতবাসী ভাস্কর্য-ভাষাও দারুণ পছন্দ করেছিলেন। সেই হিসেবেই পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রকল্প ও মূর্তিগুলি এসেছিল।

প্রাচীন সব দেশেই তাদের বক্তব্য প্রকাশের বিভিন্ন উপায় ছিল। প্রাচীন গ্রীস তাদের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিল জ্যামিতিকে। দূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন ও জাপানে বিপরীত ধর্মী অসম্ভব প্রস্তাব রেখে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা চলত। ভারতবর্ষ পুরাণ কাহিনী, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা চলত। ভারতীয় ভাস্কর্য কি করে ভাষার কাজ করত 'কালী প্রতিমার মধ্য দিয়েই তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'কালী প্রতিমার মধ্য দিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

মহাশূন্যতাতে যে ভাবেই হোক তার অন্তর্নিহিত শক্তি কোথাও ঘনীভূত হয়েছিল। এই ঘনীকরণ এত প্রচণ্ড হয় যে, ঘনীকরণের চাপ সে সহ্য করতে পারে না। তখন তার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণ থেকেই প্রচণ্ড শব্দ হয়েছিল— যাকে বলে বা ওঁ। এই শব্দ একাধটি তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এক্যতম তরঙ্গে অণু সৃষ্টি করে। এই অণু সমূহের পারস্পরিক সংমিশ্রণে বস্তু বিশ্বের সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষে এই মহাশূন্যতাকে বলা হয় সৎ। সেই মহাশূন্যতার মধ্যে বিস্ফোরণের আবেগ পর্যায়কে বলা হয় চিৎ— যেখানে শূন্যতার বুকে দ্বিতীয় বিহীন 'আমি' বোধ জন্মে অর্থাৎ তুমি ব্যতিত 'শুধুমাত্র আমি' এই বোধ জন্মে। যখনই "আমি বোধ' জন্মে তখনই মহাশূন্যতার বুকে ঘনীভূত শক্তির বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘনীভূত শক্তিকেই ভারতীয়রা বলে 'কাম'। এই বিস্ফোরণ ঘটলেই আদ্যা শক্তির মধ্যে যে চার ধরনের শক্তি ছিল তার পৃথকীকরণ ঘটে। বিজ্ঞানে একে বলে symmetry breaking. এই symmetry breaking-এর ফলে চার ধরনের শক্তি নির্গত হয়— strong nuclear force, Electro magnetic force, Gravity ও weak nuclear force.

এর পরই প্রচণ্ড আদ্যাশক্তি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। এই ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াই হল বিজ্ঞানের ভাষায় quantum leap. সেই আদি শক্তি বাইরে থেকে অদর্শনীয়ভাবে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর সময় নিয়েছিল দর্শনীয় বর্ণের আকারে দৃষ্টিগোচর হতে। দর্শনযোগ্য হবার পূর্বের যে ধাবমান অন্ধকার তাকেই বলে আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তিই 'কালী'। অবশ্য এই কালো রঙের

জন্যই যে তিনি 'কালী' তা নন। তাঁর গতির সঙ্গে সঙ্গেই কালের অর্থাৎ সময়ের উদ্ভব হয়েছিল বলেই তিনি কালের জননী বা অধীশ্বরী হিসেবে 'কালী'। তিনি অদৃশ্য ও ধারণার অতীত বলেই তাঁকে কালো বর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। সেই আদ্যাশক্তিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমরূপ গুণের প্রকাশ হবার সময় পর্যন্ত হয়নি, যাকেই আমাদের দেশে বলা হয় পাশ বা বস্ত্র। সুতরাং আদ্যাশক্তির পরিধানে কোন বস্ত্র নেই। তবে তাঁর মধ্যেকার যে চারটি শক্তি এই বিস্ফোরণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল তাইই এই আদ্যাশক্তির চার হাত রূপে কল্পিত হয়েছে। যে একান্নটি তরঙ্গে আদ্যাশক্তি জগৎরূপে বিবৃতা হয়েছিলেন সেই একান্নটি তরঙ্গই 'মায়ের গলায় ও হাতে শোভা পাচ্ছে। গলায় আছে পঞ্চাশটি বর্ণ। একটি অদৃশ্য, কারণ যে তরঙ্গের প্রতীক হিসেবে সেই তরঙ্গ কাজ করেছে তা অনুদের নয়। উনপঞ্চাশটি ভিন্ন তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন রঙে মায়ের গলায় শোভা পাচ্ছে। হাতের মুণ্ডটি একান্নতম। সেখানেই অণুর উদ্ভব। অর্থাৎ বস্তুমাত্রিক জগতের প্রথম প্রকাশ। 'মায়ের দক্ষিণ দুই হস্তের বর ও অভয় মুদ্রায় রয়েছে Strong nuclear force ও Gravity. ঊর্ধ্ব বামহস্ত যাতে 'মা খড়্গ ধারণ করে আছেন তাতে আছে Weak nuclear force. নিম্ন বাম হস্তে রয়েছে Electro-magnetic force.

'মায়ের দীর্ঘ প্রসারিত জিহ্বা খেচরী মুদ্রার প্রতীক। যোগিরা যখন ভূমি ত্যাগ করেন, তখন এই খেচরী মুদ্রার সাহায্যেই দেহের ভারসাম্য রক্ষা করেন। সুতরাং 'মায়ের জিহ্বা এটাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিতে তিনিই ভারসাম্য রক্ষা করছেন। তাঁর আলুলায়িত কেশ হল প্রচণ্ড শক্তির প্রতীক। প্রাচীনকালে মানুষ কেশকে শক্তির প্রতীক বলে 'মনে করত। কারণ, তারা লক্ষ্য করেছে যে, শিশুকালে জীব বিরল-কেশ থাকে। তরুণ বয়সে প্রচুর কেশ থাকে। বার্ধক্যে আবার বিরলকেশ হয়। শিশুকালে জীব দুর্বল থাকে, যৌবনে সবল হয়, আবার বার্ধক্যে দুর্বল হয়। সুতরাং কেশ শক্তির সঙ্গেই যুক্ত। 'মায়ের ঘনকৃষ্ণ আলুলায়িত কেশ দ্বারা সেই শক্তিকেই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'মায়ের পায়ের নিচে যে শবের মত শিবকে দেখানো হয়েছে তার অর্থ এই যে, মহাশূন্যতার যে অংশ থেকে শক্তি নির্গত হয় সেই অংশ নির্বিকার শবের মতই থাকে। শিবের বা মহাশূন্যতারূপী পুরুষের বর্ণ শাদা করার অর্থ, মহাশূন্যতার মধ্যে 'আমি' বোধ জন্মালে তবেই সৃষ্টি হয়েছে। এই যে বোধ বা জ্ঞান, শিল্পে তার বর্ণ শাদা। যেমন জ্ঞানের দেবী বাক্ বা সরস্বতীর রঙ শাদা। সরস্বতীর বাহন হংসও শাদা। হংসকে সরস্বতীর বাহন করার অর্থ তিনি হলেন দ্বিতীয় বিহীন আমি বোধের অবস্থার উপর স্থিত। আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিই তার শব্দ হয় হ (শ্বাস) ও স (প্রশ্বাস)-এর মত। এই দুই অবস্থা যোগিদের যোগে যখন কুম্ভকে ঐকাবদ্ধ

থাকে— তখনই যোগীদেরও সম্যক জ্ঞান হয়। এই যোগীরা পরমহংস হন। সেই কারণেই দ্বিতীয় বিহীন আমি বোধ সম্পন্ন যে চিৎশক্তি সেই শিবের বর্ণ শাদা। এই দ্বিতীয় বিহীন আমি বোধের পর্যায়েও শিব নিষ্ক্রিয়ই থাকেন। তাই তিনি 'মায়ের পায়ের নিচে মড়ার মত পড়ে আছেন। তবুও তিনি 'কালীর স্বামী— কারণ তাঁর থেকেই কালের এই অধিশ্বরীর উদ্ভব হয়েছিল। যার থেকে জন্ম হয় তাঁকে পিতাও বলা যেতে পারে বা owner বা স্বামীও বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে বৈদিক সাহিত্যে আত্মজার সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্কের বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ মহাশূন্যতা থেকে জাত শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্ককেই সঙ্গম বা রমণ বলা হয়। সুতরাং আত্মজার সঙ্গে যৌন সম্পর্কের যে কথা ঋগ্বেদাদিতে বলা হয়েছে তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। 'কালীকেও এই কারণেই তন্ত্রসাহিত্যে রমণী বলা হয়। কারণ তিনি সরাসরি মহাশূন্যতার সঙ্গে রমণ ক্রিয়ায় যুক্ত বলে তাকে রমণী বলা হয়।

এই যে মহাশক্তি তাঁর একান্ন ধাপে একান্নটি বর্ণ আছে—যাই নাকি অক্ষর বা বর্ণ প্রতীকে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে ধরা পড়েছে। একান্নটি বর্ণশক্তিরূপে 'কালীরও একান্নটি বর্ণ আছে। যেমন 'তারারূপে তিনি নীলবর্ণা। শ্বেতকালী রূপে তিনি শ্বেতবর্ণা। আবার শ্যামাকালী হিসেবে শ্যামবর্ণা। লাল বর্ণের কালী থাকাও সম্ভব। তা ছাড়া 'কালীর একান্নটি রূপ একান্নটি তরঙ্গশক্তিরও প্রকাশক বটে। শ্মশান 'কালীর দু'হাত দেখা যায়। এখানে তিনি ধ্বংসের প্রতীক মাত্র। তাঁর দুই হাতে মাটির ও অ্যান্টিমাটির থাকে— যাদের পরস্পর সংঘর্ষ হলে ধ্বংস অনিবার্য। দশ মহাবিদ্যারূপেও এই শক্তির নানা রূপ। দশ মহাবিদ্যারূপে শক্তির এই নানা রূপের অর্থ এই রকম : আদ্যাশক্তি হিসেবে 'কালী কৃষ্ণবর্ণা। দেশশক্তি হিসেবে তাঁর নাম 'তারা। তিনি নীলবর্ণা। 'এরা নিত্য অব্যয়া ও কল্যাণময়ী। অকৃতত্ব প্রযুক্ত বলে এঁদের ললাটে চন্দ্রকলা। দেশ ও কাল অনন্ত বলে এঁরা আবরণশূন্যা। সেই কাল ও আকাশ থেকে যে শক্তির উদ্ভব তিনিই সর্বশক্তি সম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শী। শক্তির বল চিরকালই অক্ষুণ্ণ। তিনি চিরযৌবনা। তিনি সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠা বলে রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বলবীর্য। তাই সর্বশক্তিরূপিণী রাজরাজেশ্বরীকে ধ্যান করেন পঞ্চ দেবতা (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।) কারণ, এই শক্তিই তাদের উৎস। 'কালী 'তারা মহাবিদ্যা থেকেই ষোড়শীর উৎপত্তি।

চতুর্থ শক্তি ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুই রূপ কোমল ও প্রচণ্ড। ভুবনেশ্বরী শক্তির মনোহারিণী রূপ। পঞ্চম শক্তি ভৈরবী। ভৈরবী চণ্ড শক্তি। অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হয়ে তন্ত্রে অষ্ট নায়িকা। তিনিই আবার ছিন্নমস্তারূপে ষষ্ঠবিদ্যা। ভগবতী সকল মূর্তিতেই বিশ্বপালিকা। কারণ, তিনি যেমন সৃষ্টির কারণ তেমনই

স্থিতিরও মূল। ছিন্নমস্তারূপে পালিকা শক্তি প্রবল হলে প্রকৃতি ভৈরবী থেকে ভিন্ন হন।

ছিন্নমস্তার তিন রুধির ধারাতে আছে অন্নপূর্ণার ত্রিধাশক্তি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপা হন অন্নপূর্ণা। তাই তাঁর রুধির হল ত্রিধরা। জগৎ ভোক্তারূপে নিজ জগদ্দেহ থেকে ভোগ্য সংগ্রহ করছেন প্রকৃতি। আবার ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করে পরিপুষ্ট ও পালিতা হচ্ছেন। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিনই পৃথক শক্তিরূপে বিরাজমানা একই মহামায়া। ভোক্তা থাকতে পারে, ভোগ্যও থাকতে পারে, কিন্তু ভোগ না হলে পুষ্টি নেই। জগতের পালনের জন্যই ভোগ। তাই ত্রিরুধির ধারার একটি ধারা ছিন্নমস্তা পান করছেন স্বয়ং, অপর দুই ধারা পান করছেন একান্ত দুই সখী ভোক্তা ও ভোগ্য, শক্তিরূপা। সেইজন্য তাঁরা স্বতন্ত্র দেহী। ছিন্নমস্তায় আছে অন্নপূর্ণার জগৎপালন রীতি। কিন্তু ভোগই তো শেষ কথা নয়, ভোগ শেষ হলেই আছে প্রলয়। তাই ছিন্নমস্তার পর সপ্তম মূর্তি হল ধূমাবতীর। জগতের ভোগ শেষ হলে জরাজীর্ণা ভগবতী আসেন বৃদ্ধা বেশে, কাকধ্বজ যমের প্রলয় রথে চড়ে ক্ষুধাতুরা ও বিস্তৃতবদনা হয়ে। সকল সৃষ্টিকে কুলায় সংগ্রহ করে নিজের উদর পূর্ণ করেন তিনি। ধূমাবতী তাই প্রলয়রূপিণী ভৈরবীর ভয়ঙ্করী মূর্তি। অষ্টম মূর্তি রক্তবর্ণা রজোরূপিণী বগলা। এই মূর্তিতে দেবী ঘোরতর বেদবিরোধী অসুরকে বিনাশ করেন। সেই অসুর নাশে যে জ্ঞানের উদয় সেই নির্মল জ্ঞানরূপিণী ভগবৎ শক্তিই নবম মূর্তি মাতঙ্গী। মাতঙ্গীরূপে বিশ্বরূপিণী শক্তি অজ্ঞানরূপ অবিদ্যানাশিনী কৃষ্ণাঙ্গী তমোরূপিণী শক্তি। এই সকল শক্তিধারিণী হয়ে শক্তি অষ্ট ঐশ্বর্যশালিনী কমলারূপে জগৎ ব্যাপিনী। দশম মূর্তিতে হলেন কমলা। যে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার কমল আসনরূপ কারণবারি থেকে সঞ্জাত সেই কমলেই কমলার ব্রাহ্মীশক্তি ও অপর বিদ্যারও আসন।

সুতরাং 'কালীর নানারূপের বর্ণনা রয়েছে। ভাব অনুযায়ী এক এক মূর্তি রয়েছে। তাঁর চরণ সম্পাতের মধ্যেও নানা ধরনের ইঙ্গিত। যদি দক্ষিণ চরণ আগে থাকে তাহলে মঙ্গলের প্রতীক। বামচরণ আগে হলে ধ্বংসের প্রতীক। শিবের বুকে 'কালী দাঁড়িয়ে থাকলে তার এক অর্থ। আবার শিব 'কালীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকলে তার এক অর্থ। কোন এক মিশনে 'কালীর বুকের উপর শিবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জনৈকা মহিলা বর্তমান গ্রন্থের লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এর অর্থ কি? মিশনের কোন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করে এ-প্রশ্নের নাকি তিনি জবাব পাননি। লেখক তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, 'কালী শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকলে হয় মহাশূন্যতার বুকে বিশ্বপ্রকৃতির উদয়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে Big Bang জাত বিশ্ব যা আজও বর্ধমান। শিব 'কালীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে

থাকলে তার দ্বারা বোঝায় বিশ্বপ্রকৃতির লয়— বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে Big Crunch. এই ভাবে মূর্তিশিল্পে বা ভাস্কর্যশিল্পে প্রত্যেকটি শিল্পের এক একটি বক্তব্য আছে। সে বক্তব্য বুঝতে পারলে রহস্যের জট খুলে যায়।

তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হিন্দুদের যে প্রতিমা তা কি কল্পনা থেকে জাত রূপ মাত্র? এর কোন বাস্তবিক অর্থে যথার্থতা নেই? তাহলে কি সত্যি সত্যিই হিন্দুরা পৌত্তলিক? প্রশ্ন হল ভাস্কর্য যদি ভাষা হয়— তাহলে তা পুতুল হবে কি করে? তাহলে যে-কোন ধর্মগ্রন্থই তো পুতুলে ভরা। যাঁরা নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলেন তাঁদের ঈশ্বরও পুতুল মাত্র। কারণ, তাঁদের কথা তাঁরা ভাষা দিয়েই বলেন।

কিন্তু বহু হিন্দু সাধককে দেখা যায় তাঁরা দাবি করছেন যে, জীবন্তরূপে তাঁরা মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। এই রহস্যের গোপন সূত্র যদি জানতে হয় তাহলে পরমাত্মার স্বরূপ আগে বুঝতে হবে। পরমাত্মা একদিকে যেমন মহাশূন্যতা, অপরদিকে তেমনই মহাশূন্যতাজাত সব কিছুই তিনি। জড়, অজড়, সর্বত্র সব কিছুতেই তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। বিজ্ঞানও এখন সবকিছুর মধ্যে প্রাণ ও মনের সন্ধান পেয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মানস উপাদানে তৈরি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীরাও এখন অব-আণবিক পর্যায়ে শক্তির লীলা লক্ষ্য করে সে কথা বলছেন— যেমন, বৈজ্ঞানিক এডিংটন বলেছেন যে, The world is made of mind stuff. মরমিয়ারা সব কিছুর মধ্যেই এই প্রাণ ও মনের সাক্ষাৎ পেয়ে সেই জন্যই সর্বপ্রাণবাদ বা animism-এর জন্ম দান করেছিলেন। বর্বরদের fetishism-এর মধ্যেও এইজন্য সত্যতা আছে।

মরমিয়ারা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মহাশক্তি জাত দেশ এক ধরনের মানস শক্তিসম্পন্ন বিস্তার মাত্র। যে-কোন চিন্তাতরঙ্গে সাড়া দিয়ে তা অনুরণন জাগাতে পারে। মানুষ যে ধরনের চিন্তা করে সেই দেশীয় আত্মা ফটোর নিগেটিভের মত তা ছাপ ফেলে গিয়ে চিত্র অঙ্কন করে রাখে। চিন্তার গতি অনুযায়ী তা চলচ্চিত্রের মত জীবন্ত হয়েও থাকে। মানস শক্তি দ্বারা পরমাত্মার সেই ফিল্ম-এ সাড়া জাগানো গেলেই কাহিনীর মত জীবন্ত হয়ে তা চলতে শুরু করে। নইলে জগতের সব কিছুর রূপই মূলতঃ নিরাকার। আমরা যেমন যথার্থ অর্থে নিরাকার হয়েও বিশেষ বিশেষ চিন্তা তরঙ্গের রূপ ধরে আছি, দেবদেবীরাও তেমনই। ঋগ্বেদে দেবদেবীদের কোন মূর্তি ছিল না। ভাস্কর্যে যখনই তা রূপের মধ্যে ধরা পড়ে তখনই তা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠে। যে যেমন ভাবে, তেমনই ভাবে সব কিছু দেখতে পায়। চিত্রশিল্পী তাঁর মানসলোকে যে ছবি দেখতে পান সেই ছবি আঁকেন। ভাস্কর যে রূপ মানসনেত্রে দেখেন সেই রূপই খোদাই করেন। সাধক যেমন ভাবেন মানস জগতে তেমন ভাবেই তাঁকে দেখতে পান। মাতৃরহস্যের গোপন সূত্র রয়েছে এরই মধ্যে।

১৪। কামাক্ষা বা কামাখ্যা ঃ অসম বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি তা ছিল প্রাচীনকালে কামরূপ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। অসমের বর্তমান জেলা কামরূপের মধ্যে এখনও সেই অতীত কামরূপের স্মৃতি বেঁচে আছে। কামরূপের রাজধানীর নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর, বর্তমানে যাকে বলা হয় গৌহাটি বা গুয়াহাটি। প্রাগজ্যোতিষপুর অর্থ হল প্রাচ্য জ্যোতির্বিদ্যার নগরী। হাজার দেড়েক বছর আগে কামরূপ রাজ্য যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা মনে হয় না। সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমগ্র পূর্ববঙ্গও এর মধ্যে ছিল। ভুটানের দুর্গম পর্বতমালাও কামরূপের বাইরে ছিল না। ভুটানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে কামরূপের শাসকেরা তামা সংগ্রহ করতেন। কামরূপের শাসকেরা যেমন ছিলেন শক্তিশালী তেমনই ছিলেন যোদ্ধা জাতীয়। বংশ পরম্পরায় কামরূপের শাসকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে হিন্দু ব্রাহ্মণেরা এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত কামরূপের অধিবাসিরাও হিন্দু হয়ে যান।

অনেকেরই বিশ্বাস ভারতীয় তন্ত্রের বিকাশ প্রাগজ্যোতিষপুরেই হয়েছিল। তন্ত্রের মাধ্যমে এখানে মাতৃশক্তিরই বেশি আরাধনা হত। এই মাতৃশক্তি ছিলেন ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি বা তাঁর পত্নী। শিবের শক্তি হিসেবে তিনি 'দেবী' নামে কথিতা হন। এই মাতৃশক্তির সঙ্গে যৌনতা ও জাদু ক্রিয়ার একটা রহস্য জড়িয়ে আছে। কামাক্ষাও এই অর্থে দেবী— দেবাদিদেব শিবের শক্তির একটি বিশেষ রূপ। গৌহাটির কাছে নীলাচল পাহাড়ে অন্যাবধি দেবীর মন্দির রয়েছে।

গল্প আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবের পত্নী সতী অনাহূতা হয়ে গেলে তিনি দক্ষের মুখে নিজ পতি শিবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। মর্মাহত শিব দক্ষযজ্ঞ নাশ করে মৃতা পত্নীর দেহ কাঁধে নিয়ে উন্মাদের মত বিশ্বপরিক্রমা শুরু করেন। সৃষ্টি নাশ হবার উপক্রম হয়। বিষ্ণু তখন এই বিপদ থেকে জগৎকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র দিয়ে শিবের কাঁধ থেকে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেন। যেখানে সতীর দেহের যে অঙ্গ পড়ে সেখানেই একটি করে শাক্তপীঠ সৃষ্টি হয়। সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বলে গল্প আছে। সেই থেকে মহাতীর্থ একান্নটি শাক্তপীঠের সৃষ্টি হয়েছে— যার কথা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। সতীর যোনি পতিত হয়েছিল কামগিরি পাহাড়ে। এখানে তাই যোনিপীঠ গড়ে উঠে। নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, হয় তো এই পীঠের সঙ্গে প্রাচীনতম পৃথিবী মাতার অর্থাৎ সকল জীবের জননী তত্ত্বও মিশে গেছে।

কামগিরি অঞ্চলের কামরূপ নাম হবার পেছনে গল্প এই ধরনের ঃ— সতীর দেহ শিবের স্কন্ধ থেকে নিপাতিত হলেও শিবের আচ্ছন্ন ভাব দূর হয় না। শিব ধ্যান মগ্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার উপক্রম হন। শিব হলেন অপটিমাম মোশন।

এই মোশন বা গতি বন্ধ হয়ে গেলে জগত ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং শিবকে আত্মস্থ হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। আত্মস্থ ভাব থেকে কাউকে নিবৃত্ত করতে হলে মনের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি বা বৃত্তির জাগরণ প্রয়োজন, যাকেই বলে কাম। শিবের মনের মধ্যে কাম রিপুর জাগরণের জন্য দেবতারা তাই মদন দেবকে শিবের ধ্যান ভগ্ন করাতে ডাকলেন। মদন তাঁর ফুলশরে শিবের মনে কাম জাগরিত করলেন। ধ্যানভগ্ন শিব চোখ মেলে তাকিয়ে মদনকে সেই কাজ করতে দেখে এতই ক্রুদ্ধ হলেন যে, নেত্র নির্গত বহ্নিতে তাকে ভস্মিভূত করে দিলেন। পরে দেবতাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে কামকে তার রূপ ফিরিয়ে দিলেন। যে ভূমিতে কাম তার রূপ ফিরে পেয়েছিলেন তারই নাম কামরূপ।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে যে, ভূটানের দক্ষিণ ডলু অঞ্চলে ও আকা পাহাড়ে মাঝে মাঝেই আগুন লাগে। বহু দূর থেকে সেই অগ্নিশিখা দেখাও যায়। লোকে এখনও মনে করে যে, দক্ষযজ্ঞের অগ্নিশিখাই এই দীপ্তি বিতরণ করছে।

এই কামরূপের দেবীই কামাক্ষা। অসমের শাসকেরা এঁকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন। অহম ও কোচ রাজারা এই দেবীর উপাসক ছিলেন। কামরূপের কোচ রাজা নরনারায়ণ শাক্ত ছিলেন। কামাক্ষা দেবীর মন্দির তিনি নতুন করে তৈরি করে দেন। কারণ, মুসলমানেরা আগের মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই মন্দিরের পূজা পরিচালনার জন্য তিনি বঙ্গদেশ থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। মন্দিরের সামনে দুটো পাথরের মূর্তি আছে। লোকে বলে একটি রাজা নরনারায়ণের, অপরটি তাঁর ভাই শিলা রায়ের।

কামরূপের এই অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের মধ্যে শাক্ত ধর্মই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। তান্ত্রিক প্রথায় এই অঞ্চলের লোকেরা শক্তিসাধনা করত। তান্ত্রিক সাধনায় রক্তাক্ত বলি দেবার ব্যবস্থা আছে। শুধু পশু নয় মানুষও এই বলি থেকে বাদ যেত না। কালিকা পুরাণে আছে, যার দেহে কোন ধরনের খুঁত নেই মা এ ধরনের বলিই খুব পছন্দ করেন। যেভাবে নরবলি দিতে হবে তারও বিস্তৃত বর্ণনা কালিকা পুরাণে রয়েছে। কামাক্ষা মন্দির নতুন করে নির্মাণ করার পর যখন দেবীকে সেখানে আবার প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন কম করেও একশ চল্লিশটি নরবলি দেওয়া হয়েছিল। তাম্রপাত্রে এই একশ চল্লিশটি নরমুণ্ড দেবীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। হফৎ ইকলিম গ্রন্থের মতে কামরূপে এক ধরনের লোক বাস করত যাদের বলা হ'ত ভোগী। এরা স্বেচ্ছায় বলি যেত। তারা নাকি বলি হবার জন্য দেবীর ডাক শুনতে পেত। যে ব্যক্তি এই ডাক শুনত সে সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন মানুষে পরিণত হত। সে যা খুশি তাই করতে পেত। যে-কোন রমণীকে ইচ্ছেমত ভোগ করতে পারত। কিন্তু পুজোর দিন এলেই তাকে

বলি দেওয়া হ'ত। এই ভোগী জাতির মধ্যে জাদুর প্রচণ্ড মূল্য ছিল। তারা পূর্ণ গর্ভবতী মহিলার পেট চিরে শিশুর লক্ষণ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করত। এ অভিযোগ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে করা হয়েছে। আইন-ই-আকবরীর আরও অভিযোগ এই যে, এদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলি কার্যকলাপ ছিল— যা রীতিমত ঘৃণ্য।

কামরূপের কামাক্ষা দেবীর উপাসনা সেই সব রাজারাই করতেন বেশি যাঁরা অসভ্য বর্বর পর্যায় থেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে উঠে এসেছিলেন। আদি নরগোষ্ঠীর বিশ্বাস এই পূজার ধারাতে সংযোজিত হয়েছিল বলেই এই সব নির্মম প্রথা এর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার সব রাজবংশই এই নিষ্ঠুর প্রথার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কামাক্ষাকে কেন্দ্র করে যে তন্ত্রধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল তার মধ্যেও নির্মম রীতিনীতিগুলি স্থান পেয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এই বর্বরতা অনেকটা কমে গেছে। কমে যাওয়ার কারণ নিম্নরূপ :

(১) ব্রহ্মী শাসকদের অত্যাচারে অসমের সাধারণ জনগণ অনেকটাই সহনশীল হয়ে উঠেছিল। (২) ধর্মীয় সংস্কারের ফলেও এর বর্বরতা অনেকটা কমে গিয়েছিল। (৩) ব্রিটিশ শাসনে জনসমক্ষে নরবলি নিষিদ্ধ হয়েছিল। তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'কারের অশালীন ক্রিয়াকলাপগুলিও সংযত হতে বাধ্য হয়েছিল। জনসমক্ষে এ সব কিছু করা যেত না। (৪) সর্বোপরি শিক্ষার প্রসার হলে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পরিধি বেড়ে গেলে এবং অসমে আদি নরগোষ্ঠী অপেক্ষা বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে গেলে এই ধর্মীয় নৃসংশতা ও অশালীনতা কমে যায়। তবে যতদিন তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ততদিন এ ধরনের মাতৃপূজার ধারার মধ্যে অসভ্য বর্বরতার গন্ধ লেগেই থাকবে। তন্ত্রের এই বর্বরতার মূল বক্তব্য এই যে, প্রকৃতি সৃষ্টি করেন ধ্বংস করার জন্যই। জীবনের বিকাশ ঘটে ধ্বংস হবে বলেই। এছাড়া আছে এই ধরনের বিশ্বাস যে, জীবন ও মৃত্যু হাতে হাত ধরে চলে। এর একটি হল আর একটির ছায়া। নীলাচলের দেবী হলেন প্রাণদায়িনী দেবী, প্রেমের বা কামের দেবী ও মৃত্যুর দেবী একসঙ্গে। 'মরণশীল জীব কাম দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে, জন্ম দিয়ে ও নিজেকে বলি দিয়ে এই দেবীর সেবা করতে পারে' হিন্দু উচ্চ মননশীল লোকেরা পর্যন্ত এমনতর বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

একসময় চট্টগ্রামও কামরূপ রাজ্যের অংশ ছিল। কামরূপের চন্দ্রশেখর পাহাড়ের উপর মাতৃমন্দিরে নরবলি হ'ত। নরবলি দেওয়া হ'ত এই আশায় যে, এতে শস্যসমারোহে দেশ ভরে যাবে। কিন্তু দেবী জনগণের কাছে একথাই প্রকাশ করতেন যে, তিনি যেমন প্রাণের দেবী, কামের দেবী, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দেবী তেমনই মৃত্যুরও দেবী। যদি দেবীর কাছে নরবলি দেওয়া না হ'ত, তাহলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দেবী নিজের বলি নিজেই তুলে নিতেন।

কামরূপ অদ্যাবধি তুকতাকের ক্ষেত্র বলে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। অদ্যাবধি

নানাধরনের বীজমন্ত্রে দেবীর পূজা হয়। কামরূপের পূজারীরা মনে করেন যে, এই দেবীর হাতেই সব ধরনের সিদ্ধি রয়েছে।

নীলাচলের মন্দিরে সবাই প্রবেশ করতে পারলেও যারা কামরূপ কামাক্ষা তন্ত্রে দীক্ষিত নন তাঁদের কাছে রহস্যময় এই পূজার ধারা স্পষ্ট নয়। অমাবস্যা রাতে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সময় নাকি মা রজস্বলা হন। এই মন্দিরের নিচ দিয়েই ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হয়ে গেছে বলে এই নদের জল পবিত্র বলে গণ্য হয় না। তবে বছরে একবার অশোকাষ্টমীর দিন এই নদের জল গঙ্গানদীর জলের মতই পবিত্র বলে গণ্য হয়। তখন সেখানে পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নান করে।

কামাক্ষা পূজাতে যে যৌনতার গন্ধ আছে, অনেকে মনে করেন যে, ভারতের অন্যান্য মন্দিরেও যেখানে দেবদাসী প্রথা আছে সেখানে এই ধরনের একটা ধারা গোপনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যেমন দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে। কামাক্ষা দেবীর মন্দিরেও দেবদাসী আছে। হয়তো পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার প্রয়োজনেই এদের রাখা হয়েছে। অসমে পঞ্চ 'ম'-কার তন্ত্র প্রাধান্য পেলেও এটাও লক্ষ্য করার মত যে, সেখানে সমাজে মেয়েদের যতটা সম্মান করা হয় ভারতের অন্যত্র তা করা হয় না। অসমের সাধারণ জনমানস পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার ভক্ত নন। বহিরাগত উচ্চবর্ণের শাসকেরাই এই পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার প্রশ্রয় দিতেন। তবে মন্দির চত্বরের বাইরে এ ধরনের তন্ত্রের সাধনা খুব একটি নেই।

অসম ও বঙ্গদেশেই মাতৃসাধনার ধারা প্রবল। এখন তন্ত্রের বর্বরতা অনেকটা কম দেখা গেলেও তা যে একেবারে নেই তা নয়। তন্ত্র সাধনার এই ধারা প্রাক বুদ্ধ যুগের। নরবলি প্রথা বৈদিক ধর্মের লক্ষণের মধ্যেও পড়ে না। যদিও ব্রাহ্মণ্য হিরণ্যকশিপুর গল্পে এর উল্লেখ রয়েছে। সেই জন্য বলি দিয়ে তন্ত্রসাধনার ধারাকে ভারতীয় ধর্মে অনার্য ধারা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। ভাষাতত্ত্ববিদেরাও কামরূপে কামাক্ষা দেবীর মধ্যে আদি নরগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্য করেন। দেবীর নামের মধ্যেই এই ধরনের একটা গন্ধ জড়িয়ে আছে। পণ্ডিত জনেরা মনে করেন অষ্ট্রিক শব্দ 'কামেই'— যার অর্থ দৈত্য, 'কামোইত' যার অর্থ শয়তান, 'কোমেন' যার অর্থ সমাধি, 'কমেত' যার অর্থ খাসিয়া ভাষায় মৃতদেহ, 'কমরু' সাঁওতালদের কোন দেবতা, কিংবা অষ্ট্রিক মনক্ষেরদের ভাষা— কা-মেই-খা অর্থাৎ পিতামহী বিশ্বমাতা— কা = স্ত্রী, মেই = মা, খা = জন্মদাত্রী, প্রভৃতি শব্দ থেকেই এসেছে কামাক্ষা বা কামাখ্যা শব্দ।

হিন্দুরা অবশ্য শব্দটিকে পরিশুদ্ধ করে উন্নত হিন্দুধর্মের দেবীই এই কামাক্ষা বা কামাখ্যা একথা বলবার চেষ্টা করেছেন। তন্ত্রের কতকগুলি বীজবাহী শব্দ থেকেই কামাক্ষার উদ্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। যেমন, 'কা' হল শক্তি, 'ক'

শক্তিমান। সুতরাং 'কা' আদ্যাশক্তি মহামায়া বা মা-মা। তারই অপর নাম কা-মা বা কা-মাতা। তিনি আকাশচারিণী বা ব্যোমতত্ত্বে (খ) প্রাণবায়ুর (য়) বিস্তার স্বরূপিণী অর্থাৎ কা-মা-খ্যা। তিনি মা ও রাজ্ঞীরূপে আকাশে বিস্তারিতা (আ) হয়ে নিয়ন্ত্রী ধারায় (ত) গতিশীলা (ঈ) অর্থাৎ কা-মা-খাতি বা কা-শাই (শাহী)-খাতী। তন্ত্রের এই ধরনের চিন্তার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয়দেরও শক্তি-চিন্তার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। যেমন, 'কা' হল সৃজনশীল শক্তি, মাতৃ দৈবী শৃঙ্খলা = কা-মাতৃ বা কা-মাতা = কামাক্ষা বা কামাখ্যা। জাপানের 'কমি' শব্দের সঙ্গেও এর সম্পর্ক থাকতে পারে। 'কমি' অর্থ ঈশ্বর। কখনও ক্ষতিকর শক্তি। কালিকা পুরাণে— 'কামাখ্যা' শব্দের অর্থ করা হয়েছে এই ভাবে ঃ

"কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা ॥
কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥"

অর্থাৎ ভগবান বলেছেন, "এই মহাদেবী অভিলাস পূরণের জন্য আমার সঙ্গে নীলকূটে আসায় নাম লাভ করেছেন কামাখ্যা। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামদায়িনী এবং কামনাশিনীও।"

নীলকূট পর্বতে যে সতীর যোনি পড়েছিল তার নাম কুব্জিকা। যোনিদেশ পড়েই প্রস্তরীভূত হয়েছে। এই প্রস্তরই কামাক্ষা বা কামাখ্যা দেবী। যদি এই শিলা মানুষ স্পর্শ করে তবে পায় দেবত্ব, আর যদি দেবতা স্পর্শ করেন তবে পান ব্রহ্মত্ব। লোকপ্রবাদে, স্থানের মাহাত্ম্য অদ্ভুত। কেউ যদি এই যোনিপীঠে লোহা রাখেন তবে তা নাকি ভস্ম হয়ে যায় মুহূর্তেই। এটা স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

যোনি মণ্ডলের পরিমাপ হল এই ধরনের ২১ আঙুল দীর্ঘ। এক বিততি প্রস্থ অর্থাৎ ১/২ হাত। সিঁদুর কুঙ্কুমে চর্চিত প্রতি মুহূর্ত। দেবী মহামায়া এখানে নিত্য বিরাজ করেন পঞ্চ কামিনীরূপে, যেমন, কামাখ্যা, ত্রিপুরী, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দিকে আছেন অষ্টযোগিনী, গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী এবং প্রকটা। দেবীর বস্তুতঃ কোন মূর্তি নেই। দেবীর অধিষ্ঠান যোনিপীঠের গহ্বরে। লাল শালুতে ঢাকা। দেবী প্রতিমাসে এখানে রজস্বলা হন।

তান্ত্রিকরা এই যোনির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে ঃ সর্বভূতের উৎপত্তি স্থান মহদ্‌ব্রহ্ম। মহদ্‌ব্রহ্মের 'আমি বহু হব' এই সংকল্পের বীজ যেখানে পড়েছিল অর্থাৎ ব্রহ্মবীর্য বা শিববীর্য যে আধারে পড়েছিল তাই ব্রহ্মযোনি। শুধু যোনি হল তত্ত্ব। সেই আদি যোনিকে অর্থাৎ তত্ত্বকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে যখন মা বলে ডাকি তখন মনে এক অপূর্ব ভাব জাগে। যোনিপীঠে তত্ত্ব ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে।

আদিপিতা শিব ও আদি জননীর সঙ্গমস্থানই হল কামাখ্যাপীঠ। সে অর্থে এটি মহাদেশে ঈশ্বরের ঘনীভূত ইচ্ছা বা কাম, মিশরের কম অটেফ্‌ ও বিজ্ঞানের Black hole. Black hole-এর বিস্ফোরণ থেকেই সৃষ্টি।

কামরূপ কামাখ্যায় 'দেবী' গৃহে বিরাজিতা অর্থাৎ কুমারী রূপে বিরাজিতা। তাই কামাখ্যায় ব্যাপকভাবে কুমারী পূজার প্রচলন রয়েছে।

তন্ত্র চূড়ামণিতে আছে, এখানে শুধু কামাখ্যা নন, আরও নয়জন দেবী আছেন যেমন, শ্রী ভৈরবী, নক্ষত্র দেবতা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাম্বিকা, বগলা, ভুবনেশী ও সধুমিনী। সর্বসাকুল্যে দশজন ভৈরবও আছেন। পীঠনির্ণয়েও (যেখানে একান্ন মহাপীঠের বর্ণনা দেওয়া আছে) এই ধরনের বর্ণনা আছে ঃ—

> 'যত্রচ ভৈরবী দেবী, যত্র নক্ষত্র দেবতা ॥
> প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র, মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা।
> বগলা, কমলা তত্র ভুবনেশী সধুমিনী (সুধামিনী?) ॥
> এতানি নবপীঠানি শংসন্তি নবভৈরবা ঃ।
> এবং তু দেবতা সর্বা এবং তু দশ ভৈরবা ॥"

ভৈরব ছাড়া শক্তি নেই। দশজন ভৈরব যখন আছেন তখনই মনে হয় কামাখ্যাকে কেন্দ্র করেই আরও নয়টি পীঠ ছিল এখানে। যে কারণেই হোক তা সতী দেহোদ্ভূত শক্তপীঠের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে একদিন। এবং এই পীঠগুলি নতুন করে গড়ে উঠেছে একান্ন পীঠের সংখ্যা ঠিক রাখতে। কারণ, পীঠনির্ণয়ের মূল পাণ্ডুলিপিতে নলহাটি, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, যশোর, অট্টহাস, নন্দিপুর, লঙ্কা আর বিরাট-এর নাম নেই। এসেছে পরে।

কামাক্ষা বা কামাখ্যার দেবী 'কুমারী' রূপে আছেন বলে কামাখ্যা পীঠের বড় আকর্ষণ কুমারী পূজা। ব্রহ্মরূপিণী স্ত্রীশক্তির প্রতীক হলেন কুমারী। কুমারী হলেন ষোলপ্রকার। যেমন একবর্ষে সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষে সরস্বতী, তৃতীয়বর্ষে ত্রিধামূর্তি, চতুর্থবর্ষে কালিকা, পঞ্চমবর্ষে সুভগা, ষষ্টবর্ষে উমা, সপ্তমবর্ষে মালিনী, অষ্টমবর্ষে কুব্জিকা, নবমবর্ষে কালসন্ধর্ষো, দশমবর্ষে অপরাজিতা, একাদশবর্ষে রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষে ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষে মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষে ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শে অম্বিকা। এই পর্যন্তই নারী কুমারী থাকে।

কুমারীর ব্যাখ্যা তন্ত্রে এই ভাবে দেওয়া হয়েছে, ততক্ষণই নারী কুমারী যাবৎ পুষ্পং ন বিন্দাতে। অর্থাৎ যতক্ষণ সে বিকাশের পূর্বাবস্থায়। যে শক্তি কুমারী শক্তিরূপে স্থিতা সেই শক্তি হল 'সিসৃক্ষু', ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে তুলনীয়া। অর্থাৎ potential energy-র সঙ্গে তুলনীয়া। নারী যখন জননী শক্তি তখন Kinetic energy.

দেবী কামাক্ষাকে নিয়ে পুরাণ কাহিনীও আছে। ভারতীয় ভাস্কর্যের মত

ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীও প্রতীকী গল্প মাত্র। যদি এই প্রতীকী অর্থ ধরা যায় তাহলে গল্প অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কামাক্ষাকে নিয়ে যে পুরাণ কাহিনী তা এই রকম : কামরূপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে রাজার নাম জানা যায় তার নাম মহিরঙ্গ দানব। তারপর একই বংশে রাজত্ব করেন হটক অসুর, সম্বর অসুর ও রত্ন অসুর। কিন্তু তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে তাদের নামের শেষে দানব বা অসুর শব্দ থেকে এটা বোঝা যায় যে, আর যাই হোক তারা আর্য ছিল না।

প্রথম বিশেষভাবে যার নাম জানা যায় সে হল ঘটক। যতটুকু জানা যায় সে ছিল কিরাতদের প্রধান। কারা এই কিরাত স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে মনু এদের বলেছেন ম্লেচ্ছ। এই কিরাতদেরই বিশেষ দেবতা হলেন শিব। এই জন্যই দেখা যায় হিমালয়ে অর্জুন কিরাত বেশী মহাদেবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই জন্যই হিমালয় দুহিতা গঙ্গা ও উমাকে 'কিরাতী' বলা হয়।

এই ঘটককে পরাজিত ও হত্যা করেন নরক অসুর। পুরাণ ও তন্ত্রে এই নরক অসুরকে নিয়ে নানা গল্প আছে। এই সব গ্রন্থ মতে নরক ছিলেন বিষ্ণুর পুত্র। বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার হন তখন তাঁর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের জন্ম। বিদেহরাজ জনক যেমন সীতাকে পেয়েছিলেন লাঙলের ফলায়, তেমনই পেয়েছিলেন নরককেও। এই নরকই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তিনিই কামরূপে অসংখ্য ব্রাহ্মণ এনে বসান। গুয়াহাটির কাছে একটি পাহাড় আজও নরকের নাম বহন করছে। লোকে এই পাহাড়কে বলে নরকাসুরের পাহাড়।

পশ্চিমে করতোয়া এবং পূর্বে দিক্‌রাঙ নিয়ে বিরাট এক রাজ্য ছিল নরকের। বিদর্ভ রাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করেন তিনি। বিষ্ণুর আশীর্বাদে তাঁর অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়। বিষ্ণুই নরককে কামাখ্যা দেবীর আরাধনা শিখিয়ে দেন।

কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য তার নিজেরই ভুলে স্থায়ী হয় না। দুঃখে যদিও বা মানুষ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে সুখের সময় পারে না। অহংকার এসে মনকে বিগড়ে দেয়। নরকের মাথায় দুষ্টবুদ্ধির জন্ম দেন শোণিতপুরের রাজা বাণ অসুর। নরক ধীরে ধীরে ধর্মের পথ ছেড়ে নামেন পাপের পথে। আত্ম অহংকারে অতি-প্রাকৃত শক্তিকে তুচ্ছ মনে করেন। অসম্ভবকে সম্ভব করাতে দেবী কামাখ্যাকে তাঁর পত্নী হতে বলেন।

দেবী জানান, তিনি রাজি আছেন নরকের প্রস্তাবে। তবে এক শর্তে। শর্ত এই যে, এক রাতের মধ্যেই নীল পাহাড়ের উপর একটি মন্দির, পুষ্করিণী ও মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হবে। নরক তখন অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী। তিনি রাজি হলেন। কাজ আরম্ভ হল। অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে তুললেন

নরকাসুর। কাজ প্রায় সমাপ্ত। তখন দেবী তাঁর মায়া বিস্তার করলেন। সকলের মনে হল যেন রাত শেষ হয়েছে। একটা মোরগ ডেকে উঠল রাত শেষের জানান দিতে। দেবী জানালেন শর্ত পালিত হয়নি। সুতরাং তিনি নরককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন না। ক্রুদ্ধ নরক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মোরগের উপর। সেখানেই তিনি মোরগটিকে হত্যা করলেন। যেখানে তিনি মোরগটিকে হত্যা করেছিলেন আজও সেই জায়গাটাকে লোকে বলে 'কুক্‌রা কাটা'।

মানুষের অহংকারই তার পতন আনে। দেবী রুষ্ট হলেন নরকের প্রতি। নরকও ক্ষুব্ধ দেবীর উপর। ঠিক করলেন কামরূপে আর কামাখ্যা বা কামাক্ষার পূজো হতে দেবেন না তিনি। কামাক্ষাকে বললেন, এখানে পূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না কারো। শিবের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অভিশাপের সময় কমল। তিনশ বছর পরে আবার কামাক্ষ পূজায় লোকের মনোবাসনা পূর্ণ হবে, এই ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

এর পরই ভাগ্য বিরূপ হল নরকের। নরকের উপর ক্ষুব্ধ হলেন বিষ্ণু এবং দেবী দু'জনেই। বিষ্ণু শেষ পর্যন্ত সুদর্শন চক্রে হত্যা করেন নরককে।

নরকের আমলের সেই কামাক্ষা মন্দির আর নেই। নতুন মন্দির ১৫৬৫ সালে কোচরাজা নরনারায়ণ তৈরি করে দেন। তবে দেবী কামাক্ষা বা কামাখ্যার মন্দির শুধু অসমেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। আরও অনেক স্থানে এই কামাক্ষা মন্দির ছিল। পদ্মপুরাণের পঞ্চম খণ্ডে আছে— উত্তরপ্রদেশে রায়বেরিলির উত্তর পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলে ছিল প্রাচীনযুগের কামাখ্যা। বর্তমানে এর নাম চণ্ডিকাস্থান। মহাভারতের বনপর্বে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে ছিল ৮০ মাইল দীর্ঘ ও চার মাইল প্রশস্ত দেবিকা সরোবর। এই তীর্থে বানর জাতীয় ব্রাহ্মণেরা দৈবকার্য করত। তবে বানর যে যথার্থই বাঁদর তা নয়। Lectures on The Ancient History of India গ্রন্থে Dr. Bhandarkar (p. 20) বলেছেন যে, 'There was an aboriginal tribe - called Rakshasas... on the other hand under the designation of Vanaras we have got another clan of aborigines who allied themselves to the Brahmanas and embraced their form of religious worship.' সুতরাং বানর ও রাক্ষসরা যথার্থই বাঁদর ও নরখাদক ছিল তা নয়। তবে তারা প্রাগার্য কোন আদি নরগোষ্ঠীর ভারতীয় ছিল। এরা শক্তির সাধনা করত। এদেরই আরাধ্যা দেবী ছিলেন কামাক্ষা। দেবিকা সরোবরের তীরে ছিল রুদ্রদেবের পবিত্রস্থান কামাখ্যা বা কামাক্ষা তীর্থ। মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরেও কামাখ্যাদেবীর মন্দির ছিল। সেখানে আজও কামকোটিতে যোনিপ্রতীকে দেবীর পূজা হয়।

১৫। **কাদুবাই :** প্রাচীন ভারতে আদি নরগোষ্ঠীর মধ্যে কাদুবাই নামে এক

উপাস্যা দেবী ছিলেন। কালুবাই অর্থ কৃষ্ণাঙ্গিনী দেবী। তিনি সকলের মা হিসেবে পূজিতা হতেন। ডি. ডি. কোশাম্বি মনে করেন, পরে শিবের সহধর্মিণীরূপে তিনি দেবী কালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অনুরূপ মাতৃদেবী ছিলেন মরিয়াম্মাও। মরিয়াম্মা ছিলেন কলেরায় মৃত্যুর দেবী। এঁরা সবাই প্রস্তরখণ্ডে পূজিতা হতেন। সিঁদুর লেপিত প্রস্তরখণ্ড দেখে বোঝার কোন উপায় ছিল না যে, এরা কোন দেবতা অথবা দেবী।

১৬। কঙ্কর মাতা ঃ বঙ্গদেশে বসন্ত আগমনে গুটি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। শীতলা ও তাঁর ছয় ভগ্নী এই সময় মহামারী নিয়ন্ত্রণ করেন। এই দেবীদের মধ্যে কঙ্কর মাতা হলেন সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। তবে কঙ্কর মাতার আক্রমণ সহসা ঘটেনা।

১৭। কন্যা, কন্যাকুমারী ঃ ইনি দক্ষিণ ভারতের এক মাতৃদেবী। সুদূর দক্ষিণের কন্যাকুমারীতে এঁর অধিষ্ঠান। সারা পৃথিবীতে মাতৃসাধনার যে একটি ধারা ছিল তিনি সেই ধারারই একটি শাখা মাত্র। মাতৃ-সাধনার ধারা পৃথিবী-মাতার চিন্তা থেকেই এসেছে বলে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। পৃথিবী-মাতার দুটো রূপ আছে ঃ একটি তাঁর ভয়ঙ্করী রূপ আর একটি কোমল রূপ। মাতৃ-চিন্তা উত্তর ভারতীয় জনগণের একটি বিশেষ ধারা। এক সময় প্রাচীন গ্রীসেও পৃথিবী মাতা রূপে এই মাতৃসাধনার ব্যবস্থা ছিল। গ্রীক জগতে সেই জন্য মায়ের বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। গ্রীক পাত্রে দেখা যায় তিনি মাটির ঢিবি থেকে উঠে আসছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন গ্রীকরা মাকে পৃথিবী বলে মনে করতেন। ভারতীয় বৌদ্ধদের স্থাপত্যিক ভাস্কর্যের মধ্যেও মায়ের এই পৃথিবী রূপ ফুটে উঠেছে— যার নাম তাঁরা দিয়েছে মহাপৃথ্বী (পৃথিবী)। মাটির নিচ থেকে মাথা বাড়িয়ে গৌতম বুদ্ধের অশ্বকে তিনি ধারণ করে আছেন।

দক্ষিণ-ভারতীয় দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে মাতৃ-সাধনার ব্যাপারটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবী মায়ের মত এই মাতৃদেবীদেরও দুটি দিক আছে— ভয়ঙ্করী দিক ও কোমল দিক। দেবী, কন্যা (অবিবাহিতা), কন্যাকুমারী (তরুণী অবিবাহিতা কন্যা), সর্বমঙ্গলা (সর্বদা মঙ্গলময়ী), শাকম্ভরী (শস্য সমৃদ্ধকারিণী) প্রভৃতি তাঁর কোমল রূপ। অপরপক্ষে চামুণ্ডা (দৈত্য বিনাশিনী), কালী (কৃষ্ণবর্ণা), রজনী (ভয়ঙ্করী), রক্তদন্তী, প্রভৃতি তাঁর ভয়ঙ্করী রূপ। বঙ্গদেশে সাধারণ সময়ে মায়ের কল্যাণী বা মঙ্গলময়ী রূপের পূজো হয়। রোগ-শোক মহামারীর সময়ে তাঁর ভয়ঙ্করী রূপকে প্রসন্ন করার চেষ্টা চলে।

মাকে অনেক সময়ই কন্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই ভাবেই ভারতবর্ষে বৈদিক দেবী অদিতি পুরাণ কাহিনীতে দক্ষ কন্যারূপে দেখা দিয়েছেন। দক্ষ কন্যা সতীই আবার হিমালয় দুহিতা উমারূপে জন্ম নিয়েছিলেন। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে তিনিই নিত্যস্নানপূতা চিরকুমারী ব্রতধারিণী এক দেবী হয়ে উঠেছেন।

কন্যাকুমারী দেবী দুর্গারই আর এক নাম। কন্যাকুমারীকার দেবীত্বের ধারণা একটি অতি প্রাচীন ধারণা। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের 'পেরিপ্লাস মেরিস ইরিথ্রি' গ্রন্থে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তের নাম 'কোমার' বলে উল্লেখিত দেখি। এই কোমারের দেবীই হলেন কুমারী দেবী। যিনি উপকূলবর্তী সমুদ্রে নিত্য স্নান করেন। এই কন্যাকুমারীর প্রসিদ্ধি থেকেই পরবর্তীকালে অনেকেই ভারতবর্ষকে 'কুমারী দ্বীপ' নামে উল্লেখ করেছেন। দেবী দুর্গাও বহু সময়েই 'কুমারী' নামে উল্লেখিতা হয়েছেন। তান্ত্রিক মতে 'কুমারী' দেবীরই প্রতীক। তান্ত্রিক সাধনায় কুমারী পূজার এতই প্রাধান্য যে সেকথা কামাক্ষ বা কামাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। অন্যান্য দেবী-তীর্থেও কুমারী পূজার ধারা প্রচলিত আছে। 'কুমারী'-র দেবীত্বে বিশ্বাস আমাদের ভারতীয় সমাজে এমন গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে, অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে আমাদের সমাজে 'গৌরী' বলে উল্লেখ করা হ'ত। এই বিশ্বাস থেকেই গৌরীদানের সামাজিক প্রথা গড়ে উঠেছিল। হরিবংশ ও মহাভারতেও কুমারী দেবীর উল্লেখ আছে। পরে শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহের গল্প জড়িয়ে গেছে। নেপালের রাজারা কুমারীর কাছ থেকেই রাজ্য গ্রহণ করেন।

১৮। **কপালিনী :** দেবী দুর্গা বা কালীরই এক নাম কপালিনী।

১৯। **কাশাই খাতি বা কেশাইখাতি :** অসমের চুটিয়াদের আরাধ্য দেবীর নাম কাশাই খাতি বা কেশাই খাতি। কেশাই খাতি অর্থ কাঁচা মাংস ভোজীনী। আসলে কাঁচা নরমাংস ভোজীনী। বর্তমানে ইনি দেবী কালীর সমার্থবোধিকা। এই দেবীর পূজারীদের বলে 'দেওরি'। এরা উপজাতীয় স্তর থেকেই এসেছে, ব্রাহ্মণদের থেকে নয়। দেবীর পূজায় যে-সব তিথি নক্ষত্র ছিল তাতে রীতিমত বলি সহকারে তাঁর পূজা হ'ত। কলেরা বসন্তাদি রোগ মহামারী রূপে দেখা দিলে বিশেষভাবে তাঁর পূজা হত। অনাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও দেবীর পূজো দেওয়া হ'ত। অহমরা (যাদের নাম থেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নাম অসম) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জয় করার পরেও চুটিয়াদের এই নিষ্ঠুর বলিদান করতে দেওয়া হত। নরবলিও দিতে দেওয়া হত। তবে সবাইকে নয়। যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত সেই সব অপরাধীদেরই বলি দিতে দেওয়া হ'ত। যখন মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা ব্যক্তি না পাওয়া যেত তখন বিশেষ একটি গোষ্ঠী বলি দেবার মনুষ সরবরাহ করত। এই গোষ্ঠী ছিল চুটিয়াদের মধ্যেই। বিনিময়ে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া হ'ত এদের। যেমন, যে লোকটি বলিদানের জন্য নির্দিষ্ট হ'ত তাকে বিশেষ রকম যত্নে পালন করা হ'ত। রাজকীয় ভোজ দেওয়া হ'ত যাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ রকম উন্নতি হয়, মা নধর নরমাংসে দেখে খুশি হন।

যেভাবে তাদের নির্বাচিত করা হ'ত তা অদ্ভুত। কোন রমণী গর্ভবতী হলে গণৎকার ডেকে বলতে বলা হ'ত যে, পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান জন্মাবে। যদি

বলা হ'ত যে পুত্র সন্তান জন্মাবে তাহলে মাকে বিশেষ রকম যত্ন আত্তি করা হ'ত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলির জন্য অভিষিক্ত করা হ'ত। গায়ে মেখে দেওয়া হত হলুদ ও বিশেষ রকম শস্যের কিছু গুঁড়ো। কখনও কখনও স্বেচ্ছা বলিদান প্রার্থীও পাওয়া যেত। কিছুদিন তাকে মন্দিরে রেখে দেওয়া হত। খাইয়ে দাইয়ে নধরকান্তি করা হ'ত। সোনারুপোর গয়না দিয়ে সাজিয়েদেওয়া হ'ত। নিয়ে যাওয়া হ'ত 'মায়ের মূর্তি সামনে। বলিদানেচ্ছু ব্যক্তি নিজেই বলি যাবার জন্য 'মায়ের কাছে প্রণিপাত করত। সেই মুহূর্তে বড় দেউরি তাকে বলি দিত। মুণ্ডটি দেবীর সামনে একটি স্তূপীকৃত নরমুণ্ডের ঢাইয়ের কাছে রাখা হ'ত। বলির জন্য লোক ঠিক করা হ'ত তরুণদের মধ্য থেকে। তবে বিকলাঙ্গ বা দেহে সামান্য ধরনের আঁচড় জাতীয় খুঁত থাকলেও বলির যোগ্য বলে বিবেচিত হ'ত না।

নওগাঁও অঞ্চলে কেশাই খাতির কাছে বলি দেওয়া ছিল স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের বলি দেওয়া হ'ত। এরা আসত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। এ ধরনের ব্যক্তিকে একপক্ষকাল যবং কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হ'ত। গয়নাগাটি ও ফুলে ফুলে সাজিয়ে এরপর তাকে যূপকাষ্ঠের কাছে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়া হ'ত। দর্শক, যারা এই জঘন্য বলি দেখত, তারা বলি হবার পরই পাগলের মত ছুটে পালিয়ে যেত পাছে ক্ষুধার্ত দেবদেবীরা তাদেরও ধরে খেয়ে ফেলে। ভক্তদের আত্মিক উন্নতির জনাই যে এই বলি দেওয়া হ'ত তা নয়। বলি দেওয়া হত দেবীর বিষ-নজর এড়াবার জন্য।

অসমের কামরূপ অঞ্চলে দেবী 'অই' বা 'আই' অর্থাৎ ভগবতীর কাছেও অনুরূপভাবে নরবলি দেওয়া হ'ত। এখানেও দেবীর কাছে বলি যাবার জন্য স্বেচ্ছা বলিদানপ্রার্থী পাওয়া যেত। এদের বলা হত ভোগী। এই 'আই' দেবী বাস করতেন গুহায়। ভোগীরা বলি যাবার জন্য তাঁর ডাক শুনতে পেত। যে এই ডাক শুনত সেই বলি যাবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। সমাজে তখন তার বিশেষ সম্মান হ'ত। সে যা খুশি তাই করতে পেত। ইচ্ছেমত যে কোন রমণীকেও ভোগ করতে পারত।

শুধু চুটিয়া নয়, ত্রিপুরী, কোচ, কাছারী, জয়ন্তী সব উপজাতির লোকেরাই মায়ের কাছে একদিন নরবলি দিত। হিসেব করে দেখলে সারা পৃথিবীতেই এক সময় দেবদেবীদের খুশি করার জন্য বা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নরবলি দেওয়া হ'ত। প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতেও দেবীর কাছে নরবলি দেওয়ার বিধান ছিল। অনেকের ধারণা বঙ্গদেশ থেকেই মেসোপটেমিয়াতে বা সুমেরীয় সভ্যতায় এই নরবলি প্রথা গিয়েছিল।

এই কেশাই খাতি বা কা-ছাই-খাতি দেবী পৃথিবীর নানা প্রান্তেই এক সময় ছড়িয়ে ছিলেন। চুটিয়া বা ছতিয়াদের মতে বিশ্বস্রষ্টা পরম পুরুষের নাম হল কুন্দী। এই কুন্দীর প্রকৃতি বা শক্তি হলেন মা-মা অর্থাৎ মহামায়া। এই মহামায়াই হলেন

কেশাইখাতি বা কা-ছাই-খাতি। এঁকে অনেকে তাম্রেশ্বরীও বলেন। বড় কাছারী জাতের লোকেরা বলে রণচণ্ডী বা কা-ছাই-খান্তি। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ক্রীট দ্বীপের ছাইয়াঁস দেবীও পরিচিতা ছিলেন তাম্রেশ্বরী নামে।

২০। কাশী দেবী ঃ ইনি উত্তরপ্রদেশে কাশী শহরের নগররক্ষিণী দেবী। এঁর মন্দির রয়েছে কাঁশীপুরের মহল্লাতে। এই মন্দির অঞ্চলকেই কাশী শহরের কেন্দ্রস্থল বলা হয়।

২১। কোরে ঃ কোরে হলেন প্রাচীন গ্রীকদের মাতৃ দেবতা। ইনি পৃথ্বী মাতা। শূয়রের মাংস ও ময়দার তৈরি সাপ তৈরি করে মাটির নিচে কোন এক গর্তে তাঁর বেদীতে ছুঁড়ে দেওয়া হ'ত। উদ্দেশ্য, যাতে শস্য সমারোহে মাঠঘাট সব ভরে ওঠে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে শস্যের গুঁড়োর সঙ্গে শূয়রের মাংস মিশিয়ে এই দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হত। মাটির নীচে এই মাতৃদেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করার দ্বারা এটাই বোঝায় যে, কোরে পূজো ছিল এক ধরনের উর্বরা শক্তির পূজো। নরক থেকে বা পাতাল থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন বিষয়েও গল্প আছে। এর দ্বারা বসন্ত সমাগমে পৃথিবীর অর্থাৎ শস্য সমৃদ্ধা পৃথিবীর আত্মপ্রকাশ বোঝায়। তাঁর পূজার সময় মাটিতে হাতুড়ি ঠোকা হ'ত, যাতে তিনি পাতাল থেকে উঠে আসেন। গল্প আছে, প্লুটো কোরেকে বলাৎকার করলে ডেমেটার পৃথিবীতে শস্যের অভাব ঘটিয়েছিলেন। এ ধরনের গল্প দেবী ইশতারকে নিয়েও আছে। ইশতারকে দেখা যায় তিনি কখনও কখনও অদৃশ্য হচ্ছেন। এর দ্বারা সেই সময় পৃথিবীতে যে অনুর্বরতা দেখা দিয়েছে তাই বোঝায়। বস্তুতঃ একটা সময় পৃথিবীতে শস্য হয় না। আবার এক সময় উর্বর পৃথিবী শস্যের ইঙ্গিতে ভরে উঠে। প্রকৃতির এই ঘটনাই পৃথিবীর নানা দেশে প্রাচীন কালে নানা মাতৃশক্তির গল্প নিয়ে ভরে উঠেছিল। এথেনাগোরাসের মতে, কোরের কতকগুলি ভয়ঙ্করী দিকও ছিল। তাঁর মাথায় শৃঙ্গ ছিল বলেও বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে অবশ্য শৃঙ্গ দিব্য শক্তির প্রতীক ছিল।

ভারতবর্ষে শাক্তদের যে কয়জন মহামাতৃদেবী আছেন, যেমন, কালী, দুর্গা ইত্যাদি, পণ্ডিতজনেরা তাঁদেরও কোন না কোনভাবে উর্বরা শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন। দুর্গা পূজায় নবপত্রিকা তো শস্যবধূ হিসেবেই দেবীর উপস্থিতি ঘোষণা করে। মাতৃদেবীদের বহু জনকেই উর্বরশক্তির প্রতীক হিসেবে পৃথিবীতে দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে গল্প আছে যে, দেবী দুর্গা ষট্‌পদ ভ্রমরের রূপ ধারণ করেছিলেন অরুণ নামক অসুরের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে। সেখানে লেখা আছে ঃ—

"যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্‌পদম্ ॥"

সেই জন্য মাতৃদেবীদের যাঁদেরই সঙ্গে ভ্রমর যুক্ত দেখা যায় তাদের উর্বরাশক্তির দেবী হিসেবেও কল্পনা করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈলে ভ্রমরাম্বিকার পূজা হয়। এ ছাড়া ভ্রমরাম্বা, ভ্রামরী ইত্যাদি নামেও বহু দেবী আছেন। কহ্লন তাঁর রাজতরঙ্গিনীতে বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে ভ্রমরবাসিনী বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তরবঙ্গের শাল বাড়ির দেবীও ভ্রমর প্রতীকী। ভারতবর্ষের বাইরেও ভ্রমরকে প্রতীক করে বহু মাতৃদেবী আছেন, যেমন, পশ্চিম এশিয়ার নণইয়া ও আর্টেমিসা। এঁদের প্রতীকও ভ্রমর।

সর্পও উর্বরা শক্তি ও পৃথিবী শক্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করে। এই জন্য ভারতে 'কালী ও 'দুর্গার সঙ্গে সাপ জড়িত আছে। কোরে প্রাচীন গ্রীসের তেমনই কোন এক মাতৃদেবী। এই দেবীরই আর একটি নাম ছিল এটীয়া— অর্থাৎ শর্বশক্তিময়ী।

২২। কু-আম্ম ঃ ইনি প্রাচীন ব্যাবিলনের এক জলদেবী। তিনি প্লাবনের দেবী হিসেবে বিবেচিতা হতেন। 'উর্ বউ' গিরসুতে এই দেবীর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, "এই দেবী জলে দেশ ভাসিয়ে দেন।' সেইজন্য সামুদ্রিক ঝড়ো দেবী হিসেবেও তাঁকে কল্পনা করা যেতে পারে।

২৩। কুহূ ঃ ঋগ্বেদে নবচন্দ্রকে ব্যক্তিচরিত্র আরোপ করে কুহ নামে এক দেবীর কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে তন্ত্রের মহাদেবীর সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে গেছেন। যেমন, দেবী পুরাণে (১২৭/১৭২) দেবী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ—

"সিনীবালি কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতি তথা।"

২৪। **কুকরমরী ঃ** কুকরমরী উত্তর প্রদেশের ডোমদের এক আরাধ্যা দেবী। তারা রাস্তার বেওয়ারিস কুকুরকে ধরে হত্যা করে। এই কুকুরদের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হলেন কুকরমরী। সুতরাং এই দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য শূকর হত্যা ক'রে ও মদ দিয়ে তাঁর পূজো করা হয়।

২৫। **কুমারী ঃ** দেবী 'দুর্গারই এক নাম কুমারী। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের এই দেবী অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০.১.৭) পর্যন্ত তাঁর নাম পাওয়া যায়। 'পেরিপ্লাস মেরিস ইরিথ্রি'তেও এই দেবীর নাম করা হয়েছে। ইনি কুমারী নারীদেরও দেবী। পাঞ্জাবে কুমারী মেয়েদের মধ্যে এই দেবীর আবির্ভাব ঘটে বলে বিশ্বাস। যার মধ্যে এই আবির্ভাব ঘটে সে দেবীর ভূমিকায় কিছু জাদুক্রিয়া করে, যাতে শস্যপ্রাচুর্যে পৃথিবী ভরে উঠে। নেপালে এই কুমারীই নেপালেশ্বরী। প্রতিবছর নেপালের রাজাকে কোন বিহারে (বিহারে) অষ্টমবর্ষীয়া কুমারীরূপে পূজিতা ব্রাহ্মণ কন্যার হাত থেকে নেপালের দায়িত্ব নিতে হয়। এই দেবীর সঙ্গে থাকে বালকরূপে গণেশ ও মহাকাল।

২৬। (ব) কুর (ড়) মন (র) গিয়াল মো (অ) নে (ব) কুর (ড়) মনমো ঃ

ইনি তিব্বতীদের স্বর্গের দেবতা রাজা (স) ফইয়ের রডজোঙ্গ (স) নিয়নপোর পত্নী। সেই হিসেবে স্বর্গের রাণী।

২৭। **কাকিনী** ঃ ভারতীয় ষট্চক্র ভেদ যোগ সাধনায় দেহের মেরুদণ্ডের মধ্যে পাঁচটি চক্র স্থাপন করা হয়েছে। এগুলি হল মূলাধার যা পৃথ্বীতত্ত্ব প্রকাশ করে, স্বাধীষ্ঠান যা অপতত্ত্ব প্রকাশ করে, মণিপুর যা অগ্নিতত্ত্ব প্রকাশ করে, অনাহত যা বায়ুতত্ত্ব প্রকাশ করে ও বিশুদ্ধ যা ব্যোমতত্ত্ব প্রকাশ করে। এ ছাড়া ভ্রূমধ্যস্থ অঞ্চল বরাবর মস্তিষ্কের পেছন দিকে একটি চক্র আছে যাকে বলে আজ্ঞা। এই চক্রটি মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত। এই এক একটি চক্রের এক একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা ও তাঁর শক্তি হিসেবে অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। সেই হিসেবে মূলাধারের দেবতা হলেন ব্রহ্মা এবং দেবী ডাকিনী। এই ডাকিনী শব্দের উদ্ভব কোথা থেকে বলা যায় না। তবে তিব্বতে 'ডাক' বলে একটি শব্দ আছে যার অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ডাকিনী শব্দের অর্থ হওয়া উচিত মহিলা জ্ঞানী। এ ছাড়া ডাক হল এক ধরনের গতি— যেমন, ডাক হরকরা,— যারা ছুটে গিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে। সেই হিসেবে ডাক kinetic energy-এর কাজ করে। Energy ভারতীয় অর্থে স্ত্রী শক্তি। সুতরাং ডাকিনী গতিশীলা শক্তিও হতে পারে। তবে ভিন্নমতে এই চক্রের দেবতা ব্রহ্মা হলেও তাঁর শক্তির নাম ডাকিনী নয় শাকিনী। সংস্কৃত 'শক্' অর্থাৎ শক্তি থেকে শাকিনী শব্দ এসেছে। সুতরাং সেদিক থেকেও এই চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গতিশক্তির ইঙ্গিতবহ। স্বাধিষ্ঠান চক্রের দেবতা হলেন বিষ্ণু। এই চক্রের শক্তির নাম বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম রাকিনী। এই দেবী মধ্যম স্তরের শক্তি প্রকাশিনী। তবে ভিন্ন মতে এই অঞ্চলের দেবীকেই কাকিনী বলা হয়েছে। কাকিনী মেদশক্তির প্রতিনিধি। মণিপুর চক্রের দেবতার নাম রুদ্র। এই অঞ্চলের দেবীর নাম হল লাকিনী। এই লাকিনী প্রচণ্ড শক্তিধারিণী হলেও সে শক্তি নিয়ন্ত্রিত শক্তি। তবে ভিন্ন মতে তিনি জীবের দেহের মেদশক্তি। অনাহত চক্রের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম ঈশ। কেউ কেউ বলেছেন ইশান। এই দেবতারই শক্তির নাম কাকিনী। আবার ভিন্ন মতে এই চক্রের শক্তির নাম রাকিনী। রাকিনী অর্থ রক্তের প্রাণশক্তি। এর অধিষ্ঠান হৃদয়ে। বিশুদ্ধ চক্রের দেবতার নাম সদাশিব। কেউ বলেছেন মহাদেব। উভয়েই অবশ্য একই অর্থ দ্যোতক। তাঁরই শক্তির নাম শাকিনী। শাকিনী এমনই শক্তি যা প্রশান্তি দান করে। বৌদ্ধতন্ত্র মতে এই চক্রের দেবীর পরিচয় সুবেশা যোগিনী হিসেবে। তবে ভিন্ন মতে এই অঞ্চলের দেবীর নামই ডাকিনী করা হয়েছে, যার অর্থ জ্ঞানশক্তি। আজ্ঞা চক্রের দেবতার নাম পরমশিব। তাঁর শক্তির নাম হাকিনী। বৌদ্ধরা এঁকে বলেছে চিৎকারকারিণী যোগিনী। পরম শিব হলেন মহাশূন্যতা অবস্থা। ব্ল্যাকহোল তত্ত্বে ব্ল্যাক হোলের আভ্যন্তরীণ Singularity অবস্থা। এখানে ঈশ্বরের ঘনীভূত কামরূপ শক্তি প্রচণ্ড

শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। এই বিস্ফোরণের সময় যে শব্দ হয়েছিল তা হাঁক দেওয়া তুল্য। সেই জন্য এই শক্তিকে হাকিনী বলা হয়েছে। এই শব্দই ওঁ। সেই জন্য আজ্ঞাচক্রের ভেতরে ওঁ লেখা আছে।

২৮। **কুলকুণ্ডলিনী :** কুলকুণ্ডলিনীকে দেবী হিসেবে গণ্য করা হলেও আসলে ইনি হলেন শক্তি। বিভিন্ন হিন্দু তন্ত্র ও যোগ গ্রন্থে এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উল্লেখ আছে। এই শক্তি মানব দেহের সর্বনিম্ন চক্রে অর্থাৎ মুলাধারে (গুহ্যদেশ ও লিঙ্গমূলের মাঝখানে) সর্পাকারে কুণ্ডলিত অবস্থায় নিদ্রিত আছেন বলে কল্পনা করা হয়। সেখানে তিনি একটি শিব লিঙ্গকে সাড়ে তিন পাঁচে আবৃত করে আছেন বলে ধারণা করা হয়েছে। এই লিঙ্গ হল মানুষের সূক্ষ্ম শরীর বা মুক্ত আত্মা স্বরূপ। এঁকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানে জীবাত্মাকে মায়াশক্তির আবরণে জড়িয়ে থাকা। এই মায়া শক্তির বন্ধন বা আবরণ খুলতে না পারলে জীবাত্মার আত্মজ্ঞান জন্মে না। সাড়ে তিন প্যাঁচ কল্পনা করার অর্থ আপাদমস্তক জড়িয়ে থাকা। প্রত্যেকটি মানুষই তার নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা। সকল জীব এই সাড়ে তিন হাতই মায়ায় জড়িয়ে আছে। সেই জন্যই শক্তি বা মায়ার প্যাঁচ সাড়ে তিন হিসেবে দেখানো হয়েছে। সাধকের কাজ হল এই সাড়ে তিন প্যাঁচে নিদ্রিত শক্তিকে জাগরিত করা যাতে সে প্যাঁচ খুলে অর্থাৎ মানব সত্তায় জড়িয়ে থাকা আবরণ খুলে ঊর্ধ্বগতি হতে পারে, অর্থাৎ যেখান থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল অর্থাৎ পরম শূন্যতা থেকে, সেখানে ফিরে যেতে পারে। মানব দেহে এই শূন্যস্থান কল্পনা করা হয়েছে ব্রহ্মরন্ধ্রের কেন্দ্র অঞ্চলকে। এই কেন্দ্রকে ধারণ করে থাকা যে পদ্মের কল্পনা করা হয়েছে তার নাম সহস্রার। এই সহস্রারের কেন্দ্রই হল পরমশূন্যতা স্বরূপ। শক্তি যেখানে ফিরে গেলে আবার তার গতি হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হলেই মায়াশক্তি তার জীবাত্মিক চেতনাকে আবরিত রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই সাধকের প্রথম কাজ হল এই সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করে তোলা। দেবী মুলাধারে জাগরিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সাধকের মধ্যে কোন অনুভূতির স্পন্দন দেখা দেয় না। এই শক্তি বা দেবীর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন। শক্তির জাগরণের পরই আরম্ভ হয় তার ঊর্ধ্বগতি। একটি একটি করে চক্র ভেদ ক'রে শক্তি ঊর্ধ্বদিকে এগিয়ে চলেন। সর্বোচ্চস্থান সহস্রারের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে তাঁর পরম স্থিতি ঘটে— অর্থাৎ নির্বিকল্প স্থিতি। শক্তির এক একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নতুন নতুন আনন্দানুভূতি হতে থাকে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারের কূটস্থানে নিয়ে যাওয়া হলে সাধক পরম শান্তি লাভ করেন। এই শান্ত স্থানই হল উপনিষদ বর্ণিত পরমাত্মা— যাকে বোঝানো হয়েছে এই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করে— 'শান্তো ইয়ম আত্মা।' তান্ত্রিকেরা বা যোগিরা শক্তির উত্থান ও গতিকে বিচিত্র স্পন্দনাত্মক

বিদ্যুৎ প্রবাহের মত বলে বর্ণনা করেছেন।

হিন্দুরা যেমন দেহে ষটচক্র বা সপ্তচক্র ইত্যাদির কল্পনা করেছেন, বৌদ্ধরা তেমনই দেহের মধ্যে চারটি চক্রের কল্পনা করেছেন, যেমন, নাভিতে নির্মাণচক্র, হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র ও সহস্রারে বা উষ্ণীষ কমলে মহাসুখচক্র। নির্মাণচক্রে আছে ভগবান বুদ্ধের নির্মাণকায়া। ধর্মচক্রে আছে ধর্মকায়া। সম্ভোগ চক্রে সম্ভোগ কায়া এবং মহাসুখ চক্রে পরম প্রশান্তি।

হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয়েই মনে করে যে, মানবদেহ হল মহাবিশ্বেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। মহাবিশ্বের সকল সত্য এই মানব দেহের মধ্যেই আছে। মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে দুটি নাড়ি গেছে— যাকে বলে ইড়া ও পিঙ্গলা। কেউ বলেন চন্দ্র ও সূর্য। মেরুদণ্ডের মধ্য ভাগ দিয়ে যে নাড়ি প্রবাহিত হয়ে গেছে তাকে বলে সুষুম্না। বৌদ্ধরা এই নাড়িকে বলেন অবধূতিকা। বৌদ্ধ মতে এই অবধূতিকা দিয়েই বোধিচিত্ত ঊর্ধ্বদিকে অগ্রসর হয়ে চক্রে চক্রে ভিন্ন ধরনের স্বাদ অনুভব করেন। যে শক্তি এই চক্রগুলির মধ্য দিয়ে উর্ধ্বগামী হয়ে বিচিত্র ধরনের আনন্দের শিহরণ দেয় সেই শক্তিই হিন্দুদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ও বৌদ্ধদের দেবী। এই শক্তি যখন প্রথম নির্মাণচক্রে ওঠেন তখন অকস্মাৎ প্রজ্বলিত অগ্নির মত তার দাহ অনুভব করা যায়। শক্তি তখন চণ্ডস্বভবা। সেই জন্য বৌদ্ধরা শক্তির এই অবস্থাকে 'চণ্ডালী' বলে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা তাঁকে বোঝা যায় না বলে তাঁকে 'ডোম্বী' নামেও অভিহিতা করা হয়েছে। এই ডোম্বীর অবস্থান দেহরূপ নগরের বাইরে। আচার বিচার পাণ্ডিত্যাভিমান দ্বারা এর সঙ্গ লাভ করা যায় না। নাঙ্গা হলে অর্থাৎ সকল আবরণ শূন্য হলে তবেই তাঁর সঙ্গ লাভ করা যায়। এই শক্তিকে মাতঙ্গী, চণ্ডালী, শবরী, কিরাতী ইত্যাদি আখ্যাতেও ভূষিতা করা হয়েছে। বৌদ্ধ চর্যাপদে এই নিয়ে অনেক মরমিয়া সঙ্গীতও আছে।

বহু হিন্দু যোগী ধ্যান কালে চক্রে চক্রে শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী কল্পনা করে এই শক্তিকে সাধনা করতে বলেন। কিন্তু এ অতি মিথ্যা ধারণা। এর দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শক্তির জাগরণও ব্যাহত হয়। এই শক্তিকে জাগরিত করার সহজ পথ আছে।

'কুলকুণ্ডলিনী' শব্দটি দ্রাবিড় শব্দ। 'কুল' অর্থ দ্রাবিড় ভাষায় শক্তি। 'কুণ্ড' অর্থ গর্ত। লিঙ্গমূল ও গুহ্যদেশের মধ্যখানে কোথাও একটি গর্ত আছে। গর্তটি এত সূক্ষ্ম যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও এর কোন অস্তিত্ব ধরা যায় নি। সেখানেই নাকি দেহের মৌল শক্তি বিরাজ করে। ব্যাপারটাকে অসম্ভব মনে হলেও অবিশ্বাস্য নয়। বিজ্ঞানীরা ইদানীংকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি যে ক্ষেত্র থেকে হয়েছে তাকে অণুর কেন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন। সেখান থেকেই এত বড় বিশ্বের উদয় হয়েছে। দেহ-বিশ্বের সকল শক্তির আধারও তেমনই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

একটি বিন্দু মাত্র। এখান থেকে যে তেজ উৎসারিত হয় তাই মানব দেহকে উজ্জীবিত রাখে। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আধারে গিয়ে আঘাত করে। ফলে সেখান থেকে যে তাপ নির্গত হয় তাই আমাদের দেহের সাধারণ তাপ হিসেবে কাজ করে। মনঃসংযোগ করলে সেই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ বায়ু অনেক সূক্ষ্ম হয়ে যায়। বায়ু যত সূক্ষ্ম হয় তার আঘাত করবার ক্ষমতা তত বেশি হয়। ফলে দেহের মৌল শক্তি বেশি পরিমাণে নির্গত হয়। মূলাধারস্থ মৌল শক্তি ব্যারোমিটারের পারার মত উপরে উঠতে থাকে। সমগ্র বিশ্ব যেমন কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরণজনিত আবেগে ছড়িয়ে পড়েছিল— এবং প্রান্তে এসে স্থূল বস্তুসত্তার মধ্যে মৌল শক্তিরূপে চুপ করে আছে, দেহের শক্তিও তেমনই ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নেমে মূলাধারে এসে স্থির হয়ে আছে। এই শক্তি যেমন, বিশ্বে সূক্ষ্ম থেকে কম সূক্ষ্ম অবস্থায় ধাপে ধাপে স্থূলতর পথে নেমে এসেছিল, দেহবিশ্বেও শক্তি তেমনই সহস্রার থেকে নেমে এসে ক্রমশঃ স্থূলতর চেতনায় এসে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু জড়-অজড় সর্বত্রই তার একটা স্পন্দন আছে। ইদানীং বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম যন্ত্রে তা ধরা পড়েছে। যে-ভাবে বিশ্ব কেন্দ্র থেকে প্রান্তভাগের স্থূল জগতের দিকে নেমে এসেছিল সেইভাবেই দেহবিশ্বে শক্তি সহস্রারের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রান্তভাগের স্থূল চেতনার দিকে নেমে এসেছে। বিশ্বের স্থূল প্রান্তভাগ থেকে উৎসের দিকে ফিরে গেলে যেমন স্থূল থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থায় বিশ্বকে দেখা যাবে— দেহবিশ্বের মৌলশক্তি কুলকুণ্ডলিনী তেমনই মূলাধার থেকে সহস্রারের দিকে ফিরে গেলে যাবার পথে ক্রম সূক্ষ্মতর জগতের চিত্রগুলি আমাদের মানস নেত্রের কাছে তুলে ধরে।

মনঃসংযোগ করে চুপ্ করে বসে থাকলেই মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমশঃ উর্ধ্বদিকে উঠতে থাকে। বিভিন্ন চক্রে নিম্ন থেকে উর্ধ্বদিকে যে শক্তি-তরঙ্গ আছে, তা তরঙ্গের চরিত্র অনুযায়ী সাধকের মানস নেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও দৃশ্য তুলে ধরে। সাধক কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতির সময় সাধকের মানস নেত্রে সেই সব বর্ণ ও চিত্র তুলে ধরে। মূলাধারস্থ শক্তি শ্বাস দ্বারা তাড়িত হয়ে উর্ধ্বদিকে উঠতে থাকলে প্রথম ওঠে পেট দিয়ে। বায়ু তখন দেহকে দোলাতে থাকে। পরে বায়ু মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্না নাড়ির মধ্য দিয়ে বইতে থাকে। তখনও দেহে কম্পন অনুভূত হয়। পেট দিয়ে বায়ু ওঠার সময় যে ধরনের কম্পন হয় তাকে দোলানী বলা যেতে পারে। কিন্তু মেরুদণ্ড দিয়ে বায়ু বা বায়ুতাড়িত শক্তি ওঠার সময় যে কম্পন অনুভূত হয় তাকে ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Trembling তাই বলা যেতে পারে। মেরুদণ্ডের গাঁটে গাঁটে আবর্জনা জমে থাকে। শক্তি উর্ধ্বে ওঠার সময় এই আবর্জনাগুলিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তার ফলে দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত মেরুদণ্ডের সব গাঁটের আবর্জনা দূর

না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। আবর্জনা দূর হয়ে গেলে বায়ুবাহিত শক্তির ওঠার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন বায়ু অতি সহজেই ওপরের দিকে উঠে সরাসরি মস্তিষ্ক মণ্ডলে চলে যায়। বায়ুর চাপে মস্তিষ্ককে তখন একটা ফুটবলের ব্লাডারের মত মনে হয়। এই ব্লাডার বা বেলুন উপরে উঠে যেতে চায়। তার ভাসমানতা এমন এক হাল্কা ভারপ্রাপ্ত হয় যে, মনে হয় সমগ্র দেহটাকে নিয়ে সে উপরের দিকে উঠে গেছে। অনেক সময় দেহ সত্যি সত্যিই উপরে উঠে যায়। যোগে এই অবস্থাকে বলে ভূমিত্যাগ। যোগে তিনটি অবস্থা আছে। যখন কিছুতেই মন স্থির হয়ে বসতে চায় না, উচ্‌পিচ্‌ করে সেই অবস্থাকে বলে ঘর্ম। যখন বায়ুতাড়িত শক্তি পেট বা মেরুদণ্ড দিয়ে উঠে দেহে কম্পন সৃষ্টি করে সেই অবস্থাকে বলে কম্পন। মস্তিষ্কে উঠে শক্তি দেহকে উর্ধ্বদিকে তুলে নিলে তাকে বলে ভূমিত্যাগ। ভূমিত্যাগই যোগের চরম প্রাপ্তি।

শক্তি এক একটা চক্রে উঠলে এক এক রকম বোধ, কর্ণদর্শন ও চিত্রদর্শন সৃষ্টি করে। দেহের মধ্যে এক একটা চক্রের এক এক ধরনের কাজ। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাধিষ্ঠানে এই শক্তি প্রজনন শক্তিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি স্বাধিষ্ঠানে যৌন আবেগ, প্রজনন ক্ষমতা ও পার্থিব সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। মণিপুর চক্রে কুলকুণ্ডলিনী ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করে। অনাহত চক্রে কুলকুণ্ডলিনী প্রেম বা ভালবাসার শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছে। বিশুদ্ধচক্রে কুলকুণ্ডলিনী চিন্তাশক্তিকে শক্তিশালী করে। কুলকুণ্ডলিনী আজ্ঞা চক্রে এসে উপস্থিত হলে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি, অনুভব শক্তি ও আত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই শক্তি যখন সহস্রারে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন মানুষের জ্ঞান জ্ঞাত জগৎ থেকে অজ্ঞাত জগতে গিয়ে উপস্থিত হয়। মানুষ ঐশ্বরিক জগতের সন্ধান পায়। এই সহস্রারের উর্ধ্বেও অনেকে আর একটি চক্র কল্পনা করেছেন। একে বলে স্টার চক্র। এর অবস্থান স্থূল দেহের চার ইঞ্চি উপরে। যাকে সূক্ষ্মদেহ বা বায়োপ্লাজমিক বডি বলা হয়েছে। এই চক্র সেই দেহে থাকে। এখান থেকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মানুষের দেহের জেনেটিক কাঠামো তৈরি করে দেয়। বিশ্বে সকল অভিজ্ঞতা এখানেই জমা থাকে। এই জন্য একে আকাশী মহাফেজ বলে।

ক্রিয়াযোগিরা মনঃসংযোগ করে এই শক্তিকে ওপরে ওঠালে যে অভিজ্ঞতা হয় তা এই রকম ঃ কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার চক্রে জাগরিত হলে মানস নেত্রে রক্তিম বর্ণ দেখা যায়। এখানে অনেক ছায়া ছায়া ছবি ভেসে ওঠে। এগুলি অস্পষ্ট-ভৌতিক ছবি। কিছুটা বাইরের স্থূল জগতের শক্তি-তরঙ্গের সঙ্গে যোগীর মানস তরঙ্গের সমতা হেতু পার্থিব চিত্রের প্রতিফলন। কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উঠলে প্রথম সবুজাভ একটি বৃত্ত লক্ষ করা যায়। সেই বৃত্ত ছড়াতে ছড়াতে

ক্রমশঃ ছায়া ছায়া একটি তরল জাতীয় ভাব সৃষ্টি করে। এতে বহু ছায়া-মূর্তিকে বিচরণ করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি স্তর হল মৃত্যুর পর স্থূলদেহীদের সূক্ষ্ম স্তরে সূক্ষ্মদেহের বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে স্থূল দৈহিক সত্তা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হলেও মানসিকতার মধ্যে স্থূলতার গন্ধ লেগে থাকে। জীবের সূক্ষ্ম সত্তা এখানে আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মণিপুর চক্রে উঠলে কুণ্ডলিনী শক্তি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন আকাশের মত আকাশের দৃশ্য দেখায়। সাদাটে মেঘের আড়ালে আকাশের কিছু নীলাভ ইঙ্গিত মানসনেত্রে ধরা পড়ে। এখানেও বহু সূক্ষ্মদেহী প্রাণীকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই তিনটি চক্রের স্তরই ভারতীয় চিত্রমত নরকের স্তর। মানুষ এই তিনটি স্তরে মৃত্যুর পরও পার্থিব কামনা বাসনা দ্বারা জড়িত হয় বলে এবং স্থূল দেহের অভাবে ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে পারে না বলে মানসিক যন্ত্রণা বোধ করে। পশ্চিমীরা একে বলেন Ideas plastic plane.

তবে এই তিনটি স্তর যে শুধুমাত্র সূক্ষ্মদেহীদের জগৎই দর্শন করায় তা নয়। মানস তরঙ্গের সঙ্গে স্থূলজগতের তরঙ্গের সমতা হেতু বহু স্থূল পার্থিব দৃশ্যও দেখায়। একে বলে Telepathic Vision. সাগর, নদী, পাখি, পাহাড়পর্বত ইত্যাদি দেখা যায়।

শক্তি অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী এর উপরে উঠলে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত সুন্দর নীল আকাশ দেখা দেয়। তাতে ফুটকি ফুটকি তারা ফুটে থাকতেও দেখা যায়। এখানে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত হাওয়া বয় এমন ভাব অনুভব করা যায়। এখানে যে সব মনবাস্থার চিত্র লক্ষ্য করা যায় তাদের প্রশান্ত ভঙ্গীতে দেখা যায়। মাঝে মাঝেই কিছু অগ্নি গোলককেও ছুটে চলতে দেখা যায়। হয়তো মহাবিশ্বে ছুটে চলা ভিন্ন কোন গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ হবে এগুলো। অনেক সময় স্পষ্টভাবে ভিন্ন কিছু গ্রহের চিত্রও ফুটে উঠে। দেখা যায় উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গিত সমুদ্র, বড় বড় মাছ, ধূসর পাহাড়, নতুন কোন গ্রহের উর্ধ্বের আকাশ, এই সব। অদ্ভুত কিছু জীবন্ত প্রাণীও লক্ষ্য করা যায়। তাদের অনেকেই পশুপ্রতীম, অনেকেই দেবস্তরীয়। পার্থিব কল্পনার দেবদেবীদের সঙ্গে তাদের মিল লক্ষ্য করে মনে হয় সাধুসন্তেরা দেবদেবীর কল্পনা মানস জগতে এই দর্শনের ফলেই করেছিলেন। তাঁদের দেবদেবীর কল্পনা হয় তো সবটাই ভিত্তিহীন নয়। তবে এটাও সত্য যে, কতকগুলি যথার্থ অনুভূতিকে তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীর গল্প তৈরি করে বর্ণনা করেছিলেন— যে কাহিনীগুলির বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের ফলশ্রুতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে,— যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী ত্রিদেবের কল্পনা।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিশুদ্ধ চক্রে উঠলে নীলবর্ণ গভীর হয়। এখানে বহু প্রাচীন মুনি ঋষিদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এদের বহু জনকেই পঠনজনিত

জ্ঞানের আলোতে চেনা যায়। মানুষের কর্মফলও অনেক সময় দেশে (space) চিত্র তৈরি করে রাখে। সেগুলি দেখে মানুষ ও ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। নস্ত্রাদামুর মত ভবিষ্যদ্বক্তা এইভাবেই তাঁর সেঞ্চুরিস-এ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

কুলকুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে উঠলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণজনিত আলোর বিকিরণ ঘটে। এই অঞ্চল পার হলেই দিব্য জগতে প্রবেশ করা যায়। সহস্রার অঞ্চলই হল দিব্য জগতের অঞ্চল। এই সহস্রারের তিনটি পর্যায় আছে। নিম্ন থেকে উর্ধ্ব দিকে এই পর্যায়গুলিকে আনন্দ, চিৎ ও সৎ-এর পর্যায় বলা যায়। আনন্দ পর্যায়ে জ্যোতিরূপ আলো দর্শন হয়। এখানে ভিন্ন কোন দৃশ্য নজরে পড়ে না। কারণ, এই আলোই হল অপরিচ্ছিন্ন আলো— যা থেকে নিম্নতর পর্যায়ে পরিচ্ছিন্ন সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করেছে। এর উর্ধ্বে দর্পণ-সদৃশা একটি স্বচ্ছ স্তর আছে। একে চিৎ পর্যায় বলে। চিৎশক্তি এখানেই দ্বিতীয় বিহীন 'এক'-এর বোধ অনুভব করেছিল। এর উর্ধ্বে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ প্রশান্ত অন্ধকার, যাকে বলা হয় সৎ-এর পর্যায় বা সহস্রারের কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্মণের পর্যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে একেই বলে singularity. চিৎশক্তি ক্রিয়াশীল হবার আগে শক্তি এখানেই স্তব্ধ হয়ে ছিল। চিৎশক্তি ক্রিয়াশীল হলেই তিনি চিদ্রূপিণী কুল রূপে অর্থাৎ শক্তিরূপে বিশ্বসৃষ্টিতে প্রকট হন। আদিতেও তিনি ছিলেন সহস্রারস্থ কূটস্থানের গর্ভে বা গর্তে অর্থাৎ কুণ্ডে। জগৎ সৃষ্টি হবার পর প্রতিটি সত্তাকে মৌলশক্তি হিসেবে সেই কুণ্ড বা গর্তেই স্তব্ধ হয়ে থাকেন। সেইজন্যই তাঁর উর্ধ্বগতি বা অধঃগতি উভয় গতিতেই তিনি কুলকুণ্ডলিনী। প্রকাশের সময় তিনি একে একে পাঁচ খুলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিতা হন। প্রাণভূমি থেকে জাগরণের পর উর্ধ্বগতিতে তিনি প্যাঁচগুলো গুটাতে গুটাতে উৎসে ফিরে চলেন। পরিণতিতে এবং উৎসে তিনি কুণ্ডেই থাকেন। তাঁর প্রকাশ ও অন্তর্ধান উভয় পথেই প্যাঁচ খোলা ও প্যাঁচ গোটানোর ব্যাপার আছে। সেই জন্যই সাধকেরা তাঁকে কুলকুণ্ডলিনী বা সর্প হিসেবে কল্পনা করেছেন।

২৯। কপালিনী ঃ দেবী দুর্গা বা শক্তিরই এক নাম কপালিনী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে শক্তির মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, কপালিনী ও কৌবেরী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাধন মালাতেও শক্তিকে মহামায়ূরী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী ইত্যাদি নামে লক্ষ করা যায়।

৩০। কমলা ঃ কমলা দেবী লক্ষ্মীর এক নাম। কমলে আসীন বলেই হয়তো তাঁর নাম কমলা। পেঁচককেও দেবীর বাহন হিসেবে কল্পনা করা হয়। ধানের ছড়া, কড়ি ইত্যাদিও তাঁর সঙ্গে থাকে। শ্রীশ্রী লক্ষ্মী বলে আমরা যাকে জানি তার সঙ্গেই এসব জড়িত। শরৎকালীন দুর্গা পূজার পরে সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই পূর্ণিমা

তিথিতে এর পুজো হয়। তবে কমলা নামে তাঁকে বিচিত্র জীবের সঙ্গে দেখা যায় যার নাম বাঘ। কবি কৃষ্ণরায় তাঁর 'কমলা মঙ্গল' কাব্যে প্রথমেই কমলাকে ব্যাঘ্র ভয় নিবারিণী দেবী বলেছেন। কমলা লক্ষ্মী হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ব্যাঘ্র ভয় নিবারিণী হলেন বোঝা যায় না। তবে বাঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে যে জনমানসে কোন ধারণা ছিল না তা নয়। পূর্ববঙ্গে 'কুলাইর ভিখ্' বা 'কুলের মাগন' বলে এক ধরনের গান ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির কিছুদিন আগে থেকে একদল নিম্নবর্ণের লোক দল বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করত। গানের ছড়াটি ছিল এই ধরনের ঃ

"আইলাম লো স্মরণে।
লক্ষ্মীদেবীর বরণে ॥
লক্ষ্মীদেবী দিবেন বর।
ধানে চাউলে ভরুক ঘর ॥"

পৌষে ঘরে ফসল তোলার পর এ যে শস্যদেবী লক্ষ্মীর গান তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ্মীর বন্দনা শেষ হবার পরই এই গানের একটা ছড়া কাটা হ'ত। 'বারো বাঘের লেখাপড়ি।' অর্থাৎ বার রকমের বাঘের উল্লেখ করা হ'ত। আসলে পৌষের শীতের শেষেই বাঘ বন থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ত। হয়তো সেই কারণেই শস্যদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই দেবীর পূজায় বলি দেবার ব্যবস্থাও ছিল। এই ধরনের উল্লেখ আছে ঃ

"একশত ছাগ বলি বান্ধিয়া ধবল।
রুধির খর্পর ধরি ভকতি করিল ॥"

এ-সবই আঞ্চলিক চিন্তার প্রতিফলন মাত্র— যে আঞ্চলিক চিন্তা ভৌগলিক পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তবে কিছু কিছু কল্পনা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ, যেমন, পদ্ম বা কমলে আসীনরূপে লক্ষ্মীর চিত্র। পদ্ম জলের উপর মাথা তুলে ফুটে উঠে। রহস্যময়ভাবে তার আবির্ভাব ঘটে। ঠিক এই ভাবেই মহাশূন্যতার বুকে নিউট্রন ফিল্ডের সৃষ্টি হয়। নিউট্রন ফিল্ড স্বয়ংম্ভু। লক্ষ্মীও স্বয়ম্ভু এবং অযোনি সম্ভবা। পদ্ম এই বিরাট ইঙ্গিত দেয়। সেই জন্য পদ্মে আসীন যে কোন দেবতা বা দেবীর মূল্য ভারতীয় শাস্ত্রে অপরিসীম। কমলে আসীন কমলারও সেই জন্য ভিন্নরকম দ্যোতনা আছে যা শুধু অধ্যাত্ম পুরুষেরাই চিন্তা করতে পারেন।

৩১। **কমলে কামিনী ঃ** চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীগুলির মধ্যে ধনপতি সওদাগরের সঙ্গে জড়িত একটি 'কমলে কামিনী'র গল্প রয়েছে। ধনপতি সওদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাবার পথে সমুদ্রের মধ্যে কালীদহে এই দেবীর মূর্তি দর্শন করেছিলেন। এই দেবী পদ্মের উপর আসীনা ছিলেন। তাঁর বাঁ হাতে ধৃত ছিল

গজরাজ। এই গজরাজকে নিয়ে তিনি অবহেলায় খেলা করছিলেন। কখনও তাকে গলাধঃকরণ করে আবার উদ্‌গীরণ করছিলেন। এই 'কমলে কামিনী'র কাহিনী এক সময় বঙ্গদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, এই কমলে কামিনীর উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতীয় গজ-লক্ষ্মীর কিংবদন্তী থেকে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন। বাণিজ্যসূত্রে দক্ষিণ ভারত গিয়ে বাঙ্গালী বণিকেরা এই গজ-লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। গজ-লক্ষ্মীর যে মূর্তি, তাতে দেখা যায়, সমুদ্রের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি পদ্ম ফুটেছে। তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ্মী দেবী। তাঁর দু'পাশে দুটি হাতী শুঁড়ে স্বর্ণভাণ্ড জড়িয়ে ধরে দেবীর মস্তকে জল সিঞ্চন করছে। কোথাও বা শুধু শুঁড় দ্বারা জলসিঞ্চন করছে এমনও দেখা যায়। এই কাহিনীই বিস্তার লাভ ক'রে দেবীর করিগ্রাস ও উদ্‌গীরণের গল্প তৈরি করেছে।

৩২। **কাকেতুকা দেবী :** বঙ্গদেশে সৃষ্টিকাহিনী সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় যে এমনতর ভাব রয়েছে : সৃষ্টির পূর্বে সবই ছিল শূন্য। শূন্যতার মধ্যে ছিলেন শুধু একটিমাত্র দেবতা— নিরাকার নিরঞ্জন। তিনিই আদি দেব। এই শূন্য মূর্তি আদি দেব থেকেই এক আদি দেবীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই আদি দেবীই আদ্যাশক্তি। নাথ সাহিত্যে এই আদি দেবীকে কাকেতুকা দেবী বলা হয়েছে? আদিদেব আলেকনাথ নিজদেহের শক্তি থেকে তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন।

৩৩। **কাত্যায়নী :** দেবী 'দুর্গারই এক নাম কাত্যায়নী। ইনি কাত্যায়ন মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন বলেই কাত্যায়নী নামে পরিচিতা। এঁর বাস ছিল কুসুমপুরের গঙ্গাতীরে। তবে পৌরাণিক গল্পে যে ধরনের কাহিনীই বিস্তার করা হোকনা কেন আসলে ওই দেবী আদিতে ভারতের প্রাচীন নরগোষ্ঠীর কারো মাতৃ দেবতা ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, কাত্য জাতির আরাধ্য দেবী হিসেবেই তিনি কাত্যায়নী নামে পরিচিতা হয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে যে একীকরণের মানসিকতা দেখা দিয়েছিল সেই সুযোগে তিনি ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন। কাত্যায়নী অর্থ মধ্য বয়সিনী বিধবা মহিলা যিনি লাল কাপড় পরে থাকেন। আরও অনেক নানা দেবীও এইভাবে দেবী 'দুর্গার মধ্যে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ভারতের আদি নরগোষ্ঠীর বেদী থেকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের বেদীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যেমন 'উমা' হিসেবেও এই দেবী ব্রাহ্মণ্য নন— দ্রাবিড় চিন্তা সঞ্জাত। দ্রাবিড় 'অম্ম' শব্দ থেকেই উমা শব্দ এসেছে। দেবীর আর এক নাম অপর্ণা। অপর্ণা শব্দের অর্থ— যিনি পর্ণ দ্বারাও আচ্ছাদিতা নন। অর্থাৎ তিনি নগ্না। নগ্নশবর বলে ভারতে একটি নরগোষ্ঠী সম্ভবতঃ তার পূজা করত। বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী যে পর্ণশবর জাতির আরাধ্য দেবী ছিলেন সেকথা নিঃসন্দেহ বলা যায়। অনেকে মনে করেন, কালীও কোন কৃষ্ণবর্ণ আদি ভারতীয় নরগোষ্ঠীর

আরাধ্যা দেবী ছিলেন। তত্ত্বকথা পরে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই আদি নরগোষ্ঠী দ্রাবিড়দেরও পূর্বে ভারতে ছিল। গৌরীরূপে যে বর্ষা রঙের দেবীকে কল্পনা করা হয় তিনি হয়তো হিমালয়ের কোন মোঙ্গল গোষ্ঠীর আরাধ্যা দেবী ছিলেন। মহামায়া দ্বারা প্রাচীন সেই মাতৃশক্তিকে বোঝায়— যিনি জাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। কৌশিকী সম্পর্কে মনে করা হয় যে, ইনি কুশিক জাতির আরাধ্যা দেবী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এসে দুর্গারই এক বিশেষ রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে তাঁর নামকরণের জন্য গল্প ফাঁদা হয়েছে। গল্প এই ধরনের ঃ দেবতারা শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়সুতা দেবীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে দেবীর শরীর কোষ থেকে আর এক দেবী নির্গতা হলেন। এই দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীর কোষ থেকে নির্গতা হয়েছিলেন এই জন্য তাঁর নাম হয়েছে কৌশিকী। কৌশিকী এই ভাবে দেবীর দেহ থেকে নির্গতা হলে দেবী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান এবং তাঁর নাম হয় কালিকা।

এই কৌশিকী দেবী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁর রূপেই শুম্ভ নিশুম্ভ মুগ্ধ হয়েছিলেন। ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন, ইনি আদিতে কুশিক জাতির দেবী ছিলেন। ইনিই শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন। মূল কাহিনী হয়তো কুশিক জাতিরই ছিল। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মে দেবীর মধ্যে এসে মিশেছে। শিবপুরাণ সংহিতায় কৌশিকীর হাতে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের বিশেষ কারণ দেওয়া হয়েছে। আবার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায়, দেবীদেহ থেকে গৌরবর্ণা অনিন্দ্য সুন্দরী যে রমণী নির্গতা হয়েছিলেন তিনিই কৌশিকী। আবার পদ্মপুরাণে দেখা যায় ভিন্ন বর্ণনা। যেমন, দেবীর দেহ থেকে যে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিদেবী বহিরে এসেছিলেন তিনিই কৌশিকী। এই কৌশিকী দেবীকে ব্রহ্মা বিন্ধ্যাচলে প্রতিষ্ঠিতা হতে বলেছিলেন। কালিকা পুরাণেও দেখা যায়, কৌশিকীরূপে পার্বতীর দেহ থেকে নিষ্ক্রিতা দেবীই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে কালিকারূপ গ্রহণ করেছিলেন। এই দেবীই কালরাত্রি (৫/২৩/২-৩)। পরস্পর বিরোধী উপখ্যানগুলি দেখে মনে হয় কাত্যায়নী নামে যে পৃথক দেবী ছিলেন তাঁকে হিন্দুধর্মের মহাদেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যই পুরাণকারেরা এইভাবে নানা গল্প সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি আসলে কাত্যজাতির উপাস্য ছিলেন।

৩৪। **কুলাই চণ্ডী ঃ** মাতৃশক্তি হিসেবে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অনেক গ্রাম-দেবতা আছেন, যেমন, ওলাইচণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, খাড়া চণ্ডী, বসন চণ্ডী ইত্যাদি। এঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম দেবতা। এঁদের সবার নামের শেষে চণ্ডী শব্দ জুড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য মহাদেবীর সঙ্গে তাঁদের জুড়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে।

৩৫। কঙ্কালী, করালী, কলাই চণ্ডী, কামচারিণী, কানুকা, কার্তিকী,

কালদূতী, কালরাত্রি : প্রভৃতি ক-বর্গে ভারতীয় মহাদেবীর আরো নানা নাম আছে। এই সব নামে নানাস্থানে তিনি গ্রামদেবতা হিসেবে উপস্থিত আছেন। বিভিন্ন শাক্তপীঠ ও একান্ন সতীপীঠে এই মহাদেবীরই নানা নাম। এঁদের বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন অঞ্চলের লোকপ্রবাদের মধ্যেই সীমিত আছে। এঁদের বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

৩৬। কুইস : কুইস হলেন প্রাচীন রোমান দেবী। রোমানরা এঁর পূজো করতেন। রাষ্ট্রের তরফ থেকে যেমন এঁর পূজো হ'ত তেমনই ব্যক্তিগতভাবেও লোকে তাঁর পূজো করত। নগরের বাইরে দেবীর একটি বেদী ছিল। মুদ্রাতেও এই দেবীর চিত্র অঙ্কিত হ'ত।

৩৭। কোয়াটলি কিউ : ইনি প্রাচীন মেক্সিকোর এক দেবী। ইনি দেবতা উইট্‌জিলোপোকট্‌লির মাতা ছিলেন। মেক্সিকো শহরে তাঁর পূজো হ'ত।

৩৮। কুইলাজটলি : ইনি ছিলেন মেক্সিকো অঞ্চলের প্রাচীন ইনডিয়ানদের মাতৃদেবী। জোচিমিলিও শহরে তাঁর পূজো হ'ত।

৩৯। কেদেশ : ইনি এক প্রাচীন মিশরীয় নগ্না দেবী। সিংহের উপর তিনি দণ্ডায়মানা ছিলেন। হ্যাথরের পরচুলার মত ছিল তাঁর চুল। তাঁর দুই হাতে ছিল সর্প ও পদ্ম। তাঁকে দেবতা মিনের পাশাপাশি রাখা হ'ত। এতে মনে হয় তিনি ছিলেন কোন মাতৃদেবতা বা স্বয়ং হ্যাথর। দেবী অনইতিস ও ইশতারের মত তাঁর হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।

৪০। কুন্ : ইনি মধ্য এশীয় প্রাচীন তুর্কীদের এক দেবী। প্রাচীন তুর্কীরা সূর্যকে স্ত্রীশক্তি বলে ভাবত। চন্দ্রকে ভাবত পুরুষ শক্তি হিসেবে। এই সূর্যের নাম ছিল 'কুন্'। চন্দ্রের নাম ছিল অই-অন।

৪১। কাইবেলি : গে বা গেইয়া দেখুন। একে সিবিলি নামেও উচ্চারণ করা হয়।

## খ

১। খালাকুমারী : ইনি বঙ্গদেশের সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের এক দেবী। খালাকুমারীর অর্থ হল খাঁড়ির কুমারী, খাঁড়ির জলশক্তির দেবী। জেলেরা এঁকে এত শ্রদ্ধা করে যে, তাদের শ্রমের প্রথম ফসল তারা এই দেবীর উদ্দেশে দান করে। ধারণা, এতে তাদের মৎস্য শিকার ভাল হবে।

২। খুলুঙ্গমা : ইনি ত্রিপুরার এক উপজাতীয় দেবী। বাঙ্গালী হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা প্রাচীন কালের উপজাতীয় ধর্মীয় ধারণা ত্যাগ করতে পারেনি। প্রকৃতির নানা শক্তিতে তারা বিশ্বাস করত। যে শক্তি শুভ প্রদায়িনী শক্তি তাঁকে

শ্রদ্ধা করলেও তেমনভাবে পূজা করত না। কিন্তু যে শক্তি ক্ষতিকর তাকে সব সময় খুশি রাখার চেষ্টা করত। পশুপাখি ইত্যাদি বলি দিয়ে তাঁর পূজা করত। ত্রিপুরার উপজাতিরা নানা শস্যদেবীর আজও পূজা করে। তাদের ধান ক্ষেতের দেবীর নাম মইমুঙমা। তুলা ক্ষেতের দেবীর নাম হল খুলুঙমা। তবে আদি বর্বরদের প্রকৃতিশক্তি চিন্তার তুলনায় এ-সময় তাদের শক্তির চিন্তা একটু উন্নত ধরনের ছিল। বন পরিষ্কার করে যখন কৃষিকর্মে এরা মনোনিবেশ করে তখনই এই ধরনের শক্তির চিন্তা তাদের মধ্যে আসে। অবশ্য অনেক উন্নত হিন্দু ধর্মভুক্ত বাঙ্গালীদের মধ্যেও প্রকৃতির এই ধরনের বিভিন্ন দিকের পূজা আজও বর্তমান। যেমন, অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারে পৌষ সংক্রান্তিতে আজও যে ক্ষেত্রপূজার ব্যবস্থা আছে সেই ক্ষেত্রপূজাও প্রকৃতির শক্তির একটি দিকেরই পূজা। এ-ধরনের পূজাকেই সর্বপ্রাণবাদজাত এক ধরনের শক্তিপূজা বলা যেতে পারে— যাকে বলে animism.

৩। খোসেডম : উত্তর পশ্চিম সাইবেরিয়ার একটি যাযাবর জাতির নাম য়েনিসেই অস্টিয়াক। এরাও পৃথিবীর প্রত্যেকটি আদি নরগোষ্ঠীর মত চিন্তা করে যে, কিছু ভাল শক্তি আছে, কিছু খারাপ শক্তি। ভাল শক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ দেবী হলেন এস। সপ্ত আকাশের উপরে যাঁর বাস। এই সর্বোচ্চ দেবতার পরই এক ভাল মাতৃশক্তি আছেন তাঁর নাম তোমম। ইনি সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করেন বলে বিশ্বাস। তিনি দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনই দয়াপ্রচিত্তা। প্রতি বসন্তেই ইনি য়েনিসেই উপকূলে পর্বতশৃঙ্গে উঠে নদীর উপর তাঁর হাত ঝাড়েন। তাঁর আস্তিনের ভেতর থেকে পালক ঝরে প'ড়ে পাখির রূপ নেয়। শীতার্ত দক্ষিণে তিনি উষ্ণতা নিয়ে আসেন। এই দুই দেবতা ছাড়াও এদের আরও কিছু ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, যেমন, এসদিন। এঁরা শীতের সময় আকাশে আগুন জ্বেলে রাখেন। সেই আগুনের আলোকে অশুভ শক্তির দেবী খোসেডমকে দেখা যায়। দেখা যায় উত্তরের শীতার্ত অঞ্চলে অন্ধকারের মধ্যে তিনি কি করছেন। এই অপশক্তির দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অলব নামে এক বীর য়েনিসেইদের কাছে দেবত্বের মর্যাদা লাভ করে আছেন। বিপদের দিনে যখনই য়েনিসেইরা তাঁর কাছে খোসেডমের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন তখনই তিনি পৃথিবীর কাছের তিনটি আকাশ থেকে নেমে আসেন বলে বিশ্বাস।

৪। খাম্বেশ্বরী : বঙ্গদেশে সুধা নামে এক উপজাতি আছে। তারা এক বিশেষ ধরনের দেবীর পূজো করে— যাঁকে বলে খাম্বেশ্বরী। এই দেবীকে খোঁটা, গোঁজ বা খাম বা খাম্বা অর্থাৎ খুঁটি দ্বারা বোঝানো হয়। বঙ্গদেশের অন্যত্র এখনও যেখানে খোঁটা বা খামের সাহায্যে চালাঘর তৈরি করা হয়, সেখানে ঘরের মধ্যস্থলের খাম্বা বা খুঁটিকে বিশেষভাবে পূজো করা হয়। এ হল এক ধরনের

spirit পূজো।

৫। **খোরিয়ার ঃ** খোরিয়ার হল গুজরাটের এক অপশক্তির দেবী। যে মহিলাদের বেদনাদায়ক ভাবে মৃত্যু হয় তাদের আত্মা ক্ষতিকর ভূত হিসেবে বিরাজ করে। এই ধরনের মহিলা ভূতেদের প্রধান হলেন খোরিয়ার। গুজরাটের সাধারণ লোকেরা এই ধরনের আত্মায় বিশ্বাস করে এবং তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে।

৬। **খাড়াচণ্ডী, খেপাই চণ্ডী ঃ** এরা বঙ্গদেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামের গ্রামদেবতা অর্থাৎ গ্রাম রক্ষয়িত্রী দেবী। যেমন দিনপুরের বনের নাচনচণ্ডী, পলাশির পলাশচণ্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ের ভান্ডারচণ্ডী বা ভাণ্ডারচণ্ডী। এই সব দেবীর নামের শেষে চণ্ডী শব্দ থাকলেও এরা কিন্তু মার্কেণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অর্থাৎ দেবী দুর্গার সঙ্গে এক নন। এঁরা নেহাতই আঞ্চলিক দেবী— বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চিত্ত যাঁরা জয় করে আছেন। বঙ্গদেশে এইভাবে গ্রাম দেবতা হিসেবে বহু চণ্ডী রয়েছেন।

৭। **খেপাই ঃ** খেপাই অর্থ উন্মাদ মহিলা। বঙ্গদেশের কোন এক আঞ্চলিক দেবী ইনি। একে খেপাই চণ্ডীও বলা হয়।

## গ

১। **গঙ্গা মা ঃ** আদিকালে মানুষ প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই একটি শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করে তার পূজা করত। এই শক্তিতে নররূপ আরোপ করে পূজা করার ধারা আসে পরে। ঋগ্বেদে প্রকৃতির নানা গুণে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে পূজা করার ব্যবস্থা ছিল। পৌরাণিক যুগে সেই ব্যক্তিত্বে রূপ আরোপ করার ব্যবস্থা হয়। এই ভাবেই পৌত্তলিকতা আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এই পৌত্তলিকতা হল ভাস্কর্যে কিছু ভাবকে প্রকাশ করা। ভারতের ভাস্কর্য ও মূর্তিশিল্প এক ধরনের ভাব প্রকাশক ইঙ্গিত মাত্র। এই জন্যই এই মূর্তিগুলিকে পুতুল না বলে প্রতিমা বলা হয়। এক ধরনের ইঙ্গিতময় গল্প দিয়েও এই প্রতিমাগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই গল্পগুলিকেই বলে পৌরাণিক কাহিনী।

গঙ্গা একটি নদী। কিন্তু তাঁর জন্ম ভগবান বিষ্ণুর শ্রীচরণ থেকে। সেই জন্য এঁকে খুব পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। প্রকৃত সত্য হল হিমালয়ের গ্লাসিয়ার থেকে এর উৎপত্তি। বিষ্ণুর চরণ থেকে তাঁর উৎপত্তির গল্প প্রকৃতপক্ষে কি বলতে চায়— তা ইদানীং যাঁরা পৌরাণিক গল্পের পেছনে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন তাঁরাই বলতে পারেন।

গঙ্গার পৌরাণিক গল্পের পেছনে বিজ্ঞান যাই থাক না কেন, গঙ্গা ভারতবর্ষের আপামর হিন্দু জনগণের কাছে পবিত্র একটি নদী। হিন্দুরা তাদের

সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই গঙ্গাজল বা গঙ্গাতীরেই করে থাকে। সম্ভব হলে সকলেই মৃতদেহ এই গঙ্গাতীরেই দাহ করতে চায়। তা সম্ভব না হলে অন্ততঃ চিতা-ভস্ম সবাই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে চায়। পারলৌকিক কাজকর্মের জন্য গঙ্গা হিন্দুদের কাছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। এখানে গঙ্গাজলেই প্রথম পিণ্ড দান করা হয়। প্রতি হিন্দুর গৃহেই কোন না কোন ভাবে গঙ্গাজল থাকেই। কোন শুভকর্মই গঙ্গাজলের সিঞ্চন ছাড়া সিদ্ধ হয় না। গঙ্গাকে কাছে না পাওয়া গেলে নদীতীর মৃতদাহ করার পক্ষে প্রশস্ত। সেখানে চিতার উপর নদী থেকে এনে জল ঢালা হয়। বিশ্বাস, এই জল নদীতে গিয়ে প'ড়ে পরিণতিতে গঙ্গাতে গিয়েই মিশবে। এমন কি গঙ্গাজলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাকেও পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়। আগে মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে এনে রাখা হত। একে বলে গঙ্গাযাত্রা বা অন্তর্জলী। কোন পাপ করলে তা স্খালনের জন্য অদ্ভুত একটা বিধি আছে হিন্দুদের। গঙ্গার মোহনা থেকে বাম তীর ধরে নদীর উৎসে যাওয়া এবং দক্ষিণ তীর দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা। একে বলে প্রদক্ষিণ। নর্মদা তীর ধরেও এই ধরনের পাপস্খালনের ব্যবস্থা আছে। বহু মহিলা শিশুসন্তান জন্ম দেবার পর গঙ্গা পূজা দেয়। আগে প্রথম সন্তানকে গঙ্গাতে বিসর্জন দেবার ব্যবস্থাও ছিল। সাধুসন্তরা সারা মাঘ মাস ধরে গঙ্গার উপর মাচা তৈরি করে বসে থাকেন— উদ্দেশ্য পুণ্য অর্জন করা। সাধারণ মানুষের মধ্যে গঙ্গার স্বামী হিসেবে কইলা বাবা নামে কারো পূজা দেবার ব্যবস্থা আছে। তাকে বেলদার হিসেবে ভাবা হয়। বিশ্বাস, এই কইলা বাবা গঙ্গার স্রোতে বাধা সৃষ্টিকারী সব কিছুকে গ্রাস করে নেন। গঙ্গার যে মূর্তি তৈরি করা হয়েছে তাতে তিনি মকর-বাহনা।

২। **গঙ্গম্মা** : মাদ্রাজে এমন বহু উপাস্য দেবী আছেন যাঁদের উৎস যথার্থই কোন মহিলা। গঙ্গম্মা তেমনই একজন। গঙ্গম্মা ছিলেন এক ব্রাহ্মণ মহিলা। তাঁর কাজ কর্ম দ্বারা তিনি দেবীত্বে উন্নীত হন। এই ধরনের আরো আছেন, যেমন পুঙ্গম্ম। মাদ্রাজের তিনটি ভগ্নীর মধ্যে তিনি একজন। একটি পুষ্করিণী খনন ক'রে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। দেবীজ্ঞানে তাঁকেও পুজো করা হয়।

৩। **গঙ্গগোর** : পাঞ্জাবে দরিয়া সাহিবে সিন্ধুনদের দেবতার সঙ্গে মাতৃদেবীর জাঁকজমক সহকারে বিবাহ দেওয়া হয়। এই দেবীকে শনের তৈরি পাত্রে স্থাপন করা হয়। দেবীর নাম গঙ্গগোর। মাটি বা গোবর দিয়ে তার মূর্তি তৈরি করে গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সিন্ধু-দেবতার সঙ্গে বিবাহ হবার পর তাঁকে কুয়োতে ফেলে দেয় ভক্তরা। আসলে এই দেবী হলেন পৃথিবী-মাতা। দ্রাবিড় বা অনার্যদের মধ্যে এই ধরনের পৃথিবী-মাতার বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁর বরের সঙ্গে বিবাহ দেবার ব্যবস্থা আছে।

৪। **গন্ধব-দেবী** : ভারতের আদি নরগোষ্ঠীর মধ্যে দেবদেবীর কল্পনা একটা

বিশেষ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ বেদীতেই তাঁরা অবস্থান করেন। এই দেবদেবীর কল্পনা এসেছিল যাযাবররা কোন বিশেষ স্থানে বসতি স্থাপন করার পরে। এই সময় তাদের গ্রামের বেদীতে যে দেব বা দেবীকে গ্রামের রক্ষাকর্তা বা কর্ত্রী হিসেবে স্থাপন করা হত তাদেরই বলা হত গ্রাম দেবতা। এদেরই উপজাতীয় ভাষায় বা উত্তর ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষায় বলা হয় গণ্ব দেবতা বা গণ্ব-দেবী। এই বেদীকে অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয় দেওহার অর্থাৎ পবিত্র স্থান। নদীস্রোতে বাহিত ক্ষয়ে যাওয়া পাথর, যাকে বলে নুড়ি, সেই পাথরকেই এই ধরনের বেদীতে স্থাপন করা হয়। গ্রামের কোন পবিত্র বৃক্ষের নিচেই এই বেদী স্থাপন করা হয়, যেমন বটবৃক্ষ। যে-সকল স্থানে এই ধরনের কোন নুড়ি পাওয়া যায় না সেখানে কোন ভগ্ন মন্দিরের পাথরের টুকরো এই ধরনের বেদীতে বসানো হয়। পরিত্যক্ত কোন বৌদ্ধ মঠের মূর্তি পাওয়া গেলে তাও বসানো হয়। বৌদ্ধ শক্তি মূর্তিগুলোকে মাতৃদেবতা হিসেবে বসানো হয়। কোথাও কোন প্রাচীন কোন অস্ত্র পাওয়া গেলে তাও বসানো হয় যেমন কুঠার। গ্রামগুলোর অবস্থা ভাল হলে ছোট ছোট ইটের মন্দিরও তৈরি হয়। যারা পাকা মন্দির তৈরি করতে পারে না তারা মাটির বেদীর উপর পুজো পার্বনের সময় বাঁশ, চাটাই ও খড়ের ছাউনী দিয়ে সাময়িক মন্দির তৈরি করে নেয়। বেদীগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার জন্য অনেকে বেদীর নিচে নরমুণ্ড রেখে দেয়। সাধারণতঃ এই মাথা হয় পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের আসনকে বলা হয় পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই ধরনের আসনের তাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।

অবয়বহীন এই ধরনের পাথর পূজার যথার্থ গোপন রহস্যটা যে কি— স্পষ্ট করে সে-কথা বলা সম্ভব নয়। তবে এ যে এক ধরণের সর্বপ্রাণজাত ব্যাপার অর্থাৎ জড় বস্তুতে প্রাণশক্তি আরোপ করে পুজোর ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। এই ধরনের পুজো করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূতপ্রেত, অপশক্তি ইত্যাদিকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে এর এ-পেছনে যে একেবারেই কিছু নেই তা নয়। বহু অলৌকিক ঘটনা এধরনের থান থেকেই ঘটেছে বলে জানা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাখরায় বড়-কাছারী বলে একটি কাছারী আছে। প্রতিমাসে অন্ততঃ কয়েক হাজার লোক এই ধরনের কাছারীতে মনোবাঞ্ছা জানিয়ে পুজো দেয়। এটি আদিতে ছিল মাটির ঢিবি। ঢিবির উপর আছে একটি অশ্বত্থ গাছ। বিগ্রহহীন এই বেদীতে গাছই দেবতা। এই বৃক্ষকে লোকে কল্পতরু বলে মনে করে। কেউ কেউ একে ভূতের কাছারীও বলে। শোনা যায় অতীতে স্থানটি ছিল শ্মশান। এখানে শবদাহ করা হ'ত। স্বয়ং ভূতনাথ, ভূত, প্রেত, ভৈরব, কিন্নর ইত্যাদি নিয়ে সেখানে বাস করেন বলে বিশ্বাস। তিনি এখানে যে বৈঠক বসান তারই নাম বড় কাছারী। কালক্রমে স্থানটি ভূতের কাছারী নামেও পরিচিত হয়। বঙ্গদেশে বর্গী-হাঙ্গামার

পূর্বে এই কাছারী ছিল বলে জানা যায়।

এই অঞ্চল এক সময় সুন্দর বনের অরণ্যে আবৃত ছিল। বর্গীর-হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাষী সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসেই আশ্রয় নেয়। সেই আশ্রয়স্থল আজ জনপদে পরিণত হয়েছে।

বড় কাছারীতে একদা এক সাধু এসে আশ্রয় নেন। সুন্দরবনের অরণ্যচারী বাসিন্দারা তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বিশ্বাস জন্মায় যে, ঐ সাধুই স্বয়ং বাবা ভূতনাথ। যাই হোক স্থূল দেহধারী সাধুবাবার ওখানেই চৈত্রের নীল গাজনের মেলার দিন মৃত্যু হয়। সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কিছুদিন পরে ঐ সমাধির উপর একটি অশ্বত্থ গাছ গজায়। গ্রামবাসীরা স্বপ্ন পায় ঐ অশ্বত্থ গাছই কল্পতরু। তিনিই সেই সাধুবাবা। সাধু প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি সেখানেই আছেন এবং থাকবেনও। তিনিই শিবশম্ভু। তিনিই তারকনাথ। প্রতিদিন গভীর রাতে তিনি এখানে কাছারী বসাবেন। এই কাছারীতে যারা প্রার্থনা জানাবে তারা সুবিচার পাবে। তাদের রোগশোক, দুঃখ ইত্যাদি ত্রিতাপজ্বালা জুড়োবে। ভক্ত জনের সকল কার্য সিদ্ধ হবে। তারা শান্তি পাবে। কথিত আছে, বাওয়ালীর মণ্ডল অর্থাৎ জমিদারদের এক গোমস্তা নাকি স্বচক্ষে দু'দিন শনি ও মঙ্গলবার গভীর রাতে এখানে ভূতের কাছারী দেখেছিলেন। তাই আজও প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ঢাকঢোল ও বাজি বাজনার সাহায্যে লোকে পূজো দেয়।

পুরানো অশ্বত্থ গাছটি আর নেই। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে নতুন এক বটগাছ গজায় সেখানে। তারই চার পাশে বর্তমানে ইটের বেদী তৈরি হয়েছে।

বহুলোক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই কাছারীতে এসে রাত্রি জাগরণ ক'রে হত্যা দেয়। ফল পাওয়া যায় বলেও বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের মূল্য কতটা কেউ নিজে পরীক্ষা করলেই সেটা বুঝতে পারবেন। প্রতি শনি মঙ্গলবার হাজার হাজার মানুষ নিশ্চয়ই এমনি এমনি ছোটেনা সেখানে। সরল বিশ্বাসের অদ্ভুত এক ছোঁয়া দেখা যায় এখানে যে বিশ্বাসের অভাবে সমগ্র সমাজ-জীবন আজ বিষিয়ে উঠেছে।

৫। গে-গেইয়া : গে বা গেইয়া হলেন প্রাচীন গ্রীসের পৃথিবী মাতা। প্রাচীন আর্যদের কাছে সকল দেশেই পৃথিবী মাতৃশক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা পেত। অনার্যরাও পৃথিবীকে মাতৃশক্তি হিসেবে বা মা হিসেবে কল্পনা করত। মিনোয়ান মাইসেনিয়ান সংস্কৃতির দেশ জয় ক'রে সেখানে বসতি স্থাপন করার পর গ্রীকদের মাতৃদেবী হিসেবে পৃথিবীর কল্পনা আরও বেড়ে যায়। কারণ মিনোয়ান মাইসেনিয়ান সংস্কৃতিতে সর্বপ্রাণবাদী ধারণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। গ্রীসে যে এই পৃথিবী পূজার ধারা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ গ্রীসের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে ও হোমার থেকে প্লুতার্ক পর্যন্ত নানা সাহিত্যে তাঁর বিস্তৃত উল্লেখে। হোমারের

সাহিত্যে দেবচরিত্র বিশিষ্ট গে-এর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তিতে পৃথিবীর নামে তিনবার শপথ করা হ'ত। ট্রয়-বাসিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময় এই পৃথিবীর বা গে বা গেইয়ার নামে শপথ নেওয়া হয়েছিল। এই শপথ নেবার সময় পৃথিবীর অর্থাৎ গে বা গেইয়ার উদ্দেশে কালো মেষ বলি দেওয়া হয়েছিল। তবে পৃথিবীকে কোন মানবীর রূপ দিয়ে দেখা হ'ত কিনা তা নিয়ে চিন্তা করার অবসর আছে। প্রকৃতির বহু শক্তিকেই অনেক সময় 'নাম' দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও তাদের কোন মূর্তি তৈরি করা হয়নি, যেমন ভারতের ঋগ্বৈদিক দেবদেবীদের ক্ষেত্রে। যখনই তাঁদের নররূপ আরোপ করা হয় তখনই তা পুরাণ-কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আদিতে হয়তো কোন মরমিয়া অভিজ্ঞতাকেই স্তুতি করা হ'ত। তবে হোমারের সাহিত্যে গেইয়ার বা গে-র যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর অবয়ব খুব স্পষ্ট নয়।

মানুষের জীবনে সে-রকম কোন ভূমিকা তিনি পালন করেন নি। হেসিয়ডে দেবনীর উৎপত্তি সম্পর্কিত বর্ণনাতে ও বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী বর্ণনাতে গে বা গেইয়ার একটি নাটকীয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এখানে পৃথিবীতে নররূপ আরোপ অত্যন্ত স্পষ্ট। নরনারীর যৌন প্রেমের মধ্য দিয়ে যেমন সৃষ্টি হয়—এখানকার সৃষ্টি-কাহিনীতে সেই ধরনের ভাব রয়েছে।

তবে গ্রীসের নাটকাদিতে তাঁকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে তাঁর দেবত্ব ফুটে উঠলেও তিনি সর্বপ্রাণবাদীয় শক্তি রূপেই অর্থাৎ জড়-পদার্থের প্রাণশক্তি রূপেই বেশি প্রকটিতা। গ্রীক ভাস্কর্যে নররূপে দেবদেবীরা যে ভাবে জন-চিত্ত জয় করেছিলেন গে- বা গেইয়া সে ভাবে করেন নি। তথাপি গ্রীসে যে পৃথিবী পূজার ধারা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল তা বলতে পারা যায় গ্রীসের প্রায় সর্বত্রই তাঁর বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করে। পৃথিবীর নানা গহ্বরে তাঁর উদ্দেশে বহু কিছু নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হ'ত।

পৃথিবী-পূজার সঙ্গে গ্রীসে ভবিষ্যৎ কথনের একটা সম্পর্কও ছিল। বিশ্বাস করা হত যে, পৃথিবী ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী আসে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, স্বপ্নে রসাতল থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বাণী কর্ণ কুহর দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। সেই জন্য কোন সমস্যার উত্তর পাবার জন্য খালি মাটিতে শুয়ে থাকার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশে একে 'হত্যা' দেওয়া বলা হয়। এই কারণেই সাঁপকে পৃথিবীর শক্তি হিসেবে কল্পনা করা হল অত্যন্ত প্রাচীন মানসিকতা। ভারতবর্ষে বাস্তুসর্প হিসেবে সাপের আজও বিরাট মূল্য। গ্রীকরা সাপকে ভবিষ্যৎ বক্তা হিসেবেও কল্পনা করত। গ্রীসের নানা স্থানে এই কারণে ভবিষ্যদ্বাণী পাবার জন্য গে বা গেইয়ার পূজা হ'ত। অইগই, অলিম্পিয়া, মারাথন, ডেলফি প্রভৃতি স্থান ভবিষ্যৎ-বর্ণনার জন্য বিখ্যাত ছিল। ইউরিপিদিস-এর বর্ণনা

থেকে জানা যায় যে, দেবী গে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী পাঠাতেন। অইগইতে গেইয়ার পূজা করা হত রসাতলীয় জগৎ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পাবার জন্য। মন্দিরের মহিলা পুরোহিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত শক্তি লাভ করার জন্য ষাঁড়ের রক্ত পান করত। গ্রীকরা ষাঁড়কে পৃথিবী-শক্তির সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত বলে মনে করত।

পাহাড়-পর্বতের গুহাকে পৃথিবী মাতার বেদী বলে কল্পনা করা হ'ত। মনে হয় পৃথিবীর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থেকেই এক সময় তাঁক 'গে-থেমিস' বলা হ'ত। তবে অনেকে মনে করেন যে, থেমিস হলেন স্বতন্ত্র দেবতা পরে গে থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে জিউস-এর সঙ্গে যুক্ত হন। গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে যখন তিনি রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেন তখন সততা ও উন্নত অধ্যাত্ম শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা দেন। থেমিস থেকে গে তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে যান।

গে বা গেইয়াকে পরে প্রেতাত্মাদের সঙ্গেও যুক্ত হতে দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসে বিশ্বাস ছিল, মৃত ব্যক্তির আত্মা মৃত্তিকা জঠরে রসাতলেই আশ্রয় পায়। সেই জন্য মৃতের উদ্দেশে কিছু করার সময় তাঁর পূজা করার ব্যবস্থাও ছিল। বাসন্তিক ও শারদ উৎসব অনুষ্ঠানেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হত। তবে যেহেতু গে বা গেইয়া মৃত্তিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেইজন্য যথার্থ অধ্যাত্ম যে মর্যাদা তা কখনও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবে নাম পরিবর্তন করে প্যানডোরা, অমরোস, থেমিস, ডেমেটার, কোরে প্রভৃতি রূপ যখন ধারণ করেন তখন তিনি পুরাণ কাহিনীতে নররূপ ধরে দেখা দেন এবং নৈতিক ও অধ্যাত্ম মূল্য লাভ করেন।

প্রাচীন গ্রীকরা দেবী কাইবেলিকেও গে-দেবীর সমকক্ষ করে দেখতেন বা তাঁকে গে বা গেইয়া অর্থাৎ পৃথিবী মাতা বলেই মনে করতেন। এশিয়া মাইনরের ফ্রিজিয়ান বা ফ্রিগিয়ানদের তিনি ছিলেন মহামাতৃকা স্বরূপা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এশিয়া মাইনরে তাঁর উদ্ভব হয়েছিল। ফ্রিগিয়ানরা এশিয়া-মাইনরে আসার আগেই তিনি সেখানে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৯০০ অব্দে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে গ্যালাটিয়া, লিডিয়া, ফ্রিগিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তবে ফ্রিগিয়াতে তাঁর ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

ফ্রিগীয় সীমান্তে কোন গ্যালাসিয় নগরে একটি সংরক্ষিত উল্কা-পিণ্ডকে এই দেবীর প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। এশিয়া মাইনর থেকে এই দেবীর পূজার ধারা প্রাচীন গ্রীসে এসে প্রবেশ করে। তবে এর চরিত্র এতটাই অ-গ্রীক ছিল যে, গ্রীসে সে ধরনের দেবীমর্যাদা কখনও লাভ করতে পারেন নি।

গ্যালাটিয়ান নগরী পেশ্‌সিনাস থেকে খ্রীঃ পূঃ ২০৪ অব্দ নাগাদ রোমানরা কাইবেলির প্রতীক এই উল্কাপিণ্ডকে রোমের প্যালাটিনে এনে স্থাপন করে। রোমানরা নাকি স্বপ্ন দেখেছিল যে, তাঁকে এনে রোমে স্থাপন করা হলে

হ্যানিবলকে ইটালী থেকে বিতাড়িত করা যাবে। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবল হয়ে উঠলে কাইবেলি পূজার ধারা রোম থেকে অন্তর্হিত হয়।

গ্রীস ও রোমে কাইবেলির মৌল চরিত্রের অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। গ্রীকরা তাঁকে রিহ্য়া, গে, ডেমেটার প্রভৃতির সঙ্গে এক করে দেখতেন। রোমানরা তাঁকে দেখাতেন টেল্লাস, সেরিস, ওপ্‌স ও মইয়ার সঙ্গে এক করে। তিনি ছিলেন বিশ্বমাতৃকা— যিনি দেবতা, মানব, পশু সব কিছুর জন্মদান করেছিলেন। অরণ্যের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অরণ্যাবৃত পর্বত গাত্রে তাঁর বেদী ছিল। অরণ্যের পশুরাজ সিংহ ভারতীয় দেবী দুর্গার বাহনের মত তাঁর বাহন ছিল। আদিতে তাঁর সঙ্গে ভূত-প্রেতদের সম্পর্ক ছিল। কৈলাশবাসিনী দেবী দুর্গার সঙ্গেও এই ধরনের ভূত-প্রেতের সম্পর্ক আছে।

ঐতিহাসিক কালে দেখা যায় খোজা জাতীয় পুরোহিতেরা এই দেবীর পূজো করতেন। এদের বলা হত গল্লোই। দীর্ঘকেশী এই খোজারা মহিলাদের পোশাক পরে রীতিমত বাদ্যাদি সহ নৃত্যময় ভঙ্গীতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালাত। এই সময় তারা যথেষ্ট আত্মনিগ্রহ করত, যেমন, নিজের দেহে নিজে চাবুক কষা, ছুরি দিয়ে দেহ বিদীর্ণ করা, নিজেকে ক্লান্ত করা ইত্যাদি। উপোস করে এরা শরীরকে জীর্ণও করত। দেবীর পূজোর জন্য মহিলা পুরোহিতও ছিল।

ভিনাসের সঙ্গে যেমন ছিল অ্যাডোনিসের সম্পর্ক, আইসিসের সঙ্গে অসিরিস-এর সম্পর্ক, তেমনই ছিল কাইবেলির সঙ্গে অ্যাট্টিসের সম্পর্ক। এই দৈত সম্পর্ক ছিল পৃথিবীকে শস্য সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। কাইবেলির প্রেমিক এবং পুত্র অ্যাট্টিস-এর জন্ম, বৃদ্ধি, নিজেকে পুরুষত্বহীন করা ও তাঁর মৃত্যুর যে কাহিনী পাওয়া যায় তা উদ্ভিদ জীবনের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। রোমে ২১ শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত মহাবিষুবে যে বসন্তোৎসব হত তাতে কাইবেলি ও অ্যাট্টিসের নামে ধর্মীয় নাটক অভিনীত হ'ত। কাইবেলির যে চিত্র পাওয়া যায় তা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, ঘোমটাবৃত। তিনি সিংহ পরিবৃতা। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যে-সব জিনিষ দেখা যায়— তাতে তাঁকে পার্থিব প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবেই মনে হয়। তবে তাঁকে আরাধনার মধ্যে এক ধরনের মরমিয়া ভাব ছিল। তাঁর প্রভাব ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যেই বেশি, যদিও তাঁকে ঘিরে কতকগুলি স্থূল ইন্দ্রিয়নির্ভর ব্যবস্থা ছিল যাকে ভারতীয় পঞ্চ 'ম'-কার তন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবু তা এই দেবীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। বহু গুণ সমন্বিতা দেবী আর্টেমিসও সম্ভবতঃ এই পৃথিবী দেবীই ছিলেন।

৬। গেফ্‌জোন্ ঃ উত্তর ইউরোপে বাল্টিক অঞ্চলের টিউটনদের তিনি এক দেবী। টিউটনদের দেবী ফ্রেজার সঙ্গে তাঁর অনেক মিল আছে। যে মহিলারা কুমারী অবস্থায় মারা যায় তারা স্বর্গে দেবী গেফ্‌জোনের সঙ্গে বাস করে বলে

মনে করা হয়। গেফ্‌জেনকে ফলদায়িনী পৃথিবী হিসাবেও কল্পনা করা হ'ত। এবং সেই হিসেবে তাঁর পূজোও হত। জীল্যান্ড দ্বীপের বর্তমান যে অবস্থা সেজন্য তেনরা এই দেবীকেই দায়ী মনে করে।

৭। গেশ্‌টিনন্ন্‌ ঃ প্রাচীন ব্যাবিলনের এক বিশেষ দেবতা হলেন তম্মুজ। তিনি মূলত ছিলেন শস্যের দেবতা। তিনি বসন্তে দেখা দিয়ে গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী সময়ে শুকিয়ে যেতেন। তাঁকে দেবী ইশতারের প্রণয়ীরূপে কল্পনা ক'রে গল্প তৈরি করা হয়েছিল। তম্মুজের এই শুকিয়ে যাওয়ার অর্থ হল তার পাতালে প্রবেশ। তখন দেবী ইশতার স্বয়ং পাতালে যেতেন তাঁকে উদ্ধার করে আনার জন্য। দেবী ইশতারের পূজো উপলক্ষে এই কাহিনী তৈরি হয়েছিল। আসলে এ হল আমাদের ভারতীয় 'দুর্গা পূজার মত উর্বরা শক্তির পূজা। তম্মুজকে পাতাল থেকে উদ্ধার করা নিয়ে যে গল্প আছে তাতে তাঁর ভগ্নী গেশ্‌টিনন্ন্‌ও যুক্ত। অনেক সময় দেখা যায় গেশ্‌টিনন্ন্‌ই পাতালে নামছে ভাইকে উদ্ধার করার জন্য। এই গেশ্‌টিনন্ন্‌ও এই কারণে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের এক দেবী ছিলেন।

৮। **গজলক্ষ্মী** ঃ এই গজলক্ষ্মীর কাহিনী চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায় ধনপতি সওদাগরের কাহিনীর মধ্যে। এখানে তিনি 'কমলে-কামিনী' রূপে-চিত্রিত। ধনপতি সওদাগর ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাবার সময় সমুদ্রের মধ্যে 'কালীদহে' এই দেবীর কমলে-কামিনী মূর্তি দেখেছিলেন। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দেবী কমলে কামিনীর এই ধরনের বর্ণনা আছে ঃ—

"কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষণেকে উগরিয়া ফেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥"

এই কমলে কামিনীর উপাখ্যান পরবর্তী কালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। একে অবলম্বন করে যাত্রা পাঁচালীও লেখা হয়েছিল। এই উপাখ্যান গজলক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এই গজলক্ষ্মীর মূর্তি অত্যন্ত প্রাচীন। তবে পূর্ব ভারতে এ মূর্তি তেমন প্রসিদ্ধি অর্জন করেনি। গজলক্ষ্মীর প্রসিদ্ধি মূলতঃ দক্ষিণ ভরত ও পশ্চিম ভারতে। বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়ে বাঙ্গালী এই গজলক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। তারই প্রভাবে 'চণ্ডীমঙ্গলে' কমলে-কামিনী রূপ ফুটে উঠেছে।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের গজলক্ষ্মীর যে রূপ খুব প্রচলিত তা এই ধরনের ঃ সমুদ্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটেছে। তার উপর এই গজলক্ষ্মী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। দু'পাশ থেকে দণ্ডায়মান দুটি হাতী শুঁড়ে হেমকুম্ভ জড়িয়ে দেবীর মস্তকে

বারি সিঞ্চন করছে। কোথাও শুধু উৎক্ষিপ্ত শুঁড় দ্বারা জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

গজলক্ষ্মী বা কমলে-কামিনী, যে নামেই বর্ণনা করা হোকনা কেন, ইনি মূলতঃ বৈদিক শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবী। এই লক্ষ্মীদেবী পদ্মাসীনা। পদ্ম হল সৃষ্টিতে প্রথম প্রস্ফুটিত ঘনীভূত সত্তা, বিজ্ঞানে যাকে নিউট্রন বিন্দু বলা যেতে পারে। এই লক্ষ্মী বা শ্রী হলেন সৃষ্টিরূপিণী। শ্রীসূক্তে এই দেবীকে 'পুষ্করিণীং' বলা হয়েছে। 'পুষ্কর'-শব্দ গজশুণ্ডাগ্রবাচক।

৯। **গায়ত্রী :** ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে গায়ত্রী ভর্গরূপিণী আদি শক্তি। এই ভর্গ অর্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিকে ব্রহ্মের শক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়। পরবর্তীকালে গায়ত্রী তাই জ্যোতির্ময় মূর্তিরূপে দেখা দেন। মূলতঃ গায়ত্রী হল সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র—

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

এর অর্থ "সবিতা দেবের সেই বরেণ্য ভর্গের (জ্যোতির) চিন্তা করি। তা আমাদের ধী-কে প্রচোদিত অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ বা পরিচালিত করুক।"

১০। **গিরিজা :** পর্বতবাসিনী দেবী দুর্গারই এক নাম গিরিজা।

১১। **গোধা-বাহনা দেবী :** ভারতীয় মহাদেবী দুর্গা, চণ্ডী বা কালীই এক সময় গোধা-বাহনা দেবীরূপে বঙ্গ সাহিত্যে পরিচয় লাভ করেছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাঁর এই চিত্র বেশি করে ফুটে উঠেছে। কালিকা পুরাণ ও বিশ্বসার তন্ত্রে দেবীর সঙ্গে এই গোধা বা গোধিকার সম্পর্কের কথা জানা যায়। কালিকা পুরাণে চণ্ডিকার প্রীতির জন্য এই গোধা বলি দেবার উল্লেখ আছে। বিশ্বসার তন্ত্রের পঞ্চম পটলে আছে যে, গোধা-মাংসে গুহ্যকালী তৃপ্তা হন।

বঙ্গদেশে প্রাপ্ত কিছু প্রস্তর মূর্তিতেও দেবীর সঙ্গে গোধাকে দেখা যায়। এই মূর্তিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর। গোধা যে কিভাবে এই মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা ভাববার বিষয়। নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, গোধা ছিল মধ্য প্রদেশের কয়েকটি আদি নরগোষ্ঠীর অভিজ্ঞান (Totem)। যে সকল আদি নরগোষ্ঠী গোধা অভিজ্ঞান যুক্ত তাদের মধ্যে দেবী অরাধনার ধারা পৌঁছুলে দেবীও গোধাবাহনী হয়ে ওঠেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ব্যাধ এই গোধা অভিজ্ঞান ভুক্ত কোন আদি নরগোষ্ঠীর লোক ছিলেন বলে মনে হয়।

১২। **গোসানী :** দেবী চণ্ডিকারই এক নাম গোসানী। মধ্য যুগের চণ্ডীমঙ্গলে এই শব্দেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী কামাখ্যাকেও গোসানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রঙ্গনাথ দ্বিজ মা কামাখ্যার ভক্ত ছিলেন। তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন :—

"কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ।"

রঙ্গনাথের চণ্ডীর অনুবাদে এই ধরনের বর্ণনাও আছে :

"গোসানীর দেখি অঙ্গ মহিষর ভৈলা রঙ্গ
হাসিয়া বোলয় শুন রামা।
তোহের বদন শোভে তরুণর মন লোভে
নবীন বিহিন হিম ধামা ॥"

১৩। গৌরী ঃ গৌরী হল দেবী দুর্গারই এক নাম। ভাষাবিদেরা গৌরী অর্থ করেন ফর্সা রঙের দেবী। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে হিমালয়ের কোন মোঙ্গল গোষ্ঠীর মানুষই তাঁর পূজা করতেন। অনেকে মনে করেন যে, গৌরী হলেন গিরি নদীর শক্তির প্রতীক। সেই অর্থে তিনি গিরি নদীর দেবী।

১৪। গ্বা ঃ ইনি টিউটন জাতির এক দেবী। দেবতা ফ্রিগ-এর ইনি বার্তা বহন করতেন।

১৫। গোহামায়া মাদী ঃ ইনি বর্ণেনার অরণ্যবাসী আদি নরগোষ্ঠীর এক শিলাদেবী। পাহাড়ের মাথা থেকে বড় একখণ্ড পাথর নিচে গড়িয়ে পড়েছে। সেই পাথরখণ্ডকেই তারা গোহামায়া মাদী বা মাতৃদেবতা রূপে কল্পনা করে। এই পাথরের সামনে তারা মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মূর্তি তৈরি করে দেয়। সম্ভবতঃ অতীতে তারা এই দেবীর কাছে নর ও পশু উভয়ই বলি দিত। বর্তমানে তার প্রতীক হিসেবে এই মূর্তিগুলি রাখে। এই পাথরের মধ্যে কোন শক্তি বাস করে বলে তারা বিশ্বাস করে।

১৬। গোঁসাই এরা ঃ মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে বাগ্‌দী বলে একটি জাত বাস করে। এদের রক্তের ধারার মধ্যে দ্রাবিড় রক্ত রয়েছে। চাষ করা, মাছ ধরা, জনমজুর খাটা এইসব এদের কাজ। এদের ধর্মের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মাচারও রয়েছে। আবার আদি নরগোষ্ঠীর বিশ্বাসের ধারাও আছে। এরা সাঁওতালবর্ পাহাড়ীদের মাতৃদেবতা 'গোঁসাই এরা'র্ পূজা করে। সাঁওতাল অধিদেবতা মোরেকোর এক ভগ্নীর নাম জাহির এরা। ইনি হলেন পবিত্র ঝোপের দেবী। সাঁওতালদের প্রত্যেক গ্রামে এই পবিত্র ঝোপ আছে। এই জাহিরারই ছোট বোনের নাম গোসাই এরা। ইনিও দেবী হিসেবে এদের পুজো পান। গোঁসাই শব্দটি সাঁওতালরা সম্ভবতঃ হিন্দুদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর লাভ করে।

১৭। গুলা ঃ প্রাচীন ব্যাবিলনীয় আরোগ্যের দেবতার নাম হল নিনিব। তবে তাঁর পত্নী গুলাও ছিলেন আরোগ্যদায়িনী শক্তির প্রতীক। নিজে তো বিরাট চিকিৎসক ছিলেনই, চিকিৎসা শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন রক্ষয়িত্রী দেবী।

## ঘ

১। ঘত্রিরাণী ঃ পাঞ্জাবের হিমালয় অঞ্চলে আদি নরগোষ্ঠীদের ধর্ম

পরবর্তীকালে আগত হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে আজও টিকে আছে। এরা প্রকৃতির নানা শক্তিকে নানা নামে আজও পূজা করে। অর্থাৎ তারা আজও সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। প্রকৃতির মহিলাত্মিকা শক্তিকেই তারা পূজা করে বেশি। সেই জন্য এদের শাক্তই বলা যেতে পারে। এই মহিলাত্মিকা শক্তি বা দেবী পাহাড় পর্বতের চূড়ায় থাকতে ভালবাসেন বলে তাদের বিশ্বাস। আবার কোথায় কোথাও, যেমন 'ধরকুর'-এ থাকেন শ্রীগুল— সম্ভবতঃ শ্রীগুরু অর্থাৎ শিব। তাঁর বিজং বলে এক দেবতাও আছেন। বিজং অর্থ বিদ্যুৎ। এই বিজং-এর সাততলা উঁচু বাড়ির মত এক বোন আছে। তার নাম বিজাঙ্গি। তাঁরই আর এক বোনের নাম ধত্রিয়ানী। একেও দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়।

২। **ঘাটুদেবী** **:** সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে সেইসব স্থানের অধীশ্বরী হয়ে বহু দেবী অর্থাৎ গ্রামদেবী বিরাজ করতেন। তাদের মধ্যে অনেকে সতীদেহ জাত একান্নপীঠের দেবীর সঙ্গেও মিশে গেছেন। তেমনই এক গ্রামদেবতা বা গ্রামদেবীরূপা মাতৃদেবী হলেন ঘাটুদেবী। মাণিক গাঙ্গুলীর—'শ্রীধর্মমঙ্গলে' বলা হয়েছে যে, 'পড়াশে ঘাটুদেবী' অর্থাৎ পড়াশ নামক স্থানে ঘাটু দেবী। যেমন হাওড়ার আমতায় 'মেলাই চণ্ডী'। মেলাই চণ্ডী একান্ন শাক্তপীঠের দেবীর সঙ্গেও জড়িয়ে গেছেন। এখানে সতীর মালাই চাকী পড়েছিল বলে দেবীর নাম মেলাই চণ্ডী।

৩। **ঘন্টাহস্তা ও ঘন্টী** **:** ঘ-বর্ণ দিয়ে মহাভারতে আরও দু'জন দেবীর নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজনের নাম ঘন্টা হস্তী। আর একজনের নাম ঘন্টী। উভয়ের অর্থই যিনি হাতে ঘন্টা ধারণ করে আছেন। ঘন্টাধারিণীকে ঘন্টাহস্তে দেবী দুর্গার কথা চিন্তা করেই কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া ঘ-বর্ণ দিয়ে মাতৃদেবীদের নাম খুব একটা পাওয়া যায় না।

## ঙ

ঙ-বর্ণ দিয়ে কোন মাতৃশক্তির নাম নেই। তবে এই বর্ণ নিজেই আদ্যাশক্তিস্বরূপা। এই বর্ণ সর্ব দেবোময়, ত্রিগুণময় ও পঞ্চপ্রাণময়।

## চ

১। **চলচিউটলিকিউ** **:** ইনি মেক্সিকো অঞ্চলের প্রাচীন রেড ইনডিয়ানদের এক দেবী। ছোট নদী, হ্রদ বা স্রোতস্বিনী জলধারার তিনি ব্যক্তিরূপ। মূল্যবান পাথর দিয়ে তার বস্ত্র তৈরি বলে মনে করা হ'ত। পান্না জাতীয় পাথর কুঁদে ব্যাঙ জাতীয় মূর্তি তৈরি করে তাঁর পুজো হ'ত। কখনও তাকে মনুষ্য অর্থাৎ মানবিনী

রূপও দেওয়া হ'ত। এই মূর্তির হাতে থাকত ভেক দ্বারা অলংকৃত লিপিপত্র। অনেক সময় চলচিউট্লিকিউকে সমুদ্রের দেবী হিসেবেও বর্ণনা করা হ'ত। তিনি বৃষ্টির দেবী হিসেবেও চিহ্নিত হতেন। বৃষ্টির দেবী হিসেবে তাঁর হাতে একটি ক্রুশ থাকত। মিশরীয় দেবদেবীদের হাতে তাঁদের ভূমিকা বোঝানোর জন্য যেমন প্রতীক চিহ্ন থাকত তেমনই ছিল এই চিহ্ন। এই দেবীর সম্মানে বসন্ত সমাগমে যে ভোজন-উৎসব করা হ'ত তাতে তাঁর উদ্দেশে যাদের বলি দেওয়া হ'ত তাদের এই ক্রুশে গেঁথে দেওয়া হ'ত। অনেক সময় তাদের তীর ছুঁড়েও হত্যা করা হ'ত।

২। **চামুণ্ডা ঃ** চামুণ্ডা অর্থ মহাভারত অনুসারে কঙ্কালিনী মূর্তি। ভারতীয় মহাদেবীর (দুর্গা-কালী ইত্যাদি) তিনি এক ভয়ঙ্করী রূপ। এই দেবীর গলায় নরমুণ্ডমালা শোভা পায়। কাপালিকরা মনুষ্য বলি দিয়ে আগে এই দেবীর পুজো করতেন। মনুষ্য বলি দেবার আগে কাপালিকেরা তাকে ঘিরে ভয়ঙ্কর নৃত্য করতেন। এই চামুণ্ডাকে দৈত্যনাশিনী বলে চিন্তা করা হ'ত।

দেবী মাহাত্ম্যে চামুণ্ডার নিম্নলিখিত গল্প দেওয়া হয়েছে ঃ মহিষাসুরকে বধ করে দেবীর সঙ্গে শুম্ভ ও নিশুম্ভের যুদ্ধ বাঁধে। এই দুই দৈত্য দেবতাদের পরাজিত করে ত্রিভুবনের শাসন নিজেদের হাতে তুলে নেয়। দেবতারা রক্ষা পাবার জন্য দেবী পার্বতীর শরণাপন্ন হন। এই সময় দেবী গঙ্গা স্নানে এসেছিলেন। তার দেহ থেকে অম্বিকা বা চণ্ডিকা নামে আর এক দেবী নির্গতা হয়েছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভের দুই ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড এই সময় চণ্ডিকা বা অম্বিকাকে দর্শন করে। দেবীর সৌন্দর্যে তারা নিতান্ত মুগ্ধ হয়। সেই জন্য তাঁরা শুম্ভকে সেই দেবীকে পত্নী হিসেবে পেতে বলে। ফলে শুম্ভ দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করে। দেবী একটি শর্তে এই প্রস্তাবে রাজি হন। প্রস্তাব এই যে, শুম্ভ দেবীকে পরাজিত করতে পারলে তবেই তিনি তাকে বিবাহ করবেন। (ভারতীয় যোগশাস্ত্রে এর একটি মরমিয়া ব্যাখ্যা আছে। দেবীর সঙ্গে এই যুদ্ধ হল জীবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির যুদ্ধ। প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি অর্জন করতে পারলে তবেই প্রকৃতি বা মায়া সাধকের বশ হন। তখন প্রকৃতি সাধকের পত্নীরূপে গণ্য হন। চণ্ডীতে পাঁচটি অসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধের যথার্থ অর্থ হল প্রকৃতিকে জয় করে মোক্ষ প্রাপ্ত হবার জন্য সাধকের সংগ্রাম। এই জন্য সমগ্র চণ্ডীকে ঋষি সত্যদেব 'সাধন-সমর' বলে বর্ণনা করেছেন। চণ্ডীতে পাঁচটি দৈত্যের মধ্যে অর্থাৎ সাধকের মধ্যে কেউই প্রকৃতিকে জয় করতে পারেননি। মধু কৈটভ ছিল নিম্নস্তরের সাধক। মহিষাসুর আরও একটু উচ্চস্তরের সাধক। শুম্ভ নিশুম্ভ অত্যন্তই উচ্চকোটির সাধক। কিন্তু তবু তাঁরা কেউই মোক্ষ অর্জন করতে পারেন নি)। শুম্ভ তখন দেবীকে বন্দিনী করার জন্য ধূম্রলোচন নামে এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবী সসৈন্যে তাকে সংহার করেন। ফলে ভিন্ন একটি বাহিনী দিয়ে

চণ্ড ও মুণ্ডকে পাঠানো হয়। অম্বিকা তাদের দেখে এতটা ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর ললাট থেকে ভয়ঙ্করী এক দেবী নির্গতা হন। তাঁর নাম 'কালী'। তিনি ছিলেন শীর্ণকায়া ও ব্যাঘ্রচর্মবসনা। তাঁর গলায় ছিল নরমুণ্ডমালা। জিহ্বা প্রসারিত। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেন। ফলে তাঁর নাম হয় চামুণ্ডা।

এবার শুম্ভ স্বয়ং বিরাট বাহিনী নিয়ে অম্বিকার কাছে আসেন। দেবীর সঙ্গে সকল দেবতাশক্তি জড় হয়। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। অসুরদের রক্তবীজ নামে এক সেনাপতি ছিল। তার দেহের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে সেখান থেকে নতুন এক অসুর গজাতো। ফলে বহু সংখ্যক অসুর তৈরি হয়। চণ্ডিকা তখন চামুণ্ডাকে আদেশ করেন যে, রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই যেন তিনি তা পান করে নেন। চামুণ্ডা সেই রক্ত পান করতে আরম্ভ করলে রক্তবীজ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেবী তখন রক্তশূন্য সেই অসুরকে বধ করেন। এবার নিশুম্ভ দেবীকে আক্রমণ করেন। দেবীর সিংহ অসুরদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অবশেষে নিশুম্ভও নিহত হন। শুম্ভও দেবীর হাতে প্রাণ হারান। যুদ্ধ শেষ হয়। দেবী মাহাত্ম্যে বর্ণিত এই সংগ্রাম থেকেই দেবী চামুণ্ডার উদ্ভব হয়। নিশুম্ভকে হত্যা করার জন্য দেবী নাকি ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করেছিলেন।

৩। **চণ্ডেশ্বরী** ঃ দেবী দুর্গার ভয়ঙ্করী রূপের মধ্যে যত রূপ আছে চণ্ডেশ্বরী রূপ তার মধ্যে একটি। নেপাল রাজাদের প্রাচীন কোন রাজা নেপালে এই চণ্ডেশ্বরী রূপ আমদানী করেছিলেন। মধ্য নেপালে ইনি নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও নেপালের কুলদেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা। এই দেবীর কাছে পশুবলি দেওয়া হয়— যেমন দেওয়া হয় কালীঘাটে, বিন্ধ্যাচলে, দেবী পাটনে ও মাদ্রাজে গ্রামদেবতার কাছে।

৪। **চণ্ডী (ওরাওঁ চণ্ডদেবী)** ঃ দেবী ভারতীয় রক্ষাশীলদের কাছে যেমন দেবী দুর্গা ওরাওঁদের কাছে তেমনই চণ্ডদেবী। মুণ্ডাদের চণ্ডো ওমোল ও সাঁওতালদের চণ্ডো বোঙ্গার সমার্থক তিনি। ওরাওঁদের কাছে তিনি হলেন শিকারের দেবী। শিকারের সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে মুরগি ও ছাগল বলি দেওয়া হয়। প্রতিবছর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই দেবীর কাছে বলির ব্যবস্থা আছে।

এই চণ্ডীকে মুণ্ডারী ভাষায় চাণ্ডীও বলে। মুণ্ডারী ভাষায় চাণ্ডী অর্থ শিলাখণ্ড। কেউ কেউ মনে করেন চণ্ডী শব্দটি অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। ছোটনাগপুরের ওরাঁওরা যে চণ্ডী বা চাণ্ডীর পূজো করে তিনি মূলতঃ শিকারের দেবী। গোলাকৃতি একখণ্ড পাথরে তাঁর পূজো হয়। শিকারে যাবার সময় তারা চাণ্ডীশিলা নামে একখণ্ড পাথরও কাছে রাখে। প্রত্যেকটি ওরাওঁ পল্লীতে পাহাড়ের কোন ঢালু জায়গায় একাধিক চাণ্ডী টাঁড় থাকে। সেখানে এক খণ্ড পাথরের বুকে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান।

৫। **চণ্ডী বা চণ্ডিকা ঃ** দেবী মাহাত্ম্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই চণ্ডী। 'চণ্ডী' দেবী সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গাসপ্তশতী দেবী চণ্ডী সম্পর্কে আর দুটি গ্রন্থের নাম। দুর্গা হোমে সপ্তশত আহুতি প্রদানের জন্য শ্রীশ্রী চণ্ডী সপ্তশত মন্ত্রে বিভক্ত হয়েছে। এই কারণেই এর এক নাম সপ্তশতী। দেবীমাহাত্ম্য এই গ্রন্থের মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত নাম। এতে সাতশ মন্ত্র বা ৫৭৮টি শ্লোক আছে।

পার্জিটার সাহেবের মতে 'চণ্ডী' খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। কিন্তু ভিন্ন মতে চণ্ডীর উৎপত্তিকাল খ্রীষ্টপূর্ব বা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। অনেকে মনে করেন যে, চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রকৃত অংশ।

কেউ কেউ মনে করেন, চণ্ডী নর্মদা অঞ্চল বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। অধ্যাপক নন্দিশারঞ্জন শাস্ত্রীর মতে চণ্ডীর জন্মস্থান বঙ্গদেশেই। কাদম্বরী, হরিবংশ, দশকুমার চরিত, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমত এই যে, চণ্ডি বর্ণিত দেবতা অর্থাৎ চণ্ডিকা— কিরাত ও শবরদের দেবী ছিলেন। সুতরাং কিরাত দেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব। সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম শহরের মেধাশ্রমই চণ্ডীতে উক্ত মেধা মুনির আশ্রম। সুরথ ও সমাধি 'মহীময়ী' মূর্তি নির্মাণ করে এই দেবীর পূজা করেছিলেন। এই মহীময়ী মূর্তিই বঙ্গদেশে দুর্গামূর্তির যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে তাই। 'বাসন্তী দেবী' রূপে এই দেবীরই পূজা হয় শরৎকালে অকালবোধন করে। দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপই প্রচলিত।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী কর্তৃক পাঁচটি অসুরবধের বর্ণনা কাহিনীমূলক হলেও পরে তাতে মরমিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্ব যুক্ত করা হয়েছে। যোগীরা এই চণ্ডিকাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রূপে কল্পনা করেছেন— যিনি সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে উত্তুঙ্গ স্থনবাসিনী হিসেবে পার্বতী হন।

চণ্ডীকে যাঁরা আর্ষচিন্তাজাত বলে মনে করেন তাঁরা বলেন যে, চণ্ডী বেদমূলা। এর প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদ স্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদ স্বরূপা এবং উত্তর চরিত্র সামবেদ স্বরূপা। চরিত্রত্রয়ের ছন্দ— যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ। ঋগ্বেদের মতে ঐ তিনটি ছন্দদ্বারা মন্ত্রপাঠ করলে ব্রহ্মতেজলাভ, আয়ুবৃদ্ধি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। চণ্ডী ও গায়ত্রী উভয়েই প্রণবস্বরূপা। ঋক্ মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার স্তব, যজুর্মন্ত্র দ্বারা তার পূজন ও সামমন্ত্র দ্বারা তাঁর ভজন হয়। চণ্ডী পরমাত্মাময়ী। বেদ মাতাই চণ্ডী রূপে প্রকটিতা। এক সময় জাপানেও বৌদ্ধ দেবী হিসেবে এই চণ্ডী পূজিতা হতেন। তাঁর নাম ছিল সপ্তকোটি বুদ্ধ মাতৃকা বা চন্দী দেবী বা কোটিশ্রী। জাপানী ভাষায় চন্দী শব্দ দ্বারা যা বোঝায় সংস্কৃত চণ্ডী শব্দ দ্বারাও

তাই বোঝায়। এই চণ্ডী গ্রন্থ উক্ত দেবীর অষ্টভূজা, দশভূজা, অষ্টাদশ ভূজা নানা মূর্তি আছে। তিনিই আবার কখনও দ্বিভূজা, কখনও চতুর্ভূজা, কখনও দ্বাদশভূজা।

বঙ্গদেশে চণ্ডিকা দেবী দুর্গা রূপেই প্রসিদ্ধা। তিনি দশভূজা। রূপ মহিষমর্দিনী। মহিষাসুর বধ করেছিলেন বলেই এই দেবীর নাম মহিষাসুরমর্দিনী। যে মহিষাসুরকে মর্দন করে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পরিচিতা হয়েছেন তান্ত্রিকেরা সেই মহিষের ভিন্ন অর্থ ক'রে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবী চণ্ডিকাকে ভিন্ন দ্যোতনা দিয়েছেন। যেমন, মহ + ঈষ = মহিষ। ঈষ হল ঈশের মূর্ধা উষ্মা অবস্থা। শিবই মহ + ঈশ অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার (ঈশ) মহা বা শ্রেষ্ঠ দেবতা মহেশ বা মহেশ্বর। ঐ ঈশ ক্রিয়া যখন মূর্ধা উষ্মা (kinetic energy level) প্রাপ্ত হয় তখন হয় 'ঈষ'। এবং তখনই আর রুদ্ধ থাকে না— ইষু হয়ে ছুটে যায়। এই ঈশের মহ বা মহত্ত্বযুক্ত ভাব মহিষ সর্বদা অস্থির হয়ে ছুটে যাবার জন্য উন্মুখ (অস + উ) ও অগ্নিশক্তি (র) যুক্ত, অর্থাৎ অসুর। প্রকৃতি যখন পরমার্থের সন্ধান পান, তিনি চান না বিকৃতি-পর্যায়ে যেতে। তখনই তিনি বধ করেন এই অসুরকে। সেই অসুরকে মর্দন করে দেবী এখানে শুদ্ধা প্রকৃতির কাজ করেই মহিষাসুরমর্দিনী হয়েছেন। ভারতে মথুরাতে প্রাচীনতম মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। সময় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ। এখানে দেবী অস্ত্র ছাড়া শুধু হাতের সাহায্যেই মহিষ বধ করছেন। এক হাতে সজোরে মহিষের পৃষ্ঠ মর্দন করছেন, অপর হাতে জিহ্বা উৎপাটন করছেন।

বাঙালীরা দেবী চণ্ডিকা বা দুর্গার যে প্রতিমা-চালা তৈরি করেন তাতে দেবী শুধু একা থাকেন না। তিনি সিংহবাহিনী এবং সঙ্গে থাকেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। যোগী পুরুষেরা এর একটি মহৎ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সিংহ অর্থ শ্রেষ্ঠমানব। মানুষও পশু। কিন্তু যিনি পূর্ণ জ্ঞানী, তিনি পাশমুক্ত। কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকের শীর্ষস্থানে তুলে তিনি তাঁকে ধারণ ক'রে পার্বতী করেন। এবং সিংহরূপে অর্থাৎ পশুরাজরূপে তাঁর বাহন হন। এই হল সিংহের তাৎপর্য। কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছুলে মানুষের মধ্যে বীর্য। (কার্তিকেয়) জ্ঞান (গণেশ) ঐশ্বর্য (লক্ষ্মী) ও বিদ্যা (সরস্বতী) জাগ্রত হয়। এই জন্যই এই পার্বতী দেবীর চতুর্দিকে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদিকে দেখা যায়।

দেবীর সিংহ বাহনের এই বিরাট তাৎপর্য একসময় সারা পৃথিবীতেই ছিল। কারণ, পৃথিবীর নানা দেশেই এক সময় মাতৃদেবতাদের বাহন সিংহই ছিল। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মাতৃমূর্তির বাহন ছিল সিংহ। তাঁর ভর্তার বাহন ছিল বলীবর্দ, আমাদের যেমন শিবের বাহন ষাঁড়। এই দেবীও ছিলেন সেনাবাহিনীর নেত্রী। মেসোপটেমিয়ার মাতৃমূর্তি পর্বতবাসিনীও ছিলেন। ক্রীট দ্বীপের একটি মুদ্রাঙ্কিত আংটিতেও দেবীর পর্বতবাসিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁর দুই পাশে ছিল দুটি

সিংহ। প্রাচীন গ্রীসের মাতৃদেবীও ছিলেন অশ্বজশোভিতা, বর্শাধারিণী ও পর্বতশিখরবাসিনী। তিনিও ছিলেন সিংহদ্বারা বেষ্টিতা। এশিয়া মাইনরের সিবিলি দেবীর পদপ্রান্তে দেখা যায় রয়েছে সিংহ, ভালুক, চিতাবাঘ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ার। তাঁরও বাসস্থান দেখা যায় এমন কতকগুলি অঞ্চলে যাতে তাঁকেও বলা যায় পর্বতবাসিনী, যেমন, মিসিয়া, লিডিয়া, ফ্রিগিয়া প্রভৃতি স্থানের পর্বত শীর্ষে। ফ্রিগিয় দেবী 'দামন মা' নামেও পরিচিতা। কথাটির অর্থ 'ক্ষম মা' অর্থাৎ 'ক্ষমা'— অর্থাৎ পৃথিবী মাতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গারও উল্লেখ আছে 'ক্ষমা' নামে।

ঋগ্বেদীয় উষাও ছিলেন দশভুজা। তাঁরও বোধন হত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মেসোপটেমীয় এক রিলিফে দেখা যায় এমন চিত্র, যা প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র পর্বতবাসিনী নন, ছিলেন সিংহবাহিনী দেবীও। তাঁর সঙ্গে কাপ্পাডোসিয়ান দেবী 'মা'-এরও মিল আছে। 'মা'-ও সিংহ বা চিতার উপর দণ্ডায়মানা। হেলেনীয় বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রীসের রণদেবী 'আথেন' দেবাসুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেবাসুরের এই যুদ্ধের কাহিনী পার্গামনের (বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত) বেদীগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। এখানে দেখা যায় আথেন-এর সঙ্গে যুদ্ধরত রয়েছে এক দানব। এখানে দেবীর বাহন সিংহ আর একটি দানবকে নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছে।

পার্বতী বা চণ্ডীর স্বামীর মত (যদিও চণ্ডীতে চণ্ডিকার স্বামী হিসেবে শিবের উল্লেখ নেই। এখানে চণ্ডিকা সকল দেবতার তেজ থেকে উৎপাদিতা হয়ে ঔপনিষদিক ব্রাহ্মীশক্তিতুল্য) অর্থাৎ শিবের মত 'মা'-য়ের স্বামী তেষুবের বাহনও ষাঁড়। তাঁর হাতে শিবের হাতের বজ্র ত্রিশূলের মত ত্রিশূল দেখা যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচীন অধিবাসীদের 'বাইরগো' নামে এক দেবী ছিলেন। এদের শত্রু ছিল মনস্কের বলে এক জাতি। এরা ছিলেন আমাদের দেশের অসুরদের মত। ভূমধ্যসাগরীয়েরা এই দেবীর সাহায্যেই মনস্কেরদের জয় করছিলেন। 'বাইরগো' আর 'দুর্গা'-র উচ্চারণ প্রায় একই ধরনের।

সুদূর মিশর দেশেও মহিষাসুরমর্দিনী মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে। শক্তিমঙ্গল তন্ত্র মতে মিশর ছিল প্রাচীন ভারতের অশ্বক্রান্ত বিভাগভুক্ত।

'দুর্গাকে 'চণ্ডী' নামে মার্কণ্ডেয় পুরাণেই প্রথম অভিহিত করা হয়েছে। চণ্ডী বলতে আমরা ভয়ঙ্করী মাতৃমূর্তি বুঝি। শব্দটি চণ্ড শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বলে ধারণা। 'চণ্ড' শব্দ দ্বারা ভয়ঙ্কর বোঝায়। এই চণ্ড থেকেই এসেছে 'প্রচণ্ড' শব্দটি। চণ্ডাল শব্দের উৎপত্তিও বোধ হয় এই চণ্ড অর্থাৎ প্রচণ্ডতা থেকে। হরিবংশে এই দেবী ভয়ঙ্করী রূপের। সেজন্য তাঁর নাম হয়েছে চণ্ডাচণ্ডী বা চণ্ডা। তবে মহাভারতে কিন্তু 'চণ্ডী' অর্থ সুন্দরী রমণী। কালিদাসও 'চণ্ডী' শব্দের অর্থ সুন্দরী রমণী করেছেন। তবে এই চণ্ডীই চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই অসুরকে বধ করেছিলেন। যদি

তিনি সুন্দরী ও করুণাময়ীও হন— তবু তাঁর দেহ থেকেই নির্মম স্বভাবা দেবী চণ্ডিকার উৎপত্তি হয়েছিল। এতে মনে হয় চণ্ডী ছিল নানা অর্থের দ্যোতক।

তন্ত্রশাস্ত্র মতে চণ্ডী অর্থ চণ্ড = চণ্ড + (স্ত্রীলিঙ্গ) ঈপ্ = পরব্রহ্ম মহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। চণ্ডভানু, চণ্ডবল ইত্যাদি পদে চণ্ড শব্দটি ইয়ত্তা বা সীমা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অসাধারণ গুণশালীত্ব বোঝায়। ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া— এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া দেবীই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা।

ব্রাহ্মীশক্তি হলেও এই দেবী যে স্থূলতামুক্ত তা নয়। পৃথিবী মাতার স্থূলতা তিনি কাটাতে পারেন নি। এবং সেক্ষেত্রে তিনি শস্যদেবী রূপেও প্রকটিতা। প্রমাণ স্বরূপ শরৎকালে দেবীর বোধনের কথা বলা যেতে পারে। বোধনের সময় দেবীর প্রতীক কোন মূর্তি নয়— বিল্বশাখা। এরপরই স্নান ও নবপত্রিকার পূজা।

নবপত্রিকায় একটি কলাগাছের সঙ্গে কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক ও ধান বেঁধে দেওয়া হয়। এ-সব মিলে যা তৈরি হয় তা একটি শস্যবধূ। এই শস্যবধূই নবপত্রিকা। এই শস্যকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে ধরে পূজো দেওয়া হয়। প্রকৃতক্ষেত্রে মায়ের প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্রেরই পূজো হয় দুর্গা বা চণ্ডী মূর্তিতে। অবশ্য শাস্ত্রকারেরা মনে করেন যে, এক একটি শস্য এক একটি বিভিন্ন শক্তির প্রকাশক। যেমন, কলা হল ব্রাহ্মণী, কচু— কালিকা, হরিদ্রা— দুর্গা, জয়ন্তী— কার্তিকী, বিল্ব— শিবা, ডালিম— রক্তদন্তিকা, অশোক— শোকরহিতা, মান— চামুণ্ডা এবং ধান— লক্ষ্মী। এই নবপত্রিকা যে কিভাবে কখন দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলা যায় না। কালিকাপুরাণে বা চণ্ডীতে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। স্মার্ত রঘুনন্দন (১৬০০ খ্রীঃ) প্রভৃতির বিধানে অনেক শতাব্দী পরে দুর্গার সঙ্গে নবপত্রিকার যোগ স্থাপিত হয়।

এই পূজার সঙ্গে বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকারও প্রয়োজন হয়। এই বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা দেবার প্রথা যে কিভাবে এসেছে বলা যায় না। সম্ভবতঃ মধ্য প্রাচ্যীয় দেবী ইশতারের সঙ্গে এই দেবীর যোগাযোগ থাকার জন্যই দুর্গা পূজাতে বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়। দেবী ইশতারকে 'স্বর্গীয় বেশ্যা' heavenly harlot বলা হ'ত। মধ্য প্রাচ্যের অন্যত্র দেবীর পূজাতে যে দেবদাসী প্রথা বা বেশ্যাবৃত্তি ছিল সেই রীতির সঙ্গে একদা ভারতীয় মাতৃপূজাও জড়িত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যীয় প্রভাবেই ভারতীয় মাতৃপূজার সঙ্গে বেশ্যার যোগাযোগ হয়ে গেছে। সেই জন্য মাতৃ আরাধনায় বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকারও প্রয়োজন হয়।

৬। **চণ্ডকী, চণ্ডকাঈ :** উত্তর ভারতে গ্রামের রক্ষয়িত্রী দেবতাকে বলা হয় গ্রামদেবতা। গ্রামদেবতা বা দিকবাররা আসলে এক ধরনের বিদেহী শক্তি। কখনও মানুষের প্রেতাত্মারাও এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই গ্রামদেবতাকে সাধারণতঃ

পৃথিবী মাতার সঙ্গে এক করে দেখা হয়, কখনও কখনও অন্যান্য মাতৃদেবীদের সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসানো হয়। এই ধরনের শক্তিকে মহিলা শক্তি হিসেবে দেখার কারণ, ভারতীয়রা মনে করে যে, মহিলারা প্রেতাত্মিক শক্তি দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। মহিলাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় শক্তি বেশী ভর করে বলেও বিশ্বাস। এই ধরনের বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। সেজন্য যে মহিলাদের উপর ভর হত সেই মহিলারা অর্থাৎ মিনাড জাতীয় মহিলারা নানাস্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে বিসহী নামে এক ধরনের মহিলা আছে, যারা দয়ন নামে এক ধরনের ভয়ঙ্কর ভূতকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে এমন ক্ষমতা লাভ করে যে, কাউকে মারতেও পারে, প্রাণে বাঁচিয়েও দিতে পারে। মন্ত্র শিখে সে একটি ক্রিয়া করে। প্রেত বৈঠকে বসে পাহাড়ের কোন গর্তে একটি করে পাথর ফেলে দেয়। বছর শেষে গর্তটি যদি ভরে ওঠে তবে বিসহী জীবন ও মৃত্যু উভয়ের উপরই নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। যদি গর্তটি আংশিক পূর্ণ হয় তাহলে শুধু জীবন নিতেই পারে। এদেরই বলে ডাইন বা ডাইনী। প্রত্যেক বছর বিসহী এই গর্তে একটি কালো বেড়াল মেরে রক্ত ঢেলে দেয়। তখন ভূতেদের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। এই কারণেই মহিলাদের সমীহের চোখে দেখা হয়।

দক্ষিণ ভারতে এক ধরনের গ্রামদেবতা আছেন বা গ্রামের মাতৃদেবতা আছেন যাঁকে বলা হয় চণ্ডুকী বা চণ্ডকাঙ্গি। এই বিদেহী শক্তি কর্দমাক্ত জলাভূমিতে বাস করে বলে বিশ্বাস। এরা শিশুদের আক্রমণ করে থাকে। এঁকে খুশি করার জন্য নদীতীর থেকে কাদা তুলে নিয়ে মূর্তি তৈরি করা হয়। সেই মূর্তির কাছে বলি দিয়ে পূজা করার পর তাঁকে শেষ পর্যন্ত নদীর জলেই বিসর্জন দেওয়া হয়। বিজাপুর অঞ্চলে এই ধরনের গ্রামদেবতাকে গাছের নিচে সিঁদুরচর্চিত পাথর হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। চাষবাসের আগে একে পুজো দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা পাথররূপ গ্রামদেবতা আছেন। সাধারণতঃ গ্রামের প্রান্তভাগেই এদের পুজো দেওয়া হয়।

৭। **চিতরহই দেবী** ঃ ইনি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসিদের এক গ্রামদেবী।। চিতরহই-এর অর্থ হল ছেঁড়া কাপড়ের দেবী। এই দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য লোকে কাঁটাওয়ালা একটি গাছে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বেঁধে দেয়। তাদের বিশ্বাস, বিনিময়ে তারা একটি নতুন কাপড় পাবে। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো কন্টকবৃক্ষে বা ঝোপে বেঁধে দেবার সময় তারা প্রার্থনা জানায়, 'তোমাকে আমরা একটুকরো ছেঁড়া কাপড় দিচ্ছি। বিনিময়ে আমাদের নতুন বস্ত্র দান কর।' এই দেবীই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। তবে এই সব দেবদেবীর মূল একটা ক্ষেত্র থাকে— যেখানে তাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। যেমন, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও কালীঘাটের কালী মূর্তি আছে। কিন্তু কালীঘাটে দেবীর যে

মর্যাদা কাশীতে তা নেই। কাশী মূলতঃ শিবের ক্ষেত্র, মাতৃদেবতার নয়। তথাপি দেবী অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকা ঘাটের বিশালাক্ষী দেবী এখানে তাঁদের নিজস্ব মহিমা নিয়ে বিরাজ করছেন।

উত্তর ভারতের নানা স্থানে এই চিত্রহই দেবীই চিথ্রারিয়া বা চিথ্রইয়া ভবানী নামে বিরাজ করেন। চিত্রহই বা চিথ্রইয়া দেবীকে খুশি করার জন্য গাছে যে কাপড় বাঁধার ব্যাপার আছে সেটা করা হয় অনেক সময় রোগমুক্ত হবার জন্য বা তুক্‌তাক্‌ করার জন্য।

৮। চণ্ডালী ঃ ইনি বৌদ্ধ সাহজিয়া পঞ্চ মরমিয়া যৌগিক শক্তির এক শক্তি। বৌদ্ধরা দেহের পাঁচটি চক্রের এক একটি শক্তির এক একটি নাম করেছেন, যেমন, মূলাধারের শক্তির নাম ডোম্বি, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরের চঞ্চলা শক্তির নাম নটী, মণিপুর ও অনাহত অঞ্চলের প্রান্তদেশস্থ শক্তির নাম রজকী, অনাহত ও বিশুদ্ধচক্রের শক্তির নাম চণ্ডালী। চণ্ডালী অর্থ চণ্ড (স্ত্রীলিঙ্গ) ঈপ্ = পরব্রহ্ম মহিষী। সহস্রারের কূটস্থানের শক্তির নাম ব্রাহ্মণী অর্থাৎ ব্রহ্মাণের শক্তি। এই শক্তিকে সহজিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রে যোগিনী বলা হয়। এঁরা যে রক্তমাংসের কোন জীব তা নয়। যোগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এঁরা যুক্ত। এই যোগিনীরা শূন্যতার আত্ম শক্তি। যোগের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে বিভিন্ন চক্রে ওঠানো গেলে সেই সব চক্রের শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নির্মাণকায়াতে যোগবলে যে ভয়ঙ্করী শক্তি অনুভব করা যায় তাঁকেই বলা হয়েছে চণ্ডালী শক্তি। মণিপুর চক্র অঞ্চল ভস্ম করে দিলে এই স্থানে হম্ শব্দ দ্বারা চন্দ্র তার কিরণ বর্ষণ করে। চণ্ডালী তাই দেবী নইরাত্মা বা অবধূতিকা বা প্রজ্ঞা। হেবজ্রতন্ত্রে চণ্ডালীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে ঃ ভয়ঙ্করী শক্তি চণ্ডা হিসেবে তিনি প্রজ্ঞাস্বরূপা। আলি অর্থ বজ্রসত্ত্ব। সুতরাং চণ্ডালী অর্থ বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিলন। এই ধরনের মিলনজাত যে তেজ তা দ্বারা পঞ্চ ভূতাত্মক আবেগগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। তখন চন্দ্ররূপে বজ্রসত্ত্ব 'হম'-এর চরিত্র লাভ করেন। ভিন্ন মতে চণ্ডা হল ইড়া নাড়ি। আলি হল পিঙ্গলা নাড়ি। এই দুই নাড়িতে প্রবাহিত প্রাণ ও অপ্রান বায়ু যখন এক হয়ে যায় তখনই চণ্ডালীর উদয় হয়। নাভি হল মধ্য নাড়ি— অবধূতিকা। এই দুই নাড়ির মিলনে স্থূল সাত্ত্বিকতা পুড়ে গেলে মহা সুখের উদয় হয়। ভিন্ন আর একটি মতে চণ্ডা অর্থ শূন্যতা-জ্ঞান, আলি অর্থ সার্বিক করুণা। চণ্ডালী অর্থ শূন্যতা ও করুণার মিলন। এই দুইয়ের মিলন হলেই জ্ঞানদীপ্ত সমাধি হয় অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান হয়। এই অবস্থায় সময়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যায় অপরিবর্তিত এক শাশ্বত অবস্থা লাভ করে। চণ্ডালীকে সেই কারণে বজ্রসত্ত্বের মহিলাত্মিকা শক্তি বলা হয় বা স্ত্রী।

৯। চন্দ্রিকা ঃ পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে আছে বিষ্ণু সাবিত্রী দেবীকে পরম

ভক্তিভরে স্তব ক'রে দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি যে নামে অবস্থান করেন তার একটি তালিকা বলেছিলেন। তাতে দেখা যায় পুষ্করে তিনি সাবিত্রী নামে অধিষ্ঠিতা হলেও অন্যত্র ভিন্ন ভিন্ন নামে অধিষ্ঠাত্রী। সেই হিসেবে হরিশচন্দ্র নামক স্থানে তিনি চন্দ্রিকা নামে অধিষ্ঠান করছেন এই কথা বলা হয়েছে। সেই হিসেবে সাবিত্রী দেবীই চন্দ্রিকা দেবী।

১০। **চণ্ডেশ্বরী, চক্রধারিণী, চণ্ডদায়িকা** ঃ সতীর দেহখণ্ড বিষ্ণুচক্রে পতিত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা সতীপীঠ বা শাক্তপীঠ গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন গ্রন্থ নানাভাবে এই শাক্তপীঠের বর্ণনা দিয়েছে। এ-ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ পীঠনির্ণয়। পীঠনির্ণয়ে একান্নটি শাক্ত পীঠের বর্ণনা আছে। 'শিব চরিত' নামক গ্রন্থেও একান্নটি সতীদেহ খণ্ডজাত একান্ন শাক্তপীঠের বর্ণনা আছে। সেখানে এই একান্নটি শাক্তপীঠ ছাড়াও ছাব্বিশটি উপপীঠেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই উপপীঠস্থানগুলি দেবীর অলংকার, বস্ত্র, কেশ ও দেহাংশ পতনের ফলে গড়ে উঠেছে। এই উপপীঠের দ্বাদশ উপপীঠে পড়েছিল দেবী শিরোংশ। তাতে সেখানে যে শাক্তদেবীর উদ্ভব ঘটেছে— তাঁর নাম চণ্ডেশ্বরী। এবং ত্রয়োদশ উপপীঠ চক্রদ্বীপে পড়েছিল দেবীর অস্ত্র। সেখানে তিনি চক্রধারিণী রূপে অধিষ্ঠান করছেন। সুতরাং চণ্ডেশ্বরী ও চক্রধারিণী ভারতীয় সেই মহাদেবীরই নাম যিনি সতীপীঠের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ উপপীঠে চণ্ডেশ্বরী ও চক্রধারিণী নামে অবস্থান করছেন। সতী লোমখণ্ডপতন জাত পঞ্চবিংশ উপপীঠে দেবী চণ্ডদায়িকা নামে বিরাজ করছেন।

১১। চ-বর্ণ দিয়ে দেবীর আরও নানা নাম আছে— যেমন, চণ্ডমুণ্ডী, চণ্ডনায়িকা, চন্দ্রভীমা, চতুর্ভুজা, চতুর্বক্তা, চন্দ্রা ইত্যাদি। এ-সবই একই মহাদেবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে কল্পনা মাত্র।

## ছ

১। **ছিন্নমস্তা** ঃ ছিন্নমস্তা হিন্দু দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। এই দেবীকে বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। ভারতীয় পুরাণের মতে শিব সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে অনুমতি না দিলে সতী ক্রুদ্ধা হয়ে দশটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে শিবকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই দশটি ভিন্ন ভিন্ন রূপই সতীর দশমহাবিদ্যা রূপ। মূর্তির কল্পনা এইরূপ ঃ দেবী একটি যুগল মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে। তিনি উলঙ্গিনী। তাঁর মস্তক ছিন্ন। দক্ষিণহস্তে খড়্গ, তাই দিয়ে ছিন্ন করেছেন নিজের মস্তক। বাম হস্তে সেই আলুলায়িতা কেশসম্পন্ন মস্তক ধারণ করে আছেন। দুইধারে উলঙ্গা আলুলায়িতা কেশা দুই সখী। ত্রিধারায় রক্ত ছুটে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ঊর্ধ্বে উঠে ধনুকের বাঁকানো ছিলার মত নিচে পড়ছে। এই তিন ধারার এক ধারা নিজের

ছিন্নমস্তকে পান করছেন স্বয়ং। দুই ধারা পান করছেন দুই সখী।

তান্ত্রিকরা ছিন্নমস্তার অর্থ করেছেন মায়াপাশ ছিন্নকারিণী হিসেবে। ছিন্নমস্তক রূপে দেবী নিজেকে বিশ্বরূপে ভাগ করে সর্বতোভাবে সেই বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। মাঁয়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড। মা বিশ্বেশ্বরী। ছিন্নমস্তার তিন রুধির ধারাতে আছে অন্নপূর্ণার ত্রিধাশক্তি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপা হলেন অন্নপূর্ণা। তাই তাঁর রুধির হল ত্রিধারা। জগৎ ভোক্তারূপে নিজের জগদ্দেহ থেকে ভোগ্য সংগ্রহ করছেন প্রকৃতি। ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করে নিজেই পরিপুষ্ট ও পালিতা হচ্ছেন। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিনই পৃথক শক্তিরূপে বিরাজমানা একই মহামায়া। ভোক্তা থাকতে পারে, ভোগ্যও থাকতে পারে। কিন্তু ভোগ না হলে পুষ্টি নেই। জগতের পালনের জন্যই ভোগ। তাই ত্রিরুধির ধারার একটি ধারা ছিন্নমস্তা স্বয়ং পান করছেন। অপর দুইধারা পান করছেন একাত্ম দুই সখী ভোক্তা ও ভোগ্য— শক্তিরূপা। সেইজন্যই তারা স্বতন্ত্রদেহী। ছিন্নমস্তায় আছে অন্নপূর্ণার জগৎপালন রীতি। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপে পড়লে বিশেষ করে রাহু, রক্তবস্ত্র পরিধান করে লোকে খোলা আকাশের নিচে ছিন্নমস্তার পুজো করে।

২। ছটমাতা ঃ আধুনিক বিহারের অধিবাসীরা সূর্যপূজার নামে ঘটা করে ছট্ পরব করে। ওরাওঁরা এঁকে ধর্মেশরূপে পুজো দেয়। মুণ্ডা, ভূমিজ ও হো-রা তাকে মদ ও মুরগি দিয়ে পুজো দেয়। বীরভূমের হাড়ীরা বসন্তকালের কোন রবিবার এই দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগল বলি দেয়। এর পেছনে যে দর্শন আছে তা— আদি নরগোষ্ঠীর সর্বপ্রাণবাদী চিন্তাধারা। বাংলাদেশের রাজশাহীতে এই দেবতার একজন পত্নী কল্পনা করা হয়। তাঁরই নাম ছট্‌মাতা। ষাটদিন ধরে সূর্যদেবের জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় ছট্‌মাতা হলেন তাঁরই উৎস। মহিলারা এই সময় সূর্যদেবের উদ্দেশে তাঁর বেদীতে নানা নৈবেদ্য নিবেদন করে।

৩। ছথী ঃ ভারতবর্ষে উচ্চনীচ সবার মধ্যেই জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সম্পর্কিত কতকগুলি বিধি পালন করা হয়। শিশুদের জন্মের পর তাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এরা কিছু অনুষ্ঠান করে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রে মহিলারা সারারাত জেগে বিশেষ এক দেবীর পুজো করে। তার নাম ষষ্ঠি। নিম্নবর্ণের বহুলোক যেমন, চমার বা চামার— যাদের সংস্কৃত ভাষায় বলা যায় চর্মকার, তারা এই দেবীকে বলে ছথী। মায়ের ভোগে দেওয়া হয় পিঠে, চালের গুঁড়ো, চিনি দিয়ে সেদ্ধ করা চাল ইত্যাদি। বাঙালী হিন্দু সমাজেও এই ছথী বা ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে।

উত্তর প্রদেশের দোশাধ বা দুশাধ নামে নিম্নবর্ণের লোকেরা বিশেষ করে ছথ বা ছথীর পুজো করে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রজনীকেই ব্যক্তিরূপ দান করে পুজো করা হয়। ষষ্ঠী বা ছথী পুজোর আগের দিন যে মহিলারা ষষ্ঠী পূজা করবেন তাঁরা

উপবাসে থাকেন। গান করতে করতে তাঁরা নদীর ধারে যান। এখানে বস্ত্রত্যাগ করে নদীতে নামেন এবং পূব দিকে মুখ করে অনুষ্ঠান করেন। সূর্য উঠলে তবে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সূর্যের উদ্দেশে যে পিঠে ও অন্যান্য খাবার উৎসর্গ করা হয় তা ভক্তেরা ভাগ করে গ্রহণ করলে ছথী পুজো শেষ হয়।

৪। **ছিউয়াকুয়াটল :** ইনি প্রাচীন মেক্সিকানদের এক নগররক্ষিণী দেবী, যেমন, আথেন ছিলেন এথেন্সের নগররক্ষিণী দেবী। আমাদের দেশে দেবী দুর্গাও যথার্থরূপে দুর্গরক্ষিণী অর্থাৎ নগরের দুর্গরক্ষিণী দেবী। তিনি প্রাচীন মেক্সিকোর কোন ধ্যাকানের রক্ষাকর্ত্রী রূপদেবী ছিলেন। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যেও এই ধরনের নানা রূপদেবী লক্ষ্য করা যায়।

## জ

১। **জগদ্ধাত্রী :** জগদ্ধাত্রী যে কে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, জগদ্ধাত্রী দেবী মূলতঃ পৃথিবী দেবী। কালিকাপুরাণে আছে— পৃথিবী দেবী জগদ্ধাত্রীরূপে জনক রাজাকে দেখা দিয়েছিলেন। পুত্র নরককে পৃথিবী বলেছেন 'পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ঞ্চিদম।" এ পুরাণে এই পৃথিবী দেবীকে আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। এই পৃথিবী দেবীর পূজা থেকেই শস্যদেবী ও শস্যপূজার উদ্ভব হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শরৎকাল থেকে বঙ্গদেশে শস্যঋতুর আরম্ভ। সেই জন্য দেবী পূজার আরম্ভ এই শরৎকালেই। মহাদেবী দুর্গার নবপত্রিকারূপে একথাই মনে করিয়ে দেয় যে দেবী শস্যবধূ। এইদিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেবী ইশতারের সঙ্গেও তাঁর মিল আছে। শুধু দেবী দুর্গা নন আরও অন্যান্য দেবীর পূজাও মূলতঃ শস্য পূজা। আমাদের দেশে শস্যঋতু আরম্ভ হয় শরতে। এই ঋতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শরৎ থেকে বসন্তই হল সকল প্রকার দেবী পূজার কাল। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণা পূজা সবই এই সময় হয়। অন্নপূর্ণা পূজা দিয়েই দেবী পূজার শেষ। সুতরাং দেবী জগদ্ধাত্রীকে দেবী দুর্গারই এক রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রকাশ বা আবির্ভাবের সময় হল ত্রেতা যুগাদ্যা কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে। ঐ তিথিতেই দেবীর বিশেষ পূজা ও উপাসনা হয়। দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপ প্রকাশের কথা আমরা জানতে পারি কাত্যায়নী তন্ত্রে। ঐ তন্ত্র থেকেই জানতে পারি যে, দেবী জগদ্ধাত্রী জগতের কল্যাণার্থে ও শান্তি বিধানার্থে বিশ্বের পালনকর্ত্রীরূপে প্রকটিতা হয়েছিলেন। এই মহাশক্তি পরিবর্তনশীল এই বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। জগদ্ধাত্রীরূপে তাঁকে অঙ্কন করা হয়েছে এইভাবে—

"সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং॥"

অর্থাৎ তিনি সিংহস্কন্ধাসীনা, বিবিধ অলংকার সজ্জিতা, চারি হস্ত সমন্বিতা ও যজ্ঞ উপবীততুল্য সর্পধারিণী। দেবী দুর্গার সঙ্গে এইখানেই যা রূপের প্রভেদ। এই পার্থক্য সত্ত্বেও মহাভারতে দেবী পার্বতীকেই জগদ্ধাত্রী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সপ্তশতী চণ্ডীতে ব্রহ্মা দেবী জগদ্ধাত্রীকে 'সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারিণী' বলে বর্ণনা করেছেন। 'বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি সংহারকারিনীম।' শ্রীশ্রী চণ্ডী দ্বিতীয় বা মধ্য চরিত্র চিত্রণে এই দেবীকে জগতের ধাত্রী বা পালনকর্ত্রীরূপে বর্ণনা করেছেন। অসুর নিধন কালে দেবকুলও দেবীকে জগদ্ধাত্রীরূপে চিন্তা করে উপাসনা করেছিলেন।

জগদ্ধাত্রী শক্তিরই প্রতিমূর্তি। বিপুল পালনী শক্তি এই দেবীর মধ্যেই নিহিত। তিনি যে যজ্ঞোপবীতের মত সর্পসূত্র বেষ্টিত্য তা তাঁর সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। রক্তবস্ত্রের মধ্যে রয়েছে রজো ভাব। এই দেবী শক্তিরূপে শক্তিরূপিণী, ধৃতিরূপে জগৎপালিকা এবং জননীরূপে বিশ্বধাত্রী।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মনে করেন যে, শক্তি সৃষ্টির আদিম পর্যায়ে জীবজগতে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন দেবী জগদ্ধাত্রী তারই রূপ মাত্র। সৃষ্টির প্রথম জীবজাগতিক পর্যায়ে পশুশক্তিরই ছিল প্রাধান্য। সেই পশুশক্তির নিয়ন্ত্রিকা শক্তিরূপেই তিনি সিংহবাহিনী। সিংহের পদতলে যে হস্তীমুণ্ড রয়েছে তা পৃথিবীদ্যোতক। এই পৃথিবীরই নিয়ন্ত্রিকা শক্তি হিসেবে তিনি সিংহবাহিনী হয়ে পশুজগৎ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এই শক্তিই আদি নরগোষ্ঠীর উপজাতীয় গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কালে ভয়ঙ্করী রূপা 'কালী মূর্তি ধারণ করেছেন। সমাজ যখন ধনে জনে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ও শৌর্যে বীর্যে ভরে উঠেছে তখনই তিনি দশভূজা 'দুর্গামূর্তিতে দেখা দিয়েছেন এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বীর্যে কার্তিকেয়, বিদ্যায় সরস্বতী, ঐশ্বর্যে লক্ষ্মী ও জ্ঞানরূপে গণেশকে। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে দেবী বিভিন্নরূপে দেখা দিয়েছেন।

২। জ-বর্ণ দিয়ে এই মহাদেবীর ভারতবর্ষে বহু নাম আছে, যেমন, *জগজ্জননী, জগৎগৌরী, জয় কালী, জয় দুর্গা, জয়ন্তী, জয় মঙ্গলা, জয়া* ইত্যাদি। এসবই মহাদেবীরই বিভিন্ন নাম। এর মধ্যে কিছু কিছু নামে তিনি একান্ন শাক্তপীঠের বিভিন্ন পীঠে অবস্থান করছেন। যেমন, বৈদ্যনাথ পীঠে তিনি আছেন জয় দুর্গা নামে ; জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে জয়ন্তী নামে ও কালীঘাটে (কালীপীঠে) জয়দুর্গা নামে। শিবচরিত বর্ণিত ২৬ উপপীঠের শ্বেতাঙ্গে তিনি আছেন জয়া নামে। কুব্জিকাতন্ত্রে পীঠস্থল ও পীঠদেবীর নাম প্রসঙ্গে সমুদ্র সঙ্গমে তিনি আছেন জ্যোতির্ময়ী রূপে, মাতৃদেশে জগন্মাতা রূপে ও যাদবেশ্বরীতে জয়মঙ্গলারূপে।

এঁদের পৃথক করে পরিচয় দেবার আর প্রয়োজন নেই।

৩। **জর :** হিন্দু ধর্মে জর নামে এক মহিলা দেবী আছেন। তাঁকে গৃহের রক্ষয়িত্রী দেবী বলে মনে করা হয়। কিছুটা দৈত্য দানো জাতীয় শক্তি হলেও তাঁকে যারা পূজো করে তাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন ভাবাপন্না। তাঁকে ধূপ, ধুনো, ফুল, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে পুজো দিলে তিনি খুশি থাকেন।

৪। **জ্বালামুখী বা জুয়ালামুখী :** জ্বালামুখী আসলে কোন দেবীর নাম নয়, একটি তীর্থস্থানের নাম। কিন্তু অনেক বিদেশী এই তীর্থস্থানের দেবীর নামও জ্বালামুখী করেছেন। মন্দিরটি পাঞ্জাবের কাংড়া জেলাতে অবস্থিত। কাংড়া শহরের শহরতলী অঞ্চলে। অনেকে একে নগরকোটও বলেন। জ্বালামুখী প্রাচীন হিন্দু অগ্নি-পূজার একটি ক্ষেত্র। এখানকার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কেউ ডাকেন দেবী বজ্রেশ্বরী নামেও। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। মধ্যযুগে ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ ও ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান ফিরুজ তুঘলক এই মন্দিরটি পরিদর্শন করেছিলেন বলে গল্প আছে। সুলতান ফিরুজ নাকি এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মাথায় সোনার ছাতা তুলে ধরেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ফিরুজ তুঘলক নন এই ছাতা তুলে ধরেছিলেন মহম্মদ শা বিন তুঘলক শাহ্। কিন্তু ঐতিহাসিক শমস্-ই-সিরাজ-আফিফ এ বয়ানের গল্পকে অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মহামায়া নামে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দূর দূর প্রান্ত থেকে ভক্তেরা এই মন্দিরে আসতেন। মন্দিরের দেবী যাতে তাদের প্রার্থনা শোনেন এই জন্য তাঁরা তাদের নিজেদের জিব্ কেটে দেবীর উদ্দেশে দান করতেন। আবুল ফজল গল্প শুনেছিলেন যে, অনেক ভক্তের কাটা জিব্ নাকি তক্ষুনি গজিয়েছে। কারো গজিয়েছে দু-একদিন পরে। আবুল ফজল বলেছেন যে, হেকিমী মতে কাটা জিব গজাতে পারলেও এত তাড়াতাড়ি তা সম্ভব নয়।

গোপথ ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে, দক্ষযজ্ঞে অপমানিতা সতী আত্মহত্যা করলে শিব উন্মাদ হয়ে তাঁকে কাঁধে নিয়ে ভারত পরিক্রমা শুরু করেন। বিষ্ণু তখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে দেন। সেই দেহের এক একটি খণ্ড ভারতের যে যে স্থানে পড়ে সেই সেই স্থানে এক একটি তীর্থস্থান গড়ে ওঠে। জ্বালামুখীতে সতীর জিহ্বা পড়েছিল। সেইজন্য লোকে তীর্থপুণ্য লাভের আশায় সেখানে নিজেদের জিব্ কেটে ছুঁড়ে দিত। পর্যটক হুগেল বলে গেছেন, দেবীর কোন মূর্তি নেই। মন্দিরে প্রবেশের মুখে দালানে একটি গর্ত আছে। এই গর্ত থেকে অনবরত অগ্নিশিখা ওঠে। অগ্নিশিখা ওঠে সাত আট ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে। আরও দুটি জায়গা থেকে এরকম আগুনের হল্কা ওঠে। ভক্তেরা

এখানেই উপবিষ্ট দুই সাধুর এক জনের হাতে ফুল নৈবেদ্যাদি তুলে দেয়। এই সাধুটি অগ্নিশিখার উপর ফুল নৈবেদ্য তুলে ধরে, পরে মন্দিরের ভেতর ছুড়ে দেয়।

জগেল মনে করেন যে, স্থানটি ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের একটি কেন্দ্র। সেইজন্য এই মন্দিরে ব্রাহ্মণদের তেমন মর্যাদা নেই। এই মন্দিরের ব্রাহ্মণকে বলা হয় ভোজকী পূজারী। ভোজকী পূজারী অর্থ যিনি দেবীর উদ্দেশে দান করা ভোজ্যাদি আহার করেন। এদেরই বঙ্গদেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলা হয়। বিশ্বাস এই যে, এরা দান করা খাদ্যগ্রহণ করলে এদের মধ্য দিয়ে তা মৃত আত্মীয়দের সূক্ষ্ম দেহের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। আসলে তারা যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত চাকর বাকর শ্রেণীর যে-সব লোক ছিল তাদেরই বংশধর। পরে ব্রাহ্মণের ভূমিকা নিয়েছে। মৃত্তিকাগর্ভ থেকে নির্গত অগ্নিশিখাকে এইভাবে জ্বালামুখী দেবী বলে কল্পনা করে পূজা করার ধারা বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ ভারতেও আছে। আদিবাসী খাড়োয়াররা এই ধরনের অগ্নিশিখাকে কেন্দ্র করে বেদী তৈরি করে তাকে বলে জুয়ালামুখী বা জ্বালামুখী।

৫। **জুকস্ অক্ক** : ইনি ল্যাপ্‌দের এক দেবী। তাঁর নামের অর্থ ধনুকের বৃদ্ধা মহিলা। ইনি শিশুদের পতনজনিত আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করেন বলে ল্যাপরা বিশ্বাস করে। আমাদের দেশের ব্রত কথার কোন দেবীর মতন তিনি।

৬। **জুনো** : জুনো হলেন প্রাচীন রোমের প্রধান এক দেবী। তাঁকে দেবতা জুপিটারের পত্নীরূপে কল্পনা করা হয়। ইনি প্রাচীন গ্রীকদেবী হেরার তুল্য। জুনো, জুপিটার ও মিনার্ভা প্রাচীন রোমানদের দেবদেবীর জগতে ত্রিত্ব গঠন করে আছেন। রোমান রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিকে এঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। জুনোকে মহিলাদের বিশেষ দেবী হিসেবে দেখা হত। বিবাহের দেবী হিসেবেও তাঁর স্বতন্ত্র মূল্য ছিল সন্তান প্রসবেও তিনি সাহায্য করতেন। প্রত্যেক বছর ১লা মার্চ রোমান মহিলারা এই দেবীর নামে অনুষ্ঠান করতেন। এই সময় রোমের এসকুইলাইন পাহাড়ের উপর তাঁর মন্দিরে ফুল উৎসর্গ করা হ'ত। রোমান ভাস্কর্যে দেখা যায়, মজুরেরা এই দেবীর রথ টেনে নিয়ে চলেছেন।

তবে রোমে জুনো যে প্রথম থেকেই জুপিটারের সঙ্গে যুক্তা ছিলেন তা মনে হয় না। থাকলেও তাঁর স্ত্রী হিসেবে ছিলেন না। গ্রীক দেবদেবীর (দেবদেবীতে নরত্ব আরোপ অর্থাৎ নররূপ আরোপ) চিন্তা রোমে এসে পৌঁছানোর আগে এমন হয়েছে বলে মনে হয় না। আদিতে তিনি চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। চন্দ্রের সঙ্গে মহিলাদের বিশেষ যোগসূত্র আছে। মহিলাদের ভাবাবেগের সঙ্গে চন্দ্রের নিকট সম্পর্ক বিজ্ঞানীরাও ইদানিং আবিষ্কার করেছেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, রোমে প্রাচীন গোষ্ঠী-জীবনের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়লে ব্যক্তিগত যে সব দেবদেবী আত্মপ্রকাশ করেন জুনোও সেইভাবে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে

আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

৭। জ-বর্গে **জনমাতা, জম্ভনী, জাঙ্গুলী** ইত্যাদি আরও নানা দেবীর নাম আছে। হরিবংশে জনমাতার নাম পাওয়া যায়। জনমাতা আর্য জনগণের মাতা। জম্ভনীর নাম পাওয়া যায় মহাভারতে। জম্ভনী অর্থ যিনি গ্রাস করেন। জাঙ্গুলী হল জঙ্গলের দেবী। বৌদ্ধসাহিত্যে এঁর উল্লেখ আছে।

৮। **জইটেফ :** প্রাচীন মিশরে নুন নামে এক দেবতার কল্পনা ছিল। নুন ছিল আমাদের কারণ সমুদ্রতুল্য (primal psychic water)। সেই নুন থেকে আপন ইচ্ছায় এক দেবতা নির্গত হয়েছিলেন— যাঁর নাম আতুম। আতুম ছিলেন HE-SHE-GOD অর্থাৎ আমাদের ব্রহ্মার মত। বর্তমানে একে বলা হয় নিউট্রন ফিল্ড। মিশরীয় পুরোহিতেরা আতুমের এক পত্নী কল্পনা করতেন। তাঁরই নাম জইটেফ্। জইটেফ্ অর্থ আতুমের হস্ত। আতুমের জন্য একটি পত্নী ঠিক করার প্রয়োজনেই তাঁর কল্পনা করা হয়েছিল— যেমন ব্রহ্মার জন্য সরস্বতী, সাবিত্রী, ব্রহ্মাণী ইত্যাদি দেবীর কল্পনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই জইটেফ্ হলেন ইলেকট্রনতুল্য, প্রাচীন মিশরে যাকে বলা হয়েছে তেক্নুৎ।

৯। **জার পনিট্টুম বা জরপনিট :** প্রাচীন ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা মারডুকের তিনি পত্নী। জরবনিট অর্থ রূপোর মত চকচকে। সেমাইটরা তাঁকে বলত জরবনিট। জরপনিট অর্থ শস্যপ্রদায়িনী। তাঁর একটি উপাধি ছিল 'এরুয়া' অর্থাৎ গর্ভবতী। ব্যাবিলনের প্রাধান্যের কালে ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা হন মারডুক। তিনি হন এন লিল অর্থাৎ বেল। জরবনিট হন নিন লিল— অর্থাৎ বেলিৎ অর্থাৎ এন লিলের সহধর্মিণী নিন লিল। ব্যাবিলনের ঈশতর বলতে এই জরপনিটকেই বোঝায়। হেরোডোটাস জরপনিটকে অফ্রোদিত বলে মনে করতেন। ঈশতর জারপনিট্টুম-এর একটি উপাধি ছিল— অম-দু-বত = 'উম্মুপিতত্ বুরকি' অর্থাৎ 'কটী বস্ত্র উন্মোচনকারিণী, নগর মগ = গর্ভসঞ্চারিণী, মসুরু = জন্মের দেবী, নিন-তুর = গর্ভদেবী, নিন-জিজ্রন = বেলিৎ বিনতি = জন্মদায়িনী দেবী, অনি, অম, মম ও মমি = মা। জার পনিট্টুম-এর আসিরিয়-ব্যাবিলনীয় অর্থ বীজসৃষ্টিকারিণী। আসিরিয়া-বিদেরা তাঁকে সরপনিট্টুম বা 'উজ্জ্বল'-এই অর্থের দ্যোতিকা বলে মনে করেন।

১০। **জাইলডি :** ইনি শ্লাভদের এক দেবী। এঁকে পোগোডা নামেও ডাকা হ'ত। তাঁকে রোমান শিশ্নরের দেবী ডায়ানার মতও মনে করা হয়। গ্রীকদেবী আর্টেমিসেরও তিনি সমতুল্যা। চন্দ্রের রূপদী নামও ডায়ানা। সেই হিসেবে তিনি চন্দ্রদেবীরও সমকক্ষা। কুমারী মহিলা (ভারতের কুমারী, বা কন্যাকুমারীর মত) হিসেবে বিবাহিতা মহিলা ও কুমারীরা তাঁর পূজো করতেন। কৃষিকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও তাঁকে পশুবলি দিয়ে পুজো দিতেন। পোগোডা নামে তিনি ছিলেন

আবহাওয়ারও দেবী অর্থাৎ যিনি অনুকূল হাওয়া দান করেন।

১১। **জিদজিনিয়া** : ইনি ব্যাবিলনীয় দেবী ইশতারের মত ভিনাস তুল্যা। বিবাহ নিয়ন্ত্রী দেবী ও উর্বরা শক্তির দেবী হিসেবে গ্রাভরা তাঁর পূজো করতেন। মানুষ সাধারণতঃ সন্তানাদি কামনায় তাঁর পূজো দিতেন। এই জন্য তাঁকে আমাদের দেশের মা ষষ্ঠীর মত মনে করা যেতে পারে।

১২। **জিলোনেন** : ইনি প্রাচীন মেক্সিকানদের এক দেবী। প্রাচীন মেক্সিকান আজটেকরা এমন কিছু দেবদেবীর কল্পনা করেছিলেন যাঁরা বিশেষ করে রক্ষকর্ত্রীর ভূমিকা নেন। জিলোনেন তেমনই এক দেবী। এই দেবীর কাছে কুমারীদের বলি দেওয়া হ'ত।

১৩। **জোপেট্লাটেনন** : ইনিও প্রাচীন মেক্সিকানদের এক দেবী। শব্দটির অর্থ জোপেটলানদের মাতা। ইনি এক ধরনের ঔষধিগুণপূর্ণ সুগন্ধি ধূপ জাতীয় জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন বলে বিশ্বাস। চিকিৎসকেরা এঁর পূজো করতেন। চিকিৎসকদের মধ্যে পুরুষ চিকিৎসকেরাই এঁকে বেশি পূজো দিতেন।

১৪। **জাহ্নবী** : পতিতপাবনী মা গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন বলে তাঁর এক নাম জাহ্নবী। গঙ্গার মর্ত্যে আগমনকালে জহ্নুমুনির যজ্ঞ প্রাঙ্গণে এসে যজ্ঞক্ষেত্র ভাসিয়ে নেবার উপক্রম করলে তিনি তাঁকে গণ্ডূষে পান করে নেন। পরে ভগীরথের অনুনয়ের পর কান দিয়ে তাঁকে নির্গত করেন। এই জন্যও তাঁর এক নাম জাহ্নবী। মকরবাহিনী দেবী গঙ্গাই এই জাহ্নবী দেবী। ভারতবাসীর কাছে এই দেবী অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিতা। ভারতীয়েরা এই দেবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজো করেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই দেবীরই পুত্র ছিলেন। গঙ্গা নারীরূপ গ্রহণ করে রাজা শান্তনুকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরই ঔরষে ভীষ্মের জন্ম। এতে সর্বপ্রাণবাদী মনোভাব ও দেবদেবীতে নরত্ব আরোপ করে পূজো করার ধারা লক্ষ্য করা যায়।

১৫। **জিয়েবন্ন** : জিয়েবন্ন বা জাইলভি সমগোত্রীয়া দেবী। তাঁদের ভূমিকাও একই ধরনের।

১৬। **জোচিকোয়েট্জল** : ইনি প্রাচীন আমেরিকার মেক্সিকানদের অর্থাৎ আজটেকদের ফুলের ও প্রেমের দেবী। সারা দেশে তাঁর পূজো হ'ত। তাঁর সম্মানে বড় বড় পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল।

## ঝ

১। **ঝকরা বুরহী** : ইনি ওরাঁওদের পৃথ্বী মাতা। এঁকে কালো পক্ষ, ঝক্‌রা বুরহী, সরণা বুরহী ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। সরণা অর্থ ঝোপ। অর্থাৎ তিনি ঝোপঝাড়েরও দেবী। মুণ্ডারাও তাঁর পূজো করে। জাইর-এরা তাঁকে বলে

দেশউলি। প্রতি বছর নতুন শস্য উদ্গমনের সময় তাঁকে কালো মুরগী বলি দিয়ে ভাত ও ধোনো মদ দিয়ে পুজো করা হয়। তাঁর অধিষ্ঠান হল শাল গাছের গোড়ায়। সেখানে জল ভরা একটি ঘট বসানো হয়। যদি রাতের বেলা ঘটের জল অনেকটাই উবে যায় তবে মনে করা হয় আগামী বছর অনাবৃষ্টি হবে। যদি দেবীর কাছে মানত করা কোন মুরগি কালো পঞ্চ বা কক্‌রা বুরহীকে দেওয়া চাল খুঁটে খায় তবে মনে করা হয় যে, আগামী বছর ভাল বৃষ্টি ও ফসল হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, যেসব অসুর সূর্য দেবতা 'ধর্ম'-কে বিরক্ত ক'রে প্রাণ হারিয়েছিল তাদের আত্মাকে খুশি করার জন্যই এই কালো পঞ্চ পূজা করা হয়। পরবর্তী মুণ্ডারা যখন এই দেশ দখল করেছিল তাদের হাতে নিহত আত্মাদের খুশি করার জন্যই এই পুজো দেওয়া হয়। আবার কালো পঞ্চ বা কক্‌রা বুরহীর সঙ্গে পবিত্র ঝোপঝাড়ের সম্পর্ক দেখে কেউ কেউ মনে করেন, ইনি বৃক্ষশক্তি ছাড়া আর কিছু নন। উত্তর ভারতে বৃক্ষশক্তি পূজার এমন বহু নমুনা লক্ষ করা যায়। তবে ওরাওঁদের কাছে তিনি মাতা পৃথিবী। চাষবাসের মুখে সূর্যদেবতা 'ধর্মে'র সঙ্গে তাঁকে ঘটা করে বিবাহ দেওয়া হয়। এই বিবাহ দেওয়া হয় বসন্তকালে। এই সময় শাল বনে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে।

উৎসবের সময় প্রধান গুণিন 'ধর্মে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর পত্নী কালো পঞ্চের ভূমিকা নেন। গুণিন ও তাঁর পত্নী গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি শাল গাছের কাছে গিয়ে মুরগী বলি দেন। শাল গাছের গোড়ায় চাল ও ফুল দেন। তেল-সিঁদুর দিয়ে শাল গাছের গোড়া লেপে দেওয়া হয়। গাছের গোড়ায় একটি দড়ি জড়িয়ে দেওয়া হয়। তার মা পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে 'ধর্মে' মনে করে বিবাহ দেওয়া হয়। এরপর আরও অনেক মুরগি বলি দেওয়া হয়। প্রার্থনা করা হয়— 'হে কালো পঞ্চ প্রচুর বৃষ্টি হোক। আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ ও শস্যক্ষেত্র শস্য সমারোহে ভরে উঠুক।' সন্ধ্যা বেলা কোন জোয়ান গুণিনকে পিঠে করে নিয়ে তার বাড়িতে যায়। সেখানে জোয়ানের স্ত্রী তার পা ধুইয়ে দেয়। পরের দিন সকালে গুণিন গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে বেরেন। প্রত্যেক ঘরেই মেয়েরা তার পা ধুইয়ে দেয় ও তাকে চাল ডাল টাকা পয়সা দেয়। গৃহের কল্যাণের জন্য তার কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাকিটা গুণিন নিজে নেন। এর পর নাচগান হৈ হল্লোড় আরম্ভ হয়। এটা শেষ পর্যন্ত বেলেল্লাপনায় এসে ঠেকে।

যে ভোজ উৎসব হয় তা উর্বরাশক্তির জন্য ভোজ উৎসব। এই সময় ওঁরাওঁদের মধ্যে বিবাহ-শাদীরও ধুম পড়ে যায়। মনে করা হয় যে, এই উৎসব শেষ হলে ভূতপ্রেতেরাও শান্ত হয়ে থাকে। এই ভোজ উৎসবকে বলা হয় সরহুল। গুণিন এই উৎসবের সময় যে গৃহেই যান না কেন সেই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে নাচ আরম্ভ করেন। তিনি মেয়েদের খোঁপায় ও ঘরের দরজায় শাল ফুল গুঁজে

দেন। যে গুণিনকে মেয়েরা একটু আগেই প্রচণ্ড শ্রদ্ধা দেখিয়েছিল তার মাথাতেই তারা উদ্দামভাবে ঘড়ায় ঘড়ায় জল ঢালতে আরম্ভ করে। গুণিনের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে জন্য প্রচুর পরিমাণে খেনো খাওয়ানো হয়।

এই যে নৃত্য, এই যে ভোজ, সবই এক ধরনের জাদুক্রিয়া মাত্র। পবিত্র বলে গণ্য গুণিনের মাথায় জল ঢালার অর্থ হ'ল এক ধরনের জাদুক্রিয়া— যার দ্বারা প্রচুর বৃষ্টি নামবে বলে মনে করা হয়। বসন্তকালের হোলি উৎসবে [illegible] এমনটিই করা হয় সমতল ভূমিতে। 'মাইটা হুলি' বা কাদা দিয়ে হলি খেলার যে রেওয়াজ আছে তা এই ধরনের জাদুক্রিয়া মাত্র যা দ্বারা বৃষ্টি নামবে বলে আশা করা হয়। এই হল প্রাচীন বসন্তোৎসব বা bonfire dance. অবশ্য আজ অধিকাংশের কাছে হোলির সেই মূল অর্থটা হারিয়ে গেছে। তবে ওরাঁদের প্রতিটি উৎসবে অপশক্তিকে খুশি রাখার একটা ব্যাপারও আছে, কারণ, তারা মনে করে যে, তাদের চতুর্দিকে সব সময়ই অশুভ শক্তি বিরাজ করছে।

## ঞ

ঞ-ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে কোন দেবদেবীর নাম পাওয়া যায় না, যদিও এই বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ঈশ্বর সংযুক্ত। শক্তির দিক থেকে এই বর্ণ রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়। এই বর্ণ সর্বদা ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিযুক্ত।

## ট

১। **টডন্থ** : প্রাচীন আরবীয় নবতিয়ানদের তিনি এক দেবী। এই নবতিয়ানরা আরামিয়ান ভাষায় কথা বলতেন। তবে তাঁদের এই দেবীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

২। **টরি** : উড়িশ্যার পূর্বঘাট অরণ্যের আদিবাসী এক উপজাতির নাম কন্ধ। এই কন্ধদের স্রষ্টা দেবতার নাম হল বুরা। তিনি পৃথ্বীমাতা রূপে দেবী টরিকে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং দেবী টরি কন্ধদের পৃথ্বীমাতা। বুরা টরির উপর খুশি ছিলেন না, কারণ টরি পত্নীর করণীয় কর্তব্য করতেন না। টরি স্থূল জগৎ ও মানুষ তৈরিতে আপত্তি করেছিলেন, তবু বুরা যে জগৎ তৈরি করেছিলেন তা সবটাই স্বর্গে পরিণত হত, যদি না টরি ঈর্ষাবশতঃ তার ক্ষতি করতেন। এর ফলে বুরা ও টরির মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। অধিকাংশ কন্ধই বিশ্বাস করে যে, এই সংঘর্ষে টরিই জয়লাভ করেছিলেন। বুরা গুরুত্বের দিক থেকে তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে আসেন। টরি মানুষকে শিকার, যুদ্ধবিদ্যা ও কৃষিকর্ম শেখান। তবে বিনিময়ে নরবলি দিয়ে পূজা দাবি করেন। বর্তমানে এই দেবীর কাছে আর নরবলি দেওয়া হয় না, তবে তার বদলে মোষ বলি দেওয়া হয়। বলি প্রদত্ত পশুর এক টাক মাংস

নিয়ে গ্রামের মাটিতে ও প্রতিবেশীদের গ্রামের মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় যাতে সমগ্র অঞ্চল উর্বরা শক্তিতে ভরে উঠে।

দেবীকে খুশি করার জন্য এখন কণ্ডরা আর নরবলি দিতে রাজি নয়। সুতরাং বিপদ আপদের দিনেও আর নরবলি দিয়ে টরিকে খুশি করার চেষ্টা চলে না। বরং তাদের এখন বলতে শোনা যায়, 'আমরা মরব, তবু নরবলি দেব না।'

তবে টরির সঙ্গে নরবলি না দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফল ভাল হয়না বলে বিশ্বাস। এর ফলেই রোগ শোক মহামারী, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দেয়। সুতরাং নরবলি দেবার জন্য কণ্ডদের মধ্যে ইচ্ছা জাগে। আগে এই ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে নরবলি দেওয়া হ'ত। এখন আর নরবলি হয় না।

৩। **টইলটিউ :** আয়ার্লান্ডের কেল্ট দেবতা লুগ-এর ধাত্রীমাতার নাম টইলটিউ। টইলটিউ আসলে শস্য-শক্তি যাকে মহিলা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন কালে মহিলারাই চাষবাস করতেন বলে শস্যশক্তিকে মহিলা রূপে কল্পনা করা হত। তারই নাম দেওয়া হয়েছে টইলটিউ। পরে তিনি শস্য-দেবীরূপে আত্ম প্রকাশ করেন। তবে শস্যশক্তি কখনও মহিলা রূপে কখনও বা কোথাও কোথাও পুরুষ রূপে কল্পিত হয়েছেন। শরৎকালের প্রারম্ভে এই দেবীকে ঘিরে আয়ার্লান্ডে উৎসব হয়, আমাদের দেশে যেমন হয় শারদোৎসব। সেই হিসেবে দেবী দুর্গা যেমন উর্বরা শক্তির প্রতীক তেমনই টইলটিউ-ও। দেবতা লুগ সম্ভবতঃ সূর্য-দেবতা। সেই হিসেবে তাঁকে এবং তার ধাইমাকে ঘিরে যে উৎসব হয় তা হল কুয়াশা ও অনুর্বরতা থেকে আলো ও উর্বরতার জন্য উৎসব। এই সময় সূর্যদেবের সাহায্যার্থে জাদুক্রিয়াপূর্ণ উৎসবাগ্নি নৃত্যও হয়। এই উৎসবাগ্নি নৃত্য আমাদের দেশে বসন্তোৎসব বা দোল উৎসব নামে পরিচিত। আমাদের দেশে শরৎকাল যেমন শস্যসংগ্রহের সূচনা করে আয়ার্লান্ডেও আগস্ট মাসে তেমনই দেবতা লুগ ও তাঁর ধাইমাকে কেন্দ্রকরে লুগনসদ উৎসব হয়। বর্তমানে আর পৌত্তলিক মানসিকতাতে পূজো হয় না।

৪। **টেলেগলেন এজেন :** মধ্য এশিয়ার নানা উপজাতি এক সময় মাতা পৃথিবীকে দেবী জ্ঞানে পূজো করত, যেমন বুরিয়াৎ, মোঙ্গল ইত্যাদি। মোঙ্গলরা এই দেবীকে ডাকতেন টেলেগলেন এজেন নামে। শব্দটি অর্থ ধরণী মাতা। একটু ভালভাবে একে বলত অগতন টেলজি অর্থাৎ স্বর্ণময় মৃত্তিকা। তুর্কী জাতের লোকেদের মধ্যেও এই দেবীর পূজার ব্যবস্থা ছিল। মোঙ্গলদের কাছে মৃত্তিকা বা ধরণী ছিল মহিলা স্বরূপা। কিন্তু আকাশ পিতৃ-স্বরূপ।

৫। **টেল্লুস :** ইনি প্রাচীন ইটালীর পৃথ্বীদেবী। লাটিন শব্দে তাঁকে টেল্লুস বলা হ'ত। প্রাচীন রোমানরা পৃথ্বী-শক্তিকে টেরা মাতের বা টেল্লুস হিসেবে কল্পনা

করতেন। টেল্লুসকে খুশি করার জন্য গর্ভবতী গাভী বলি দেওয়া হ'ত। গাভীন গরুর পেট চিরে বাচ্চা বের করে তার ছাই ঘোড়ার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে দেওয়া হ'ত। এতে পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস ছিল। শুধু যে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় তাই নয় — মৃত্তিকা গর্ভে যে-সব শস্যের বীজ উদ্গমের অপেক্ষা করছে তাদেরও শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস ছিল। বীজ রক্ষিণী হিসেবেও তাঁর পূজো হ'ত। দেবী ডেমেটার যেমন মৃতের জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তেমনই টেল্লুসও রসাতল ও প্রেত-জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিবাহ-উৎসবেও এই দেবীকে স্মরণ করা হ'ত। পৃথিবী ছিল প্রাচীন রোমানদের কাছে ফলদাত্রী স্বরূপা। গ্রীকরাও অনুরূপ চিন্তাই করত। তিনি শুধু শস্যদাত্রী নন সন্তানদাত্রীও ছিলেন। মৃত্যুর পর লোকে করুণাময়ী পৃথ্বী মাতার কোলে গিয়েই আশ্রয় নেয়। টেল্লুস পূজার এই ধারা রোমানরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য দেশের নিজস্ব পৃথিবী পূজার ধারার সঙ্গে তা মিশে গিয়েছিল।

৬। **টেগউ ইউর্ফ রোন :** ইনি প্রাচীন ওয়েলশের সর্পদেবী। তাঁর নামের অর্থ স্বর্ণমণ্ডিতবক্ষা।

৭। **ট্লাকোল টিওটল :** ইনি মেক্সিকোর প্রাচীন আমেরিকানদের এক দেবী। প্রাচীন আমেরিকান শব্দে টিওটল শব্দ দেবতা সূচক। তাঁকে মেক্সিকান ইভ্ বলা হয়। ইভের মত তিনিই প্রথম পাপ করেছিলেন। আসলে গল্পের আকারে যা বলা হয়েছে তাই এই যে, তিনিই হলেন আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনিত্য জগৎ তৈরি করেছিলেন। সুতরাং এটাই হল পাপ। তাওবাদের তিনি ইন-এর সমকক্ষা। আমাদের যোগের হংস-এর স-এর মতন। ট্লাকোল টিওটলের মধ্য দিয়ে যে পাপ এসেছিল সেই পাপ এসেছিল সময়ের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। এই জন্য প্রাচীন মেক্সিকানরা নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জল ধৌত করে বলত, 'জলদেবীর কাছে এস। জলদেবতার কাছে এস। তোমার পাপ স্খলিত হোক, যে-পাপ জগতের উদ্ভব অবধি বয়ে আসছে।' আমাদের দেশে আদ্যাশক্তি মহামায়া হওয়া সত্ত্বেও মায়াকে জয় করার জন্য যেমন তাঁরই আরাধনা করা হয় তেমনই হয়তো প্রাচীন মেক্সিকানরা ট্লাকোল টিওটল-এর পূজা করতেন। অ্যাজটেক ও তাদের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত লোকেরা এই দেবীকে পূজো দিতেন। এই দেবী মহিলা গুণিন ও ধাতৃদের পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন।

৮। **টোটিও ইয়ন :** ইনি আমেরিকার প্রাচীন মেক্সিকানদের দেবমাতা তুল্যা। আমাদের ঋগ্বেদের অদিতির মত। তাঁর আর এক নাম টোচি। মেক্সিকানরা এঁকে বলতেন, আমাদের পিতামহী। যেমন আমাদের কামাখ্যা। কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি

অস্ট্রিক শব্দ থেকে। অস্ট্রিক মনক্ষেরদের ভাষা কা-মেই-খা অর্থাৎ পিতামহী বিশ্বমাতা। (কা = স্ত্রী, মেই = মা, খা = জন্মদাত্রী) শব্দ থেকেই এসেছে কামাখ্যা শব্দ। টেটিও ইন্নন সেই কামাখ্যা দেবীর মত। প্রাচীন আমেরিকানরা নরবলি দিয়ে পূজো করতে ভালবাসত। সুতরাং চিন্তা করতে অসুবিধা নেই যে, এই দেবীকেও নরবলি দিয়ে পূজো করা হত যেমন করা হত দেবী কামাখ্যাকে।

মজার কথা এই, দেবীকে **ট্লাজোল টিওটল** নামেও ডাকা হ'ত। এর অর্থ বিষ্ঠার দেবী। ট্লাজোল টিওটলকে অ্যাজটেক নরগোষ্ঠীর নষ্টারা একমাস ধরে পূজো করত। তাঁকে যৌন শক্তির দেবী বলে মনে করা হ'ত। তাঁর পূজায় বহু তরুণী নারীকে বা বালিকাকে বলি দেওয়া হ'ত। তাঁর আর এক নাম ছিল ট্লায়েল কুয়ানী অর্থাৎ কাদাখেকো দেবী। অর্থাৎ পাপের দেবী। সাধারণত তাঁকে শস্যদেবী হিসেবেই পূজো করা হ'ত। এঁরা আদিতে চন্দ্রদেবী ছিলেন। পরে উর্বরা শক্তির দেবী ও পৃথ্বীমাতা হিসেবে দেখা দেন। মহিলাদের শিল্পের এঁরা পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন। এই ভাবে উইক্সটোসিয়াটল ছিলেন লবণাক্ত জলের দেবী এবং সেনটিওটল ভুট্টা বা বাজরার দেবতা। হয় এঁদের মহিলা নয়তো পুরুষ দেবতা হিসেবে দেখানো হ'ত। তবে এঁরা সবাই উর্বরা শক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৯। টেমম : ইনি উত্তর-পশ্চিম সাইবেরিয়ার অস্টিয়াকদের এক দেবী। টেমম শব্দের অর্থ মা। সুদূর দক্ষিণের পাহাড়ী এলাকায় তাঁর বাস বলে বিশ্বাস। দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনই দয়াবতীও। প্রতি বসন্তে তিনি উপকূলবর্তী পাহাড়ের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। এবং নদীর উপর হাত বেড়ে দেন। তাঁর আস্তিন থেকে পালক ঝরে পড়ে। এগুলোই নানা রকম পাখি হয়ে যায়। এরা উত্তর দিকে উড়ে চলে। আসলে দক্ষিণের উষ্ণ ঋতু ও উর্বরা শক্তির তিনি ব্যক্তিরূপ।

১০। টোন কমি হুয়াটল : ইনি প্রাচীন মেক্সিকান ও দক্ষিণ আমেরিকানদের এক দেবী। সৃষ্টির উৎসে ত্রয়োদশ স্বর্গে যিনি দেবতা টোন সটে কুটলির সহধর্মিণী ছিলেন।

১১। টোনানজিন : ইনি প্রাচীন আমেরিকার অ্যাজটেকদের এক দেবী। সর্পিণী রূপেও এঁকে দেখা হ'ত। টোনানজিন শব্দের অর্থ 'আমাদের মাতা'। মেক্সিকোতে ইনি পৃথ্বীমাতারূপে পরিচিতা ছিলেন। মধ্য আমেরিকার প্রাচীন দেবদেবীর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা রক্তপিপাসিনী। নরমাংস তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তাঁকে নরবলি দিয়ে উজ্জীবিতা রাখার চেষ্টা করা হ'ত এই কারণে যে, 'জীবন-বৃক্ষের' তিনিই ছিলেন উৎস। জগৎ প্রাণশক্তি আহরণ করছে তাঁর থেকেই। সেই জন্য তাঁকে প্রসন্ন রাখা ও উজ্জীবিতা রাখা প্রয়োজন ছিল।

১২। টোয়ো-উকে-বিমে : জাপানীরাও ঋগ্বেদিক আর্যদের মত প্রকৃতির

শক্তির পূজো করত। তেমনই এক দেবী ছিলেন খাদ্যদেবী টোয়ো-উকে-বিমে। তিনি যে শুধু দানাশস্যের দেবী ছিলেন তাই নয়, মৎস্য, পশু ইত্যাদি শিকারেরও দেবী ছিলেন। তা ছাড়া পরিধানের বস্ত্র, বাস করার গৃহ এ-সবও তাঁর করুণাতেই হত বলে বিশ্বাস ছিল। তাঁর আত্মা সমগ্র প্রকৃতির উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ-রকম বিশ্বাসে জাপানীদের কোন ঘাটতি ছিল না। আরও নানা নামেও এই দেবীর অস্তিত্ব ছিল। সে নামগুলো শুনলে তাঁদের স্বতন্ত্র দেবী বলে ভুল হবার কথা। আসলে তাঁরা একই দেবী, টোয়ো-উকে-বিমে।

১৩। **ট্রিফিস :** ইনি প্রাচীন মিশরের এক রাজকুমারী, দেবীস্তরে উন্নীতা হয়েছিলেন। তাঁর এই-রাজকুমারী রূপ ছিল দেবী হ্যাথরেরই এক রূপ। তিনি ছিলেন প্রেমের দেবী। মানুষের ভাগ্যের সঙ্গেও তাঁর একটা যোগাযোগ ছিল, যেমন সাতটি হ্যাথর কোন শিশুর জন্ম কালে তার শিয়রে বসে ভাগ্য গণনা করে দিতেন।

১৪। **ট্রিভি বা ট্রিভিয়া :** ইনি প্রাচীন রোমান দেবী। সম্ভবতঃ বাইরে থেকে রোমান জগতে এসে স্থান করে নিয়েছিলেন। গ্রীসের ভয়ঙ্করী দেবী হেকেৎ-এর মত ছিলেন অনেকটা। গ্রীকরা এই ভয়ঙ্করী দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য নিশীথ রাতে তাঁর আরাধনা করতেন। এই জন্য অনেকে তাঁকে ভারতের দেবী কালীর সঙ্গে তুলনা করেন। কালীর যেমন শিবা ভোগ আছে এই দেবীরও তেমনই বোধহয় কুকুর ছিল। দেবীর নামে গড়ে ওঠা আশ্রয়স্থলে কুকুরদের থাকতে দেওয়া হত। তিনরাস্তা বা চাররাস্তার মোড়ে এই দেবীর পূজো হত। আমাদের দেশে এখনও তিনরাস্তা বা চাররাস্তার মোড়ে ক্ষতিকর শক্তির ঘট বসিয়ে তান্ত্রিকেরা তুকতাক ক্রিয়া করে।

১৫। **টুইমা :** ইনি হলেন ত্রিপুরার আদি অধিবাসীদের এক প্রকৃতি-শক্তির দেবী। ত্রিপুরাবাসীরা প্রকৃতির শক্তিকে পূজা করতে ভালবাসে। টুইমা হলেন নদী দেবী। এখন তাঁকে দেবী গঙ্গার সঙ্গে এক করে দেখার প্রচেষ্টা চলেছে। অগ্রহায়ণ মাসে এই দেবীর পূজা হয়। পূজার সময় স্নানের ঘাট থেকে দেবীর বেদী পর্যন্ত একটি সূতা টেনে দেওয়া হয়। এই সুতো কেউ অতিক্রম করেনা। পশ্চিম ভারতের অনেক গুহা-মন্দিরে তাঁর মূর্তি খোদাই করা দেখা যায়।

১৬। **টুটিলিনম :** ইনি প্রাচীন রোমানদের এক উর্বরা শক্তির দেবী। শস্য দেবতা কনসাস-এর সঙ্গে এঁর পূজা করা হ'ত।

## ঠ

১। **ঠাকুরাণী মাঈ :** বিহারের সিংভূম ও দক্ষিণ লোহার গড়ের ভূইয়ারা এক সময় ঠাকুরাণী মাঈ নামে এক দেবীর পূজা করতেন। ওড়িশার কেওঞ্জর অঞ্চলের

আদিবাসীরাও এই দেবীর পূজা করত। এই দেবীর কাছে এক সময় নরবলি দেওয়া হ'ত। এখন এই দেবী 'দুর্গা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধা। আজও আদিবাসী ভুইয়া পুরোহিতেরা ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বলি দিয়ে এই দেবীর পূজো করে। বলিপ্রদত্ত পশুর মাংস দেবীর ভক্তেরা গ্রহণ করে। উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার ভুইয়ারাও এর পূজো দেয়। এখন এই ঠাকুরাণী মাঈ তাদের কাছে 'কালী' হিসেবে পরিচিতা। এই ঠাকুরাণী মাঈ মূলতঃ গ্রামদেবতা। এই দেবীকেই বীর হেবরা বলে মহমায়া। গ্রামের প্রান্তভাগের থানে কাঁচা বাঁশের খুঁটি ও কাঁচা উলুখড়ের ছাউনী দিয়ে পূজোর সময় দেবীর জন্য বেদীর উপর সাময়িক মণ্ডপ তৈরি করা হয়। বঙ্গদেশে সর্বত্রই এই ধরনের ব্যবস্থা আজও আছে। ছত্রিশগড় অঞ্চলে পৃথিবীকে কখনও দেবতা জ্ঞানে, যেমন ঠাকুর দেও, কখনও বা দেবীজ্ঞানে যেমন ঠাকুরাণী মাঈ নামে পূজো দেওয়া হয়। কালাহাণ্ডিতে (ওড়িশা) এই দেবীর উদ্দেশে ভেড়া বলি দেওয়া হয়। এক চিলতে মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে গ্রামের লোকজনদের ভাগ করে দেওয়া হয়। তারা তাদের চাষের মাঠে এই মাংস পুঁতে দেয়। আগে নরবলি দিয়ে মানুষের মাংস মাটিতে পুঁতে দেওয়া হ'ত। বিশ্বাস ছিল এতে ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়ে। এই ঠাকুরাণী মাঈ আসলে উর্বরাশক্তির দেবী অর্থাৎ পৃথ্বী মাতা। পরে সভ্য হিন্দুদের শাক্ত দেবীদের সঙ্গে যেমন 'দুর্গা, 'কালী' ইত্যাদি, যুক্ত হয়ে গেছেন। উন্নত হিন্দু শাক্ত দেবীরাও কোন না কোন ভাবে এই ঠাকুরাণী মাঈ বা পৃথ্বীমাতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। 'দুর্গা' পূজা (নবপত্রিকা) ও 'কালী' পূজার বহু রীতিনীতির মধ্যে পৃথ্বীমাতা রূপে উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে তাঁদের দেখা যায়।

২। ঠাকুরাণী : সর্বপ্রাপবাদ ওড়িশাতে একটি সার্বিক ব্যবস্থা বলা যায়। প্রত্যেকটি গ্রামের গ্রামরক্ষিণী দেবতা আছেন। এঁদের গ্রামদেবী অথবা ঠাকুরাণী বলা হয়। প্রত্যেকটি গ্রামের এই ধরনের নিজস্ব দেবী বা ঠাকুরাণী আছেন। এই দেবীদের পূজার জন্য দেবোত্তর জমি আছে। এ-জন্য কোন রাজস্বও দিতে হয় না।

## ড

১। ডম-গল-নুন-ন : প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের মিষ্টি জলের দেবতার নাম ছিল ইয়া। কখনও কখনও ইয়াকে অবশ্য পৃথিবীর দেবতা হিসেবেও কল্পনা করা হ'ত। কখনও কখনও মনে করা হত গভীর জলের দেবতা হিসেবে। তাঁর পত্নীর নাম ছিল ডমকিন। কখনও কখনও তাঁকে ডম-গল-নুন-ন নামেও ডাকা হোত। কিন্তু প্রাচীন সুমেরিয়রা তাঁকে ডাকতেন 'নিন-কি' বা পৃথিবীর রাণী নামে। তাঁকে গভীর সমুদ্রের রাণীও বলা হ'ত।

সুমেরিয়রা ইয়াকে নিন-অ-গল অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তিধর দেবতা নামেও ডাকত। ইয়ার প্রতীক ছিল বড় মাছ বা মকর। ভারতীয় গঙ্গাদেবীও মকর-বাহিনী। সুতরাং জলের শক্তিকে দেবতা (বরুণ) বা দেবী (গঙ্গা) হিসেবে কল্পনা করার প্রবণতা প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যেও ছিল। সেই হিসেবে ডম-গল-নুন্-ন অনেকটা আমাদের গঙ্গাদেবীর মত। ভারতীয় পুরাণে যেমন সমুদ্র-দেবতা বরুণের সস্ত্রীক কল্পনা আছে— ইয়ার সঙ্গে ডম-গল-নুন্-ন-এর চিন্তাও অনুরূপ। স্বতন্ত্র দেবী হিসেবে তিনি কতটা মর্যাদা পেতেন কে জানে! তবে ইয়াকে শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে তাঁর যে একটা বড় ভূমিকা ছিল যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, একটি সীলমোহরে দেখা যায় জনৈক পূজারীকে ডম-গল-নুন্-ন বা ডমকিন ইয়ার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। ইয়ার আসনের নিচে রয়েছে বড় একটি মাছ বা মকর। ইয়ারকে অনেক সময় মৎস্য আকারেও দেখা যায়। ব্যাবিলনের বিখ্যাত দেবতা মারডুককে ইয়ার সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়।

২। **ডমোন :** ইনি প্রাচীন কেল্ট-জাতির এক আঞ্চলিক দেবী। অন্য কোন দেবতার সঙ্গে এঁর সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কোন দেবতার স্ত্রী হিসেবে তিনি দেখা দেন নি। প্রাচীন কালে কেল্টদের মধ্যে মাতৃদেবীরা পুরুষের আগে এসেছিলেন। পরে পুরুষ দেবতা এলেও এঁদের বিতাড়িত করতে পারেননি।

৩। **ডেমেটার :** প্রাচীন গ্রীকদের শস্যদেবী ছিলেন ডেমেটার। অরণ্যের ফলমূল এসব তিনিই রক্ষা করতেন। রোমানরা তাঁকে বলতেন সিরিস (Ceres)। প্রকৃতির ঋতুতে ঋতুতে রূপ পরিবর্তন প্রাচীন গ্রীকদের ভারতীয়দের মতই আকৃষ্ট করেছিল। প্রকৃতির এই রূপ পরিবর্তনের জন্য দেবী ডেমেটার দায়ী ছিলেন বলে তাঁরা মনে করতেন। তিনি দেবরাজ জিউস-এর ভগ্নী ছিলেন। দেবরাজের ভগ্নী হিসেবে গ্রীসের দেবদেবীদের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ দেবী ছিলেন তিনি।

গল্প আছে :— আগে প্রকৃতিতে শীত বলে কিছু ছিল না, ছিল ফুল ফল সজ্জিত চির বসন্ত। কিন্তু একদিন ডেমেটারের কন্যা পারসেফোন বান্ধবীদের নিয়ে যখন একটি অধিত্যকাতে ফুল তুলছিলেন সেই সময় পৃথিবীর বুক চিরে বেরিয়ে আসেন মৃত্যুদেবতা প্লুটো। তিনি তাকে নিজের রাণী করার জন্য পাতাল পুরীতে নিয়ে যান। ডেমেটার এত আঘাত পান যে, সান্ত্বনা দিয়ে তাঁক শান্ত করা যায় না। দেবী ডেমেটার হাতে একটি মশাল নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে মেয়েকে খুঁজতে থাকেন। পৃথিবীকে তিনি শস্য উৎপাদন করতে বাধা দেন। যতদিন পর্যন্ত না তাঁর কন্যাকে ফিরে পাবেন ততদিন পৃথিবীতে শস্য জন্মাতে দেবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। সারা বছর পৃথিবীতে এক দানা শস্য উৎপন্ন হয় না। মানুষ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশেষে জিউস প্লুটোকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পার্সেফোনকে ফেরৎ পাঠাতে রাজি করান। শর্ত হয় এই যে, যতক্ষণ পার্সেফোন ফেরৎ না যাবে

তৎক্ষণ এক দানা খাবারও মুখে তুলতে পারবেন না। কিন্তু ভুলক্রমে তিনি একটি ডালিম দানা খেয়ে ফেলেন। ফলে চিরকালের জন্য পাতালের বাইরে থাকার সুযোগ হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় পার্সেফোন নয় মাস তাঁর মায়ের সঙ্গে ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে থাকতে পারবে এবং শীতের তিন মাস পাতালে মৃত্যুর রাজ্যে প্লুটোর সঙ্গে থাকতে বাধ্য হবে।

পার্সেফোনের তিন মাস পাতালে থাকার অর্থ হল শস্যদানার তিন মাস মাটির নিচে থাকা। যখন মায়ের কাছে ফেরেন তখন পৃথিবীতে শস্য সমারোহ দেখা দেয়। সেই জন্য দেখা যায় ডেমেটারের সঙ্গে যেসব উৎসব জড়িত আছে তা দ্বারা যেমন বোঝায় পৃথিবীতে শস্য সমারোহ তেমনই বোঝায় জীবন, মৃত্যু ও কবরের বাইরের জীবন— অর্থাৎ Life beyond Death। ডেমেটারের রোমান নাম সিরিস থেকে সীরিয়াল অর্থাৎ খাদ্যশস্য শব্দটি এসেছে।

৪। ডায়ানা : ডায়ানা হলেন ইটালীর এক দেবী। কি ভাবে যে তাঁর উৎপত্তি হয়েছে তা জানা যায় না। রোমানরা যখন তাঁর পূজা শুরু করেন তখন সেই পূজার শুরু করেছিলেন সারভিয়াস তুল্লিয়াস। ডায়ানা হলেন আলোর দেবী। ডায়ানা শব্দের উৎপত্তি dies শব্দ অর্থাৎ day বা দিন থেকে। ডায়ানাস নামে তিনি ছিলেন চন্দ্র তুল্য। আবার দিন হিসেবে সূর্য তুল্য। পরবর্তী কালে ডায়ানা গ্রীক দেবী আর্টেমিসের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। আর্টেমিস ছিলেন শিকারের দেবী। ফলে তিনি শিকারিণী হিসেবে প্রতিভাত হন। তিনি দেবরাজ জিউস বা জুপিটারের কন্যা ও সূর্যদেব অ্যাপোলোর যমজ ভগ্নী। প্রাচীন গ্রীসে তিনি ছিলেন তরুণ ও তরুণীদের রক্ষাকর্ত্রী। সব ধরনের পশুই তাঁর প্রিয় হলেও তিনি হরিণকে একটু বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। প্রায়শই তাঁকে তীর ধনুকে সজ্জিতা দেখা যায়। মরণশীল জীবের নানা যন্ত্রণার তিনি উপশম করতেন। তিনি আজীবন কুমারী। প্রেম-প্রণয়ের কাছে কখনও নতি স্বীকার করেন নি।

আরও তিনটি দেবী আছেন যাঁদের সঙ্গে ডায়ানা ও আর্টেমিসকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আর্কেডিয়ান আর্টেমিস যাঁর রথ টানত স্বর্ণশৃঙ্গমণ্ডিত হরিণ। আর একজনের নাম ছিল টরিয়ান আর্টেমিস। টরিয়ান আর্টেমিস-এর পুজো হত এথেন্স ও স্পার্টাতে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রুক্ষ দেবী। যে-সব স্পার্টানকে শাস্তি দেওয়া হ'ত তাদের এই দেবীর বেদীর কাছে এনে চাবুক কষা হত। এদের শরীর থেকে তাঁর বেদীতে রক্ত পড়লে দেবী খুব খুশি হতেন। তবে এফেসিয়াতে যে আর্টেমিস ছিলেন তাঁর সঙ্গে ডায়ানার কোন সম্পর্ক ছিল না। মূলতঃ তিনি ছিলেন এশিয়ার কোন দেবী। তিনি ছিলেন প্রাণদায়িনী। নানাভাবে তিনি মানুষের সহায়িকা ছিলেন। প্রাচীনকালে তাঁর এফেসাসের মন্দির ছিল পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য।

৫। ডনু : ডনু হলেন প্রাচীন কেল্টদের এক দেবী। ডনু শব্দের অর্থ দেবমাতা। যদিও বংশপরিচয়ে তাঁকে ডগ্‌দ ও ডেলবিস্‌-এর কন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তথাপি মূলত তিনি ভারতীয় অদিতির মতন দেবমাতা। তাঁরই এক নাম বোধহয় ছিল অনু। 'অন্‌' শব্দ থেকে অনু শব্দ এসেছে। 'অন' শব্দের অর্থ প্রচুর, প্রতিপালন করা। তাকে সমৃদ্ধিদায়িনী দেবী রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। ডনু ও অনু একই অর্থবোধক। ডনু হলেন উর্বরাশক্তির দেবী অর্থাৎ পৃথ্বীমাতা। তাঁর থেকেই অন্যান্য দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে বিশ্বাস। পৃথ্বীমাতা হিসেবে ডেমেটারের মত তিনিও কোনও না কোনভাবে রসাতলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরকম ভাবার কারণ, শস্য মাটির নিচ থেকে গজায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শস্য হল রসাতলেরই দাস। এই রসাতল থেকে মানুষেরও জন্ম হয়েছিল বলে বিশ্বাস। উর্বরাশক্তি রূপে পৃথিবী পূজাতে যেহেতু বাড়াবাড়ি করা হ'ত সেই হিসেবে এই দেবীর পূজোতেও নরবলি দেওয়া হ'ত বলে মনে হয়। এর কিছুটা অনুমান করা যায় অদ্যাবধি ইংল্যান্ডের লিসেষ্টারশায়ারে Black Annis' সম্পর্কিত লোক বিশ্বাস থেকে। Black Annis পাহাড়ের গুহায় বাস করে ও মানুষের রক্তমাংস খেতে ভালবাসে বলে বিশ্বাস। Black Annis কিছুটা ফিগালিয়ার Black Ceres-এর মত।

তবে Annis-এর সঙ্গে অনুর মিল টানার ব্যাপারটা কতদূর সত্য ভগবান জানেন। বরং প্রাচুর্যের দেবী হিসেবে পাতালের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত ডনু অনেকটাই প্লুটাসের সঙ্গে যুক্ত। প্লুটাসকে ভুল করে ঐশ্বর্যের দেবতা প্লুটোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রাচীন কেল্টরা বিশ্বাস করত যে, মানুষের সভ্যতা ও উন্নতি সবটাই পাতালের অবদান।

আসলে ডনু ছিলেন উর্বরা শক্তিরই দেবী। ডনুকে ব্রিগিট (Brigit)-এর সঙ্গেও এক করে দেখা হয়। এই ব্রিগিট ছিলেন দেবতা দগ্‌দ-এর কন্যা এবং ব্রায়ান ফুচেইর ও ইউচরবর-এর মা। ব্রিগিটকে জ্ঞানের দেবীও বলা হ'ত। তিনি কাব্যেরও দেবী ছিলেন। তাঁর আর দু'জন বোন ছিলেন। তাঁদের নাম একই। একজন ছিলেন ঔষধের দেবী। অপর জন কর্মকার বা স্বর্ণকারের কর্মের দেবী। জ্ঞানের দেবী হিসেবে ডনু ছিলেন গ্রীকো-রোমান দেবী মিনার্ভার তুল্য। তিনি অগ্নিদেবীও ছিলেন। কখনও কখনও শুধু মহিলারাই তাঁর পূজা করতেন। আদিকালে কেল্টরা সেমাইটদের মত মহিলাত্মিকা শক্তিরই আরাধনা করতেন—পুরুষাত্মক শক্তির নয়।

৬। ডিওন : ডিওন হলেন প্রাচীন গ্রীসের দেবরাজ জিউস-এর পত্নী। দেবরাজ জিউস স্বর্গের রাজা হলেও কখনও কখনও যেমন পাতালের রাজা হিসেবেও স্বীকৃতি পেতেন তেমনই ডিওনও আকাশের দেবী হয়েও কখনও

কখনও পৃথিবী দেবী বা সমুদ্র দেবী হিসেবেও স্বীকৃতি পেতেন। ডোডোনা নামক স্থানে ডিওন-এর একটি মূর্তি ছিল। ডোডোনাতে একটি প্রত্যাদেশ হয় যে, এথেনীয়রা সেখানে পূজো দিতে এলে ব্রোঞ্জ বা রূপোর পাতে কি কি সমগ্রী পুজোর জন্য পাঠানো হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করে দিতে হবে।

৭। **ডিভোনা** : ডিভোনা হলেন প্রাচীন কেল্টদের পৃথ্বীমাতা। এঁর প্রতীক ছিল ফল, ফুল ও একটি শিশু। আদিকালে পৃথ্বী মাতাকে এইভাবেই দেখা হ'ত। পরবর্তীকালে তাঁকে স্থানচ্যুতা করে সেখানে দেবতা হিসেবে এসেছিলেন ডিসপাটের ও দগদ। এই পৃথিবী মাতা এবং অন্যান্য নামের পৃথ্বী মাতারা তখন এই দেবতাদের পত্নী হিসেবে দেখা দেন। কেল্টদের পৃথ্বী দেবতা ডিসপ্যাটের-এর পত্নী হিসেবে পরবর্তীকালে ডিভোনাকে কল্পনা করা হয়েছিল।

৮। **ডিজেন** : আফগানিস্তান ও চিত্রল, বদক্শান ও কুনর উপত্যকার মধ্যে কাফিরিস্তানের অধিষ্ঠান। কাফিরিদের ধর্ম হল এক ধরনের বিকৃত পৌত্তলিকতা। এরা পূর্বপুরুষদের পূজা করতে অভ্যস্ত। অগ্নির উপাসনাও করে থাকে। নানা' দেবদেবী রয়েছেন। একই দেবদেবীকে বিভিন্ন কাফ্রিশাখা বিভিন্ন নামে উচ্চারণ করে।

কাফ্রি ধর্মে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত— উর্দেশ বা দ্যুলোক, মিক্দেশ বা পৃথিবী ও য়ুর্দেশ বা পাতাল। তবে পাতালের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্য দুই-ই আছে। পাতালে গিয়ে পড়লে কেউ আর সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না।

পশুবলি দিয়ে ও গান গেয়ে এরা দেবদেবীর পূজা করে থাকে। এদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন দেবতা ইম্র। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন। দেবী ডিজেন-এর সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর দক্ষিণবক্ষ থেকে। দেবীদের মধ্যে এই ডিজেনই ছিলেন কাফ্রিদের কাছে প্রিয়তমা। যাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্মায় তারা বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ধুমধাম করে এই দেবীর পূজা দেয়। দেবীর কাছে ছাগল বলি দেওয়া হয়। এই দেবী শস্য, বিশেষ করে গম জাতীয় শস্য রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস।

কাফিরিস্তান আজ ইসলাম দ্বারা প্লাবিত হলেও গোপনে গোপনে আজও এখানে অনেকেই প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ীই চলে বলে মনে হয়। দেবী ডিজেন হয়তো কাফিরিদের পৃথ্বীমাতা স্বরূপা।

৯। **ডোমিনী** : ইনি প্রাচীন কেল্টদের এক আঞ্চলিক দেবী। পুরুষ দেবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এরকম আরো অনেক আঞ্চলিক দেবী কেল্টদের ছিল।

১০। **ডোমনু** : প্রাচীন কেল্টদের ইনি এক মাতৃদেবতা। এঁকে পৃথিবী মাতা বলে গণ্য করা হ'ত।

১১। **ডাকিনী-ডাইনী** : হিন্দু ষট্ চক্র কল্পনায় দেহের ছটি চক্রের ছটি অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। তান্ত্রিক যোগিরা এদের স্মরণ করে থাকেন। এই

দেবীদের নাম— ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী। এর মধ্যে ডাকিনী হলেন মূলাধার চক্রের শক্তি স্বরূপা দেবী। এই শব্দের অর্থ গতিময় জ্ঞান।

ডাকিনী, রাকিনী প্রমুখ নাম লক্ষ্য করলে মনে হয় নামগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়। কিন্তু তিব্বতী ভাষায় 'ডাক' বলে একটি শব্দ আছে যার অর্থ জ্ঞানী। সেই অর্থে ডাকিনী হল মহিলা জ্ঞানী। বঙ্গদেশে যে 'ডাক ও খনার বচন' বলে একটি কথা আছে সেই 'ডাকের বচন' কথার মূল অর্থ বোধ হয় জ্ঞানীর বচন। ডাকিনী শব্দের মূল অর্থ সম্ভবতঃ গুহ্য জ্ঞান সম্পন্না। বাংলা 'ডাইনী' শব্দের মধ্যে তার রেশ আছে। মধ্যযুগে নাথ-সাহিত্যের রাজা গোপীচাঁদের মা ময়নামতী ছিলেন মহাজ্ঞান সম্পন্না ডাইনী। সুতরাং ডাকিনী দেবী হয়তো নিগূঢ় জ্ঞান সম্পন্না কোন তিব্বতী দেবী। অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ wicca যা থেকে ইংরেজী witch শব্দ এসেছে তার সঙ্গেও ডাকিনী শব্দের মিল আছে। wicca শব্দের অর্থ জ্ঞান। সেই অর্থে witch শব্দ দ্বারা বোঝায় জ্ঞানী মহিলা। ডাইনী ও witch শব্দটি শুনতে খারাপ শোনালেও অর্থের দিক থেকে তেমন খারাপ নয়। তবে এর ভাল ও মন্দ দু'টো দিক আছে। ডাইনী ও witch উভয়েই তুকতাক জাতীয় কাজ ক'রে এত ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে যে, লোকে শব্দ দুটো শুনলেই আঁৎকে ওঠে।

১২। ডোম্বী ঃ বৌদ্ধ দোহা ও গীতির মধ্যে আমরা এক দেবীর উল্লেখ দেখতে পাই— তাঁর নাম ডোম্বী। তাঁকে নৈরাত্মা, নৈরামণি, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী আরও নানা নামে ডাকা হয়।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় শক্তিমান ও শক্তিরূপে রয়েছেন ভগবান ও ভগবতী। সাধকের ভেতরেই তাদের অধিষ্ঠান। সাধক চিত্তই স্বয়ং ভগবান। নৈরাত্মাই গৃহিণী। বৌদ্ধ সাধক কাহ্নপাদের দোহাতে সেরকম উল্লেখেই পাওয়া যায়। নুন যেমন জলের সঙ্গে মিশে যায় সাধকচিত্ত তেমনই নৈরাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। মন ভগবান। শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞাই হলেন ভগবতী বা ডোম্বী। চর্যাগীতিকার কুক্কুরীপাদের একটি গীতিতে পাওয়া যায় এমন ভাব ঃ—

'হাঁউ নিরাসী খমনভতারী
মোহের বিগোয়া কহন ন জাই।'

অর্থাৎ দেবী বলছেন— 'আমি আশারহিতা ও আসঙ্গরাহিতা। খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী। আমাদের মিলনের কথা বলা যায় না। খ-মন শব্দের অর্থ শূন্য মন, অর্থাৎ তান্ত্রিকদের চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্যান্তরের প্রকৃতিপ্রভাস্বর মন। এই দেবীকে (ডোম্বীকে) কোথাও যোগিনী, কোথাও ঘরণী, আবার কোথাও ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। জাঁকজমক করে

ডোম্বীর বিবাহ করতে যাওয়ার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। এই ডোম্বীর ভাণ্ডরিয়ালী অর্থাৎ চতুরালী দেখে বজ্রধর সাধক তাঁকে কামচণ্ডালী বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে এসবই হল প্রতীকী ভাবায় মরমিয়া অভিজ্ঞতার কথা। এই ডোম্বী আসলে হিন্দু যোগের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। বৌদ্ধতন্ত্রে মণিচক্রে এই কুলকুণ্ডলিনী চণ্ডালী হিসেবে পরিচিতা। এই চণ্ডালী শক্তি উর্ধ্বগতি হলে ডোম্বী নামে পরিচিতা হন। তিনি যখন মহসুখ কমলে থাকেন তখন হন সহজসুন্দরী। চৌষট্টি দল পদ্মে ডোম্বী নৃত্য করেন বলেও উল্লেখ আছে।

ঢ

১। ঢাকেশ্বরী : মহামাতৃকা ভারতবর্ষে নানাস্থানে নানা নামে অধিষ্ঠান করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সেই অঞ্চলের অধীশ্বরী হিসেবে তাঁদের পরিচয় হয়। ঢ-কে আদি অক্ষর করে এমনই মাতৃদেবতার পরিচয় খুব কমই আছে। তবে পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরে এই দেবীকে ঢাকেশ্বরী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে— যেমন চট্টগ্রামে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে চট্টলেশ্বরী ও ওড়িশার কটকে কটকেশ্বরী নামে। বীরভূমের নলহাটিতেও এই ধরনের আঞ্চলিক দেবী ছিলেন, যেমন, নলহাটেশ্বরী। এখন তিনি নাম পাল্টে ললাটেশ্বরী হয়েছেন এবং মহাতীর্থ একান্নপীঠের এক দেবী হিসেবে অবস্থান করছেন। অনুরূপ দাবি চট্টলেশ্বরী ও কটকেশ্বরীর ক্ষেত্রেও রয়েছে।

২। ঢেলাই চণ্ডী : ভারতবর্ষে যে এক মহামাতৃকা দেবী আছেন, সেই মহামাতৃকাশক্তি নানা সময় ও নানা স্থানে নানা নামে প্রকাশ পেয়েছেন। যেমন, 'কালী, 'দুর্গা, চণ্ডী ইত্যাদি। 'দুর্গা, 'কালী, চণ্ডী সবই সেই মহামাতৃকা শক্তির ভয়ঙ্করী রূপ। মরমিয়া সাধনার গুহ্য তত্ত্ব জানা গেলে এরা সবাই নানা নামে দেখা দেন।

এই মহামাতৃকা শক্তিকে চণ্ডী নামে উল্লেখ করা হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রথম। 'চণ্ড' শব্দ দ্বারা আমরা বুঝি প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর ইত্যাদি। এ থেকেই চণ্ডাল শব্দ এসেছে। এই চণ্ড শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গ চণ্ডী। চণ্ডী অর্থ ভয়ঙ্করী শক্তি। তবে মহাভারতে 'চণ্ডী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সুন্দরী রমণী অর্থে। কালিদাসও চণ্ডী অর্থ করেছেন সুন্দরী রমণী। তন্ত্রমতে চণ্ডী অর্থ হল চণ্ড = চণ্ড + (স্ত্রীলিঙ্গ) ঈপ্ = পরব্রহ্ম মহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দ দ্বারা বোঝায় দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মণ। সুতরাং ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তূরীয়া দেবীই চণ্ডী। এই চণ্ডীর নানারূপ আছে। তিনি অষ্টভূজা, দশভূজা, দ্বাদশভূজা, অষ্টাদশ ভূজা, সহস্রভূজা, নানা রূপে প্রকাশিতা।

এই দেবী নানাভাবে পূর্ব ভারতের গ্রামে গঞ্জে বিরাজ করেন। থানে থানে তাঁর অধিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে নানা নামের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর অবস্থান হয়তো আদি নরগোষ্ঠীর বিশ্বাস জাত। ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে 'চাণ্ডি' নামে একটি শব্দ আছে। মুণ্ডারি ভাষায় চাণ্ডি অর্থ শিলাখণ্ড। আদি নরগোষ্ঠী বহুদিন এই শিলাখণ্ডে প্রকৃতির শক্তির পূজা করেছে। একে বলে সর্বপ্রাণবাদ বা জড়বস্তুতে প্রাণ আরোপ করে পূজো করা। ছোটনাগপুরের ওরাঁওদের মধ্যে চাণ্ডী নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্ত্রী দেবতা। গোলাকৃতি একখণ্ড পাথরে তাঁর পূজা হয়। এই পাথরকে বলে চাণ্ডী শিলা। বিশ্বাস, এই পাথর কাছে থাকলে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়, সহজে শিকার পাওয়া যায়। ওঁরাও পল্লীতে সাধারণতঃ পাহাড়ের কোন ঢালু জায়গায় এক বা একাধিক চাণ্ডী টাঁড় থাকে। সেখানে একখণ্ড পাথরের বুকে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান।

এই চাণ্ডীই কখনও পাথরে, কখনও সিঁদুর অঙ্কিত হয়ে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে এক সময় শোভা পেত। মঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর উদ্ভব এমনতর চণ্ডীর উপর বিশ্বাস থেকেই। তন্ত্র সাহিত্যের মহৎ ভাবনা থেকে তাঁদের উদ্ভব নয়। এই ধরনের বহু চণ্ডীর উল্লেখ আমরা পাই, যেমন— মঙ্গল সাহিত্য বর্ণিত চণ্ডী, আমতার মেলাই চণ্ডী, বুঞরে চণ্ডী, বেলায় চণ্ডী, পলাশিতে পলাশ চণ্ডী, ভাণ্ডারগড়ে ভাণ্ডার চণ্ডী, মগড়ায় চণ্ডিকা, বেড়ায় বেড়াই চণ্ডী, নিমপুরের বনে নাচন চণ্ডী, খেপাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, খাড়া চণ্ডী, বসন চণ্ডী ইত্যাদি। ভীমা শব্দ দ্বারাও এই চণ্ডীই বোঝায়, যেমন তমলুকের বর্গভীমা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চণ্ডীর গুণকীর্তন করা হয়েছে এসব চণ্ডী সেই মহামাতৃকা চণ্ডী থেকে পৃথক। এ-সব নিতান্তই কোন spirit মাত্র। ঢেলাই চণ্ডীও তেমনই এক চণ্ডী। এর বাহিরে 'চ' বর্ণকে আদি বর্ণ করে তেমন কোন মাতৃশক্তির নাম ইতিহাসে বড় একটা নেই।

### ণ

ণ-বর্ণকে আদি বর্ণ করে বা প্রথম বর্ণ করে কোন মাতৃদেবীর নাম পাওয়া যায় না। তবে এই বর্ণ স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী। এই বর্ণ পীত বিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় ও ত্রিগুণযুক্তা। ণ-বর্ণ আত্মাদি তত্ত্ব সংযুক্ত ও মহা মোক্ষপ্রদায়ক।

### ত

১। তবিতি ঃ ইনি সাইথিয়ানদের এক দেবী। সবশ্রেষ্ঠ দেবতা-পপিয়াস (গ্রীক জিউস তুল্য)-এর পরেই ছিল তাঁর সম্মান। এই দেবী অনেকটাই গ্রীকদেবী

হেস্টিয়ার মত। তিনি মূলতঃ গৃহাগ্নি দেবী। প্রাচীনকালে অনেকেই অনির্বাণ অগ্নিশিখা ঘরে রাখত, বিশেষ করে শীতার্ত দেশে। এই পূত অগ্নি উনানেও জ্বলত। সেই ধরনের অগ্নিপূজা বিধি আমাদের দেশেও আছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে রান্নাপূজা। নিম্নবর্গের লোকেদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় 'আগ্না পূজা' নামে এ পূজা জাঁকজমক সহকারে করা হয়। আসলে এই অগ্নিই ছিল সাইথিয়ানদের পরিবারের কেন্দ্র। এই অগ্নিতে মদ্য আহুতি দেওয়া হ'ত।

২। তপতী : ইনি প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর এক দেবী। ব্রহ্মা পত্নী সাবিত্রীর তিনি কনিষ্ঠা ভগ্নি।

৩। তাতে নালিওয়মি : ইনি উত্তর পশ্চিম মেক্সিকোর প্রাচীন হুইচোলদের এক দেবী। তাঁকে লাল সর্প হিসেবেও কল্পনা করা হত। কখনও কখনও লাল মেঘ হিসেবেও ভাবা হত। আসলে তিনি জলের ও বৃষ্টির সর্প স্বরূপা— যিনি পূর্বদেশ থেকে বৃষ্টি নিয়ে আসেন। তিনি সব রকমের ফুল ও কুয়াশা তৈরি করেন। শিশুদেরও তিনি রক্ষয়িত্রী। তাঁরই পরিপূরক দেবতা 'তাতে' কোবিমোক অর্থাৎ শুভ্রসর্প। পশ্চিম দিগন্ত থেকে তিনি বৃষ্টি নিয়ে আসেন। এইভাবে আরও কিছু সর্প আরও নানা প্রান্ত থেকে বৃষ্টি নিয়ে আসে।

৪। তকোৎসি নাকবে : ইনি হলেন প্রাচীন উত্তর পশ্চিম মেক্সিকোর হুইচোলদের পিতামহী মাতা। পিতামহ অগ্নির তিনিই জন্মদান করেছিলেন। সমস্ত দেবোকুলেরই তিনি মাতা। সকল ধরণীই তাঁর সম্পত্তি। তিনি পাতালেও বাস করেন। যেহেতু অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধা সেই জন্য হুইচোলরা তাঁর কাছে দীর্ঘ জীবন কামনা করতেন।

৫। তাতে তুলিরিকিত্ : ইনি মেক্সিকান হুইচোলদের মাতৃদেবী। এই মাতৃগৃহে ক্ষুদ্রকায় প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বাস করে। তাঁর আশীর্বাদেই মহিলাদের গর্ভ সঞ্চার হয় এবং মায়েরা নিরাপদে শিশুর জন্মদান করতে পারেন।

৬। তাতে ইকু ওটেগনক : ইনি প্রাচীন মেক্সিকান হুইচোলদের শস্যদেবী। বিশেষ করে তিনি ভুট্টা ও বাজরার দেবী। তাছাড়া অন্যান্য শাক সব্জিরও তিনি অধিশ্বরী।

৭। তাতে বেলিক উইমলি : ইনি প্রাচীন উত্তর পশ্চিম মেক্সিকোর হুইচোলদের স্বর্গের দেবী। তাঁকে বলা হ'ত 'মাতা কুমারী ঈগল।' তিনি সূর্যেরও জননী। তাঁর শিকারী নখ দিয়ে তিনি ধরণীকে ধারণ করে আছেন বলে বিশ্বাস। ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে নজর রেখে সবকিছু রক্ষা করেন। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী তাঁর পোশাক হিসেবে কাজ করে।

৮। তলেজু, তল্লিজু : নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু বা কাঠমাণ্ডু-এর নাম

কাঠমাণ্ডু বা কাটমাণ্ডু হয়েছে এই কারণে যে, অসংখ্য কাঠ নির্মিত মন্দিরে এই শহরটি শোভিত। এখানকার একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির হল তলেজু বা তল্লিজুর মন্দির। তুলসী ভবানীর নামই তলেজু বা তল্লিজু। ঋষি গোরখনাথের সঙ্গে এই দেবী হলেন রাজবংশের রক্ষয়িত্রী।

৯। **তুলজা-ভবানী :** হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে গল্প আছে যে, দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নীর নাম ছিল মাহামায়া। একবার দেবাদিদেব মহামায়াকে অপমান করলে দেবী ক্রুদ্ধা হয়ে নিজেকে টুকরো টুকরো করে কাটেন। তাঁর এই খণ্ডিত দেহাংশগুলি দেশের চারটি স্থানে পতিত হয়ে চারটি শক্তপীঠ বা তীর্থস্থান গড়ে তোলে। দক্ষিণ ভারতে বিজাপুরের কাছে তাঁর যে দেহাংশগুলি পড়ে তা থেকে নতুন এক দেবীর নামে এই স্থানটি পবিত্র শাক্ততীর্থ হয়ে গড়ে উঠে। দেবীর নাম হয় তুলজা ভবানী।

অন্য যেসব জায়গায় এই দেহাংশগুলি প'ড়ে তা থেকে কাশ্মীরে গড়ে উঠে শারদা দেবীকে নিয়ে শারদা তীর্থ, কামরূপে গড়ে উঠে কামাখ্যা দেবীকে নিয়ে কামাখ্যাপীঠ ও পাঞ্জাবের জালন্ধরে জালন্ধরী দেবীকে নিয়ে জালন্ধর পীঠ। কেউ কেউ এই দেবীকে জ্বালামুখী দেবী নামেও উল্লেখ করেছেন।

১০। **তনিৎ :** প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ক্রীটমুখী যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাতে সর্বত্র এমন এক দেবীকে দেখা যায় যাঁর সঙ্গে রয়েছে তাঁর উপর নির্ভরশীল এক তরুণ দেবতা— যেমন মিশরে দেবী আইসিসের সঙ্গে হোরাস, এশিয়া মাইনরে দেবী কাইবেলি, সাইবেলি বা সিবিলির সঙ্গে এট্টিস প্রমুখ। আফ্রিকার পিউনিকে তেমনই এক দেবী ছিলেন তাঁর নাম তনিৎ। তাঁর সঙ্গে দেখানো হত তাঁর পুত্রকে।

ফিনিসিয় পোড়ামাটির ফলকে দেখা যায় তরুণ দেবতা বল একটি আসনে বসে আছেন। তাঁর মাথার দু'দিক থেকে উঠেছে ভেড়ার শিং। তাঁর হাত দুটি মেষ মস্তকের উপর স্থাপিত, যে মেষ মস্তক দুটি তার রাজাসনের হাতলের কাজ করছে। পাশেই আর একটি মূর্তিতে দেখা যায় এক দেবীকে। তাঁরই নাম তনিৎ। এতে মনে হয় তনিৎকে দেবতা বলের পত্নী হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। এই দেবী তনিৎ আর কেউ নন— ইনিই সেমাইটদের দেবী অস্তর্ট্।

উত্তর আফ্রিকার সেমাইটদের কাছে এই দেবী খুব জনপ্রিয়া ছিলেন। এঁরা এই দেবীকে 'স্বর্গীয় কুমারী' আখ্যা দিয়েছিল। তবে এই দেবীকে কেন্দ্র করে যে উৎসব হত তাতে নানা ধরনের অশ্লীল ঘটনা ঘটত। যেমন উচ্চারিত হত অশ্লীল বাক্য তেমনই হ'ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী। ভারতীয় পঞ্চ 'ম'-কারের অশ্লীলতার সঙ্গে এটা অনেকটাই তুলনীয়।

অনেকে এই দেবীকে আর্টেমিসের সঙ্গে এক করে দেখতে চান। কার্থেজে

তাঁকে 'নে-বলের দেবী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নে-বল সম্ভবতঃ কোন স্থানের নাম, যেখানে দেবীর বিখ্যাত থান, বেদী বা মন্দির ছিল। হ্যারিবল-এর সন্ধিপত্রে দেবী হেরো এই দেবীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁকে বলা হ'ত 'বোন তণিং' বা তনিতের প্রত্যঙ্গ, 'অবদ্‌তণিং' বা তণিতের ভৃত্য ইত্যাদি।

১১। **(বর্) তন্ম :** ইনি তিব্বতের পৃথ্বী দেবী। তিব্বতীরা পৃথ্বীকে বলে বর্ বজন। এর অর্থ দৃঢ় মধ্যবর্তী স্থান। একে মি-য়ুল বা মানুষের ভূমিও বলা হয়। পৃথিবীর প্রধান দেবতা হলেন স্কাব্‌স বডুন। এঁকে বর্ তন্ম-এর সঙ্গে এক করে দেখা হয়। তিনি বজন রূট ডম্‌র কম্বন নামে একটি অশ্বে চেপে থাকেন। মানুষই তাঁর প্রজা। তবে তাঁর কাহিনীতে মানুষের কথা তেমন শোনা যায়না।

১২। **তইৎ :** ইনি প্রাচীন মিশরীয় এক দেবী। তয়িৎ অর্থ বস্ত্র পরিধানা। মিশরে যে বস্ত্র দিয়ে মমি জড়ানো হত সম্ভবতঃ তিনি সেই বস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। শব্দটির যথার্থ উচ্চারণ তাতেৎও হতে পারে। তয়তেৎ অর্থ বস্ত্র। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে একে বলা যেতে পারে চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া বা শামিয়ানা। যথার্থ কোন্ অর্থের দ্যোতিকা শক্তি হিসেবে যে তাঁর এই নাম হয়েছিল বলা কষ্টকর।

১৩। **তর নই অনইহ্ :** ইন্দোচীনে প্রাচীন চম্পাকে বর্তমানে বলে চম্‌স। এখানকার লোকেরা নানা দেবদেবীর পূজো করতেন। তেমনই এক দেবী হলেন তর নই অনইহ্। ইনি কুমারী এবং ক্ষতিকর শক্তির প্রতিনিধি। নানা ধরনের বলি দিয়ে একে শান্ত করার বা প্রসন্ন করা চেষ্টা করা হয়।

১৪। **তউর্‌ৎ :** তউর্‌ৎ হলেন প্রাচীন মিশরের জলহস্তী দেবী। তউর্‌ৎ শব্দের অর্থ মহতী। ইনিই প্রাচীন মিশরের একমাত্র দেবী যিনি সম্পূর্ণ পশুদেহ নিয়েই দেবতার মর্যাদা ভোগ করে গেছেন। তিনি মহিলাদের গর্ভবতী হবার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কখনও কখনও তাকে প্রাচীন মিশরের জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ রাজা অসিরিজ-এর দুষ্ট ভ্রাতা সেট্-এর সঙ্গে উল্লেখিতা হতে দেখা যায়। জলহস্তী শস্য নষ্ট করত। সেই জন্যই হয়তো তাঁকে দুষ্ট সেট-এর সহধর্মিণী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই তউরৎ দেবীর কোন আঞ্চলিক মন্দির নেই। তবে গ্রীক দেবী আথেনাকে ও ফ্লিরহাইনকুস-এ মিশরীয় দেবী থোয়েরিসকে তউরৎ-এর সঙ্গে এক করে দেখানো হ'ত। এই উভয় দেবীরই ভারতীয় দেবী 'দুর্গার মত রণতেজী চরিত্র ছিল বলে সম্ভবতঃ এক করে দেখানো হয়েছিল। তবে উভয়কে এক করে দেখাবার প্রচেষ্টা খুব বেশি দূর এগোয় নি। তউরৎ আপন স্বতন্ত্র সত্তাতেই বিরাজ করেছেন। থোয়েরিয়ন-এ থোয়েরিস-এর নামে তাঁর একটি মন্দির ছিল। অবশ্য মুদ্রাতে যখন এই দেবীর মূর্তি অঙ্কিত করার প্রয়াস দেখা গেছে তখন গ্রীসের আথেন-এর মত মূর্তিতেই তাঁকে আঁকার চেষ্টা হয়েছে। এর কারণ বোধ

হয় এই যে, মিশরের গ্রীক শাসকেরা জলহস্তীর মত কোন কুৎসিৎ-দৃষ্টি দেবী মূর্তি খোদাই করতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে আথেন-এর মত সুন্দরী দেবীর সঙ্গে তো মোটেই নয়। তউরৎকে যদি কখনও ভক্তিশ্রদ্ধা করার প্রয়োজন হত, তখন তাঁকে তউরৎ নামে না ডেকে ডাকত থোয়েরিস নামে।

কুৎসিৎ দর্শন তউরৎ-দেবীকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা হ'ত এই কারণে যে, এই দেবী দুষ্টশক্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন বলে বিশ্বাস ছিল। এইজন্য প্রতি ঘরে ঘরেই তউরৎ-এর মূর্তি দেখা যেত। আর্শীর হাতল, প্রসাধনী সামগ্রী, শিশুদের তাবিজ কবজ, লকেট ইত্যাদিতেও এই দেবীর মূর্তি থাকত।

এই দেবীকে দেখে এমন মনে করলে ভুল হবে যে, প্রাচীন মিশরীয়রা পশু পূজা পছন্দ করত। তবে কয়েকজন দেবতাকে তারা পশুর মধ্য দিয়ে দেখতে ভালবাসত, যেমন মেম্ফিস-এর এপিস-ষাঁড় ছিল প্টাহ দেবতার এবং হেলিওপোলিস-এর ম্-নেভিস-ষাঁড় 'র' দেবতার অবতার স্বরূপ। তবে মিশরে নির্ভেজাল পশু দেবতার চিন্তা মিশরীয়দের আদি অধ্যাত্ম কাঠামোর মধ্যে ছিলনা। ধর্মীয় অবক্ষয়ের মুখেই এঁদের প্রাধান্য এসেছিল। পরবর্তীকালে তাই তাঁদের মধ্যে বেড়াল, বাঁদর, ভেড়া, সাপ ইত্যাদি পূজা করার প্রবণতা আসে। এ ধরনের প্রবণতা আমাদের মধ্যেও আছে। যেমন, বেড়ালকে মা-ষষ্ঠীর বাহন হিসাবে শ্রদ্ধা করা, হনুমানকে রামভক্ত হিসেবে দেখা ও ষাঁড়কে শিবের বাহন হিসেবে দেখা। এরাও কখনও কখনও আমাদের দেশে দেবতাদের সমান মর্যাদা পেয়ে থাকে।

১৫। **তেফ্নুৎ :** এই দেবী মিশরীয় সৃষ্টি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। মিশরীয় সৃষ্টি কাহিনীর গল্প এই ধরনের : আদিতে ছিল করণ সমুদ্র, যাকে তারা বলত নুন বা নু। তা থেকে সূর্য দেবতা র-তুম (বিন্দু)-এর আবির্ভাব ঘটে। র-তুম আমাদের পুরাণ কাহিনীর ব্রহ্মার মত স্বয়ংপ্রকাশ। র-তুম একটি পুরুষ ও একটি মহিলা দেবীর সৃষ্টি করেন। তাঁদের নাম শু ও তেফ্নুৎ। মিশরীয়দের মতে এদের একজন হলেন হাওয়া অথবা আকাশ, অপরজন আর্দ্রতা। শু ও তেফ্নুৎ থেকে আসেন সেব ও নুট অর্থাৎ পৃথিবী ও নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ। সেব ও নুট থেকে আসে আরও দু'জোড়া দেবদেবী, যেমন (১) অসিরিজ ও আইসিস অর্থাৎ নীলনদ ও মিশরের উর্বর ভূমি এবং (২) সেট ও নেফ্থাইস ; মরুভূমি ও পশুজীবন।

সৃষ্টি বর্তমান অবস্থাতে আসে শু অর্থাৎ বায়ুদেবতা সেব ও নুটের অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এসে দাঁড়ানোতে। শু বায়ুদেবতা আকাশ ও পৃথিবীকে পরস্পর নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং আকাশকে উপরে তুলে দেয়। এই কারণেই আকাশ পৃথিবীর আকর্ষণে আজও নুজ হয়ে আছে। দিগন্তে বেঁকে গিয়ে সে পৃথিবীকে স্পর্শ করে আছে এবং তাঁর সারা শরীর সজ্জিত হয়ে উঠেছে নক্ষত্রমণ্ডলীতে। [আকাশের এই বেঁকে যাওয়া বৈজ্ঞানিক

ভাবেও সত্য। অনুনাত্তম বিজ্ঞানের বক্তব্য এই যে, দেশে অর্থাৎ আকাশে কোন ভারি বস্তুর আবির্ভাব হলে সেই ভারি বস্তুর মাধ্যাকর্ষণে দেশ বা আকাশ তার চারপাশে বেঁকে যায়] শু ও তেফনুৎ মিশরীয়দের বড় একটা চিন্তা। আধুনিক বিজ্ঞানীরা 'শু'কে মনে করেন প্রোটন তুল্য এবং তেফনুৎকে ইলেকট্রন তুল্য। এঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য শেষের দিকে দেওয়া যাবে। এখন তাঁদের প্রাচীন ধারণার কথা বলা যাক। শু ছিলেন দেশ-দেবতা। উট্‌ পাখির পালক দিয়ে তাঁকে বোঝানো হ'ত। তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁকে নররূপ দিয়ে যে মূর্তি তৈরি করা হয়েছে তাতে দেখা যায় এক হাঁটুতে ভর করে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে আছেন। দক্ষিণ মিশরে তাঁর খুব কদর ছিল। তবে তাঁর কোন মন্দির নেই। তেফনুৎ-কে শু'র ভগ্নী বা পত্নী হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। তিনিও শু'র মত নররূপ পেয়েছিলেন। তবে তাঁর মাথা দেখানো হয়েছে সিংহের। কখনও কখনও শু ও তেফনুৎ উভয়েই সিংহ হিসেবে দেখা দিয়েছেন।

প্রাচীন মিশরীয়রা যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই সবকিছুকে দেখেছিলেন— তা তাদের সৃষ্টি কল্পনার গল্প থেকেই বোঝা যায়। তাদের হারমোপোলিটান সৃষ্টি-বিজ্ঞানে অগ্‌দোয়াদ নামে আটটি দেবদেবীর কল্পনা করা হয়েছে যার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সৃষ্টিক্রিয়া। এঁদের মধ্যে চারটি হলেন দেবতা ও চারটি দেবী। দেবীরা হলেন দেবতাদের মহিলাত্মিকা দিক।

পুরুষাত্মক দেবতাদের দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকালেই অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য বেরিয়ে আসে। এই চারটি দেবতা ছিলেন (১) নুন = কারণ সলিল (২) হুঃ = অনিঃশেষ দেশ (৩) কুক[1] = অন্ধকার ও (৪) আমোন = অদৃশ্য গতিশক্তি। এই চারটি দেবতা সৃষ্টির জন্য চারটি মৌল তত্ত্বের কথা ঘোষণা করে, যেমন, (১) নুন হল অন্ধকার বিশৃঙ্খলা তুল্য। বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম ফিল্ডস অব্‌ রেডিয়েসন-এর সঙ্গে একে তুলনা করা যেতে পারে। (২) আমোন হল সব কিছুরই মধ্যে যে একটি গতিশক্তি রয়েছে সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রকাশক। এই গতি না থাকলে সৃষ্টি সম্ভব হত না। তাকে 'বায়ু' বলে বর্ণনা করা হলেও তিনি মূলতঃ গতিশক্তি। বায়ু অদৃশ্য কিন্তু অশ্রান্ত গতির প্রতীক। আমোন স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এসেছিল বিশ্বঋতু বা ছন্দরূপে ময়েৎ।

---

(১) কুকের চিন্তা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সত্যে উদ্ভাসিত। সৃষ্টিতে আলো বিকাশের পূর্বে দেশে (হুঃতে) অন্যান্যশক্তির (অর্থাৎ নুনের) উপস্থিতি সত্ত্বেও সবই ছিল অন্ধকার বিশৃঙ্খলায় আচ্ছন্ন। ফলে আলো ছিল না। যখন স্থির শক্তিতে বিজ্ঞানের ভাষায় stagnant energy field-এ গতি (আমোন) আলোড়ন সৃষ্টি করে তখনই আলো প্রকাশ পায়।

আমোনের কাছাকাছি যে পক্ষযুক্ত সর্পের চিত্র করা হয়েছে তা হল গতির প্রতীক। চিত্রটি এই রূপ : আমোন রয়েছেন মেষ আকারে। মহেৎ বসে আছেন তাঁর সামনে, পক্ষযুক্ত সর্প পেছনে।

মহেৎকে যে আমোনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তার কারণ, এই বোঝানো যে, বিশ্বে যে শৃঙ্খলা আছে তা হল বিজ্ঞানের ভাষায় optimum motion-জাত। এ থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমোনের সামনে যে মহেৎকে দেখা যায় তা হল বিশ্বছন্দের প্রতীক। গতির সঙ্গে এই শৃঙ্খলা না থাকলে সৃষ্টি সম্ভব হত না। পেছনে পক্ষযুক্ত সর্প হল গতিশক্তি বা kinetic Energy-র প্রতীক।

আমোন সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তিনি ছিলেন অদৃশ্য দেবতা। তথাপি তিনিই হলেন সৃষ্টির পেছনে সর্বাপেক্ষা মৌল তত্ত্ব। তাঁকে অনেক সময় রাজহংসীর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে যে হংসী বিশ্বডিম্ব প্রসব করেছিল। হিন্দু পুরাণ-কাহিনীতে ব্রহ্মা হলেন প্রকাশ তত্ত্ব। এই জন্য তাঁকে হংসবাহন করে দেখানো হয়েছে। এই হংস হল গতীর প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিজ্ঞানের ভাষায় নিউট্রন ফিল্ড যে ফিল্ড এই গতির সাহায্যেই প্রতি ১২ থেকে ১৫ মিনিটে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন নির্গত করে।

আমোনের আত্মা মেষ স্ফিংস-এ আবদ্ধ রয়েছে বলে বিশ্বাস। কিংবা এই আত্মা সর্পদণ্ডে আবদ্ধ আছে যাকে বলে কম অটেফ্ বা ভারতীয় স্কাম। পরে আমোনকে সূর্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সূর্য হল আলোদাতা এবং আলো হল গতির প্রতীক। সূর্য আপন অক্ষরেখায় ঘোরে এবং আমাদের এই ছায়াপথের কেন্দ্রকে পরিক্রমা করে। গতিতত্ত্বের গুরুত্ব যতই প্রকাশ পায় ততই আমোন দেবতার মর্যাদা মিশরে বৃদ্ধি পায়। পরে তাঁকে দেবরাজ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। গতিশক্তি হিসেবে তিনিই কাল (Time) সৃষ্টি করেছিলেন। এই গতিতত্ত্ব সম্পর্কে ভারতবর্ষের ঋগ্বেদের ঋষিরাও অবহিত ছিলেন। এই গতি শক্তি থেকেই দেশ (শুক্ল) ফুটে উঠে ও অন্ধকারে (কৃষ্ণ) আলো ফুটে উঠে।

মিশরে বর্তমান বিজ্ঞানে যাকে force field বলা হয় নুন হল তাই। কখনও কখনও তাঁকে পটাহ্-ও বলা হয়। নুন হল অনন্ত। তাঁর ঊর্ধ্বও নেই নিম্নও নেই। আদি সলিল বা কারণ সলিল হিসেবে তিনি সমস্ত বিশ্বব্যাপী ছিলেন। অন্যান্য দেবতারা যেমন স্থূল দেহের সাহায্যে সৃষ্টি করেছিলেন, নুন করেছিলেন দেহহীন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা। তারই আত্মিক শক্তিতে অন্যান্য দেবতারা সৃষ্ট হয়েছিলেন। নুনের মধ্যে পুরুষশক্তি ও মহিলাত্মিকা শক্তি একত্রে ছিল। তারই মধ্যে ক্ষুদ্রতর দেবতারা ছিলেন। স্থূল বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সূচনা হত যখন তার মধ্য থেকে স্ব-ইচ্ছায় পুরুষ ও মহিলাযুক্ত আতুম দেবতার সৃষ্টি হয়। এই আতুম হলেন আধুনিক

বিজ্ঞানের নিউট্রন ফিশু তুল্য এবং ভারতীয় পুরাণ কাহিনীর ব্রহ্মাতুল্য। গল্প আছে, স্বয়ম্ভূ হবার পর আতুম বড় একা বোধ করেন। ফলে ক্ষুদ্রতর দেবতাদের সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি করেন নিজের ছায়ার সঙ্গে মিলে। তাঁর প্রচণ্ড সৃষ্টিক্ষমতা দ্বারা তিনি নিজের থেকে ছিটকে বের করে দেন শু অর্থাৎ প্রোটনকে। শু পুরুষ রূপে গণ্য positively charged. আর বের করেন- তেফ্‌নুৎ অর্থাৎ ইলেকট্রনকে। তেফ্‌নুৎ মহিলারূপে গণ্যা Negetively charged. এঁরা পরে বিবাহ করেন এবং একাত্ম হয়ে যান। এই একাত্ম হয়ে যাওয়া হল প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হওয়া। একেই বলে 'বিবাহের ফলে একাত্ম হয়ে যাওয়া। ঘটনাটি আধুনিক বিজ্ঞানের Energy Field ঘনীভূত হয়ে যেমন সৃষ্টি করে নিউট্রনসমূহ, তেমনই। এই নিউট্রন সমূহই আতুম। এই নিউট্রন থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসে প্রতি ১২-১৫ মিনিটে একটি প্রোটন (শু) ও একটি ইলেকট্রন (তেফ্‌নুৎ)। এদের মিলনেই তৈরি হয় হাইড্রোজেন অণু। বিজ্ঞানের এই ঘটনাটিকে মিশরীয় পুরাণ কাহিনীতে আতুম জাত সন্তানদের মধ্যে পরস্পর বিবাহের ফলে একাত্মতা লাভ করার কাহিনী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটিকেই ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে ব্রহ্মা ও সাবিত্রী বা ব্রহ্মাণীর গল্পে ব্যক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মাপুরাণে ব্রহ্মাকে অপব নাম দেওয়া হয়েছে। অপব-র মধ্যে পুরুষাত্মক ও মহিলাত্মিকা শক্তি এক হয়ে ছিল। পরে এই অপব নিজেকে সুস্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মাকে নিয়ে এই ধরনের গল্প বলা হয়েছে :—

ব্রহ্মা নিজের মধ্য থেকে শতরূপা, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী বা ব্রহ্মাণী নামে এক মহিলাকে নির্মিত করেন। তাঁকে দেখে ব্রহ্মা কামমোহিত হন এবং কামার্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। শতরূপা সেই দৃষ্টি এড়াবার জন্য ব্রহ্মার ডান দিকে সরে যান। তাকে দেখার জন্য ব্রহ্মার স্কন্ধ থেকে দ্বিতীয় মুণ্ড বেরোয়। শতরূপা তখন বাঁ দিকে সরে যান। ফলে ব্রহ্মার স্কন্ধ থেকে আর একটি মাথা বেরোয়। শতরূপা তখন উর্ধ্ব আকাশে উঠে যান। ফলে ব্রহ্মার স্কন্ধ থেকে আর একটি মুণ্ড বেরোয়। ব্রহ্মা নিজের কন্যার দিকে তাকিয়ে বলেন, এস আমরা মানুষ, সুর, অসুর সব সৃষ্টি করি। এতে শতরূপা ধরা দেন। তাঁরা নির্জনে শতবর্ষ একত্রে বসবাস করেন...।

এই গল্পের মধ্যেও আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মার চতুর্দিকে ব্রহ্মাণীর নৃত্য হল হাইড্রোজেন অণু তৈরির কাহিনী। হাইড্রোজেন অণুতে একটি প্রোটনের চতুর্দিকে একটি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। এই বৈজ্ঞানিক সত্যই তেফ্‌নুতের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। মিশরীয় তেফ্‌নুৎ হল ভারতীয় ব্রহ্মার শতরূপা, সাবিত্রী বা ব্রহ্মাণীর মত।

**১৬। তোহর জিরেউর :-** পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের অসংখ্য দেবদেবী আছেন। তাঁদের নাম করে সারা যায় না। তেমনই এক দেবী হলেন তোহর জিরেউর। কেপ কোস্টের কাছে একটি পাহাড়ে এই দেবীর বাস। তাঁর রঙ কালো। দেখতে সাদারণ মহিলার মত। তাঁর কাজ হল মহিলাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা। তাঁর বাসস্থানের ধারে কাছে পুরুষদের যাওয়া নিষেধ।

**১৭। তহ্বি-ইরি :** পশ্চিম আফ্রিকার কেপকোস্টের কাছে সাগরের দেবতার নাম তহ্বি। কেপকোস্টের দূর্গের কাছে একটি পাহাড়ে থাকেন। তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। দেখতে মানুষের মত হলে কি হবে, স্বভাবে দানবীয়। তাঁর বাঁ হাত দেখতে অনেকটা হাঙর মাছের পুচ্ছের মত। তিনি নৌকো ডুবিয়ে মারতে ভালবাসেন। তহ্বি-ইরি হলেন তাঁর পত্নী। তহ্বির বাসস্থান থেকে তিনি আধমাইল দূরে একটি পাহাড়ের গুহায় বাস করেন। তাঁর বর্ণ ফর্সা। দেখতে অনেকটা মৎস্যকন্যার মত। তাঁর স্বামীর মত তহ্বি-ইরিও ধ্বংসাত্মিকা শক্তি।

**১৮। 'তারা :** খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পরবর্তী তান্ত্রিক অধ্যায়ে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মেও মহিলা শক্তির বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মে যৌনধর্মী প্রতীক ফুটে উঠে। বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতের মধ্যে উভলিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। এই অবলোকিতেরই মহিলাত্মিকা দিক হলেন 'তারা। 'তারা হলেন হিন্দু সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতির মত। তাঁকে পদ্ম দ্বারাও বোঝানো হ'ত। মরমিয়ারা তাঁকে 'মণি'-ও বলতেন। অনেকে 'মণিপদ্মে' শব্দ দ্বারা 'তারাকেই বোঝায় বলে মনে করেন। বজ্রদ্বারাও তাঁকে বোঝানো হয়। তবে 'মণিপদ্মের' আরও গূঢ় অর্থ আছে। মণি হল বজ্র অর্থাৎ শূন্যতা, পদ্ম হল নিউট্রিন ফিল্ড। 'ওঁ মণি পদ্মে হুম' অর্থ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ শূন্যতাকে প্রণাম করি।

বৌদ্ধ দেবীদের প্রত্যেকের নিজস্ব রূপ আছে। কখনও সে রূপ কোমল কখনও ভয়ঙ্করী। মহিলাত্মিকা শক্তির মধ্যে 'তারা হলেন খুব বেশি প্রচলিতা। তাঁর সঙ্গে চৈনিক কোয়ান ইনের খুব মিল আছে। দুই বর্ণের 'তারা দেখা যায়, একটি দুর্বাদলীয় শ্যাম বর্ণ। অপরটি শাদা। তিব্বতের রাজা স্রোন-শন-গম্পোর দুই পত্নী ছিলেন। এঁরাই সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এঁরা দু'জন দেবী 'তারার অবতার স্বরূপা ছিলেন। চৈনিক রাজকন্যার বর্ণ ছিল ফর্সা। নেপালী রাজকন্যার বর্ণ ছিল শ্যামলা। দ্বিতীয় রূপে 'তারা ভারতীয় দেবী যিনি হাতে পদ্ম নিয়ে বসে আছেন। তাঁর বাঁ পা বিলম্বিত। মুখের বর্ণ শ্যামলা। শ্বেতবর্ণ 'তারার মুখ শাদা। তিনি সপ্তনয়না। দুই হাতের তালু ও পায়ের নিচে একটি একটি করে চোখ আছে। ভ্রূমধ্যেও একটি চোখ আছে। সব মিলিয়ে তাঁর সাতটি চোখ। শ্বেতবর্ণের 'তারার পূজো সাধারণতঃ মোঙ্গল জাতির লোকেরাই করে। ভারতীয় মহামাতৃকার মত 'তারারও অসংখ্য রূপ।

'তারা পদ্মমালিকা দ্বারা সজ্জিতা। তাঁর হাতেও পদ্ম। তাঁর স্বামী অবলোকিতেশ্বরেরও হাতে পদ্ম থাকে। অধিকাংশ বৌদ্ধ দেবদেবীর হাতেই পদ্ম রয়েছে। বৌদ্ধপূর্ব ব্রাহ্মণ্য শতপথ ব্রাহ্মণে পদ্মকে গর্ভের প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারণ করা (তৃ) শব্দ থেকে 'তারা শব্দ এসেছে বলে অনেক মনে করেন। বৌদ্ধরাও তাঁকে ত্রাণকর্ত্রী বলেই মানেন। তিনি হলেন আদি মাতা মায়া। গৌতম বুদ্ধের মায়ের নামও মায়া। ব্রহ্মদেশীয় ও অন্যান্য দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধরা মায়া নামেই 'তারার সাধনা করে। মহিলা ও শিশুদের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে করুণার্দ্রা বলে মনে করা হয়। জলে স্থলে সর্বত্রই তিনি রক্ষাকর্ত্রী, বিপদ থেকে তারণ করেন। তিনি তাঁর নিজস্ব গুণেই স্বর্গের রাণী। অবলোকিতেশ্বরের পত্নী রূপেও তিনি স্বর্গের অধিশ্বরী। 'তারার উদ্দেশে এই ধরনের প্রার্থনা আছে :—

"হে রক্ষয়িত্রী 'তারা তোমাকে প্রণাম।
তুমি বীর্যবতী মা, ত্রিলোকেশ্বরের বার্তা বাহিকা,
তুমি বীর্য ও করুণায় পরিপূর্ণা,
হে মাতঃ যাঁর করতল স্বর্ণময় পদ্মশোভিতা
যিনি আমাদের দুঃখ নিবারণে সর্বদা আগ্রহী
চিরক্লান্তিহীন কর্মময়ী সেই তোমাকে নমস্কার।"

ঐতিহাসিকদের মতে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল মহাচীনে অর্থাৎ বিহার, বঙ্গ ও আসামের কিছু অঞ্চল এবং নেপাল তিব্বত ও ভুটানে। ফলে এই অঞ্চলের কিছু কিছু দেবী বৌদ্ধ তন্ত্রে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁরাই হয়তো হিন্দু তন্ত্রেও দেবী বলে গৃহীতা হয়েছিলেন। সেই ধরনের এক দেবীই হলেন 'তারা বা উগ্রতারা। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচির বিশ্বাস, 'তারা ও একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী।

বৌদ্ধতন্ত্র মতে আদি বুদ্ধের সিসৃক্ষাত্মক পাঁচ প্রকারের ধ্যান আছে। এর প্রত্যেকটি থেকে এক একজন ধ্যানী বুদ্ধ এসেছেন, যেমন, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তি আছে। এর মধ্যে বৈরোচনের শক্তি হলেন 'তারা।

হিন্দুতন্ত্র শাস্ত্রে 'তারাকে দেশশক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। তান্ত্রিকদের মতে মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি হলেন 'কালী। দ্বিতীয় মহাবিদ্যা 'তারা অনন্তদেশের প্রকৃতিরূপিণী। দেশশক্তিস্বরূপা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী। অনন্তশক্তি 'তারা তাই অনন্ত নাগ বেষ্টিতা। ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টির প্রতিমা। প্রতিমা সবই ধ্যান রূপ। আকাশই হল দেশ ও কাল। 'কালী ও 'তারা সেই কাল ও দেশশক্তি। সর্বশক্তির আধার এই আকাশ। তারই প্রতিমা 'কালী ও 'তারা। কালী ও 'তারা তত্ত্ব একই ধরনের। দেশ ও কালে যে বিভিন্নতা 'কালী ও

ঁতারাতে সেই প্রভেদ। ঁকালী ও ঁতারা উভয়েই কাল ও দেশে আত্মশক্তিতে সংহারকারিণী। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ যেমন এক মাত্র কৃষ্ণবর্ণেই বিলীন হয়, তেমনই সমস্ত কালজ পদার্থ ঁকালীতে ও দেশজ পদার্থ ঁতারাতে বিলীন হয়। নির্গুণ নিরাকার বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তি কৃষ্ণবর্ণা ও দেশশক্তি নীল বর্ণা। এঁরা নিত্য অব্যয়া ও কল্যাণময়ী। অকৃতত্ব প্রযুক্ত বলে এঁদের ললাটে চন্দ্রকলা। দেশ ও কাল অনন্ত বলে এঁরা আবরণ শূন্যা।

হিন্দু তন্ত্রে ঁকালীকে রমণী ও ঁতারাকে জননী বলা হয়েছে। এর কারণ, ঁকালী আদ্যাশক্তি, মহাশূন্যতারূপী পুরুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে তিনি যুক্তা। সুতরাং তাঁর সঙ্গ পুরুষের যে ক্রিয়া তা রমণতুল্য। সেই জন্য ঁকালীকে রমণী বলা হয়। এই রমণ থেকেই দেশের জন্ম হয়। সেই দেশ নীলবর্ণা। সেই নীলবর্ণা দেশেই কালদ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টি স্থান লাভ করে থাকে। জননী যেমন সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে থাকেন, তেমনই দেশরূপিণী ঁতারাও জগৎকে ধারণ করে আছেন। সেই জন্য ঁতারাকে জননী বলা হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা, বর্তমানে ঁতারা হিন্দুদের মহামাতৃদেবীদের একজন হলেও মূলতঃ তিনি বৌদ্ধদেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই হিন্দুদের পূজার আঙ্গিনায় এসেছেন।

১৯। ত-বর্ণ দিয়ে ঁমায়ের আরও নানা নাম আছে। তাঁরা একই শক্তির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ হেতু বিভিন্ন নামে উচ্চারিতা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তিব্বতী দেবী, তুষ্টি, ত্রিপুরাসুন্দরী, ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি নামের দেবী। এঁদের নিয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

## থ

১। থনর্ঃ প্রাচীন ইটালীর ইউট্রাসকানদের এমন অনেক দেবী দেখা যায় অপরকে অভিষিক্ত করাই যাঁদের কাজ। কিছুটা পরীজাতীয়। এরা উলঙ্গিনী, পক্ষযুক্তা ও হাল্কা অলংকারে সজ্জিতা। অভিষেকের জলসিঞ্চনী কলসী, ফুলের মুকুট, মালা ইত্যাদি নিয়ে উড়ন্ত অবস্থায় এঁদের দেখা যায়। দেখতে ঠিক পুরনো দিনে আমাদের বিবাহের উপহারের দুইধারে অঙ্কিত ফুলের মালা হাতে পরীর মতন। থনর্ এমনই এক দেবী। জোভের মাথা থেকে দেবী আথেন-এর জন্মের সময় তিনি সাহায্য করেছিলেন।

২। থোয়েরিস ঃ ইনি হলেন প্রাচীন গ্রীকো-মিশরীয় দেবী। দেবী তউর্ৎ ও তিনি একই। তউর্ৎ দ্রষ্টব্য।

৩। থোর(ব)জোরগ ঃ টিউটনদের তিনি এক জ্ঞানী মহিলা। জ্ঞানী মহিলাকে আমাদের দেশে বলা হয় ডাইনী। ইংরেজীতে witch. সুতরাং তিনি পূর্ববঙ্গে রাণী ময়নামতীর মত ডাইনী জাতীয়া সাধিকা। তাঁর জন্য টিউটন সমাজে বিশেষ

সম্মানের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর পোশাক আশাক, বসবার স্থান, খাদ্য, সবই ছিল আলাদা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য গৃহের কোন মহিলাকে জাদু-সংগীত গাইতে হ'ত। তিনি রোগ মুক্তির কথা ও দুর্ভিক্ষ জনিত পীড়া অবসানের কথা বলতেন। ভবিষ্যৎ বাণী করতে ও অভ্যস্ত ছিলেন।

৪। থোরগেরথর হোল্‌গা ব্রুথর বা থোরগেরো হোলগা ক্রয়ো : ইনি হলেন টিউটনিক এক দেবী। প্রাচীন টিউটন বা জার্মানরা মহিলাদের ভবিষ্যৎ-দর্শনীয়া বলে তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এই দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হ'ত। নরওয়ের আর্ল হ্যাকেন ভাইকিংদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্যের মুহূর্তে এই দেবীর উদ্দেশে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান এরলিংকে দেবী থোরগেরো হোলগাব্রুয়ের কাছে বলি দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভও করেছিলেন। বর্বরদের শাসনের শেষ দিকে এই দেবী বেশ প্রাধান্য নিয়েই বিরাজ করতেন। সাক্সো এই দেবী সম্পর্কে যে গল্প করে গেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি ল্যাপ্‌দের রাজা গুসির কন্যা ও হ্যালিগোল্যান্ড বীর হেল্‌গির পত্নী ছিলেন। গুথব্র্যান্ডসডেল-এর মন্দিরে দেবতা থোর, থোরগেরো ও দেবী ইরপার মূর্তি ছিল। আর্ল হাকেন নরওয়ে অধিকার করলে মন্দিরগুলি রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জার্মান সম্রাট অটোর নির্দেশে মন্দিরগুলি ভেঙ্গে ফেলা হলে আর্ল হ্যাকোনের নির্দেশে তা পুনর্নির্মিত হয়েছিল। আবার বর্বরদের বলিদান প্রথাও ফিরে আসে- এমন কি নরবলিদান প্রথাও।

৫। থ্রিয়ে : ইনি গ্রীক-রোমান মৌমাছি-দেবী। হয় তাঁকে যথার্থই মৌমাছি হিসেবে দেখা হ'ত নয়তো পক্ষযুক্ত মহিলার দেহ নিচ্ছে এরকম কল্পনা করা হ'ত তাঁর দেহের নিম্নাংশ ছিল যথার্থই মৌমাছির। ইনি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। গল্পে আছে মধুপান করিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করা হলে তাঁর মধ্যে অদ্ভুত ধরনের এক শক্তি আসতো, তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খুলে যেত। তিনি মীনাডের মত বায়াল পেড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

৬। থেমিস : ইনি প্রাচীন গ্রীক পুরাণ-কাহিনীর চিরন্তন বিধি ও শৃঙ্খলার দেবী। জিউসের আশীর্বাদে তিনি হোরাস ও কেট-এর মা হয়েছিলেন। তাঁকে দেখা যায় ফলে শস্যে জড়িতা ও মেষশৃঙ্গ শোভিতা আকারে। প্রতীকটি প্রাচুর্যের প্রতীক। গায়ে মাছের আঁশের মত আঁশও ছিল।

## দ

১। দেওহারিণ : ইনি উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার মাঝওয়ারদের এক গ্রাম রক্ষয়িত্রী দেবী। গ্রামের চৌহদ্দিকেই ব্যক্তিরূপ দিয়ে পূজো করা হয়। তাঁরা

দুজন আছেন দিহ্ ও দেওহারিণ।

মাঝওয়াররা নরগোষ্ঠী হিসেবে অনার্য। উত্তর-প্রদেশ, বঙ্গদেশ, মধ্য প্রদেশ, বেরার ও অসমে তাদের দেখা যায়। নরগোষ্ঠী হিসেবে তারা গোন্ড ও খারওয়ারদের খুব কাছের লোক। গ্রামের যত দেবতা আছে তাঁদের সমবেত পুরুষ দেবতার নাম দিহ্। 'দিহ্' অর্থ গ্রাম। তাঁর পত্নীর নাম দেওহারিণ। হিন্দীতে বলে দিউরাহ্। সংস্কৃতে দেবগৃহ। দেবগৃহ অর্থ দেবতাদের গৃহ। এই নামের কারণ তিনি গ্রামের বেদী আশ্রয় করে থাকেন। একটা পবিত্র গাছের নিচে এক গুচ্ছ পাথর সংগ্রহ করে রাখা হয়। গাছটি সাধারণতঃ শাল গাছ। মাঝওয়ারদের মধ্যেই অনেকে এঁকে হিন্দু-দেবী হিসেবে মনে করেন। বেদীর উপর থাকে একটি জলপূর্ণ ঘট। এর উপর একটি লাল কাপড় বা পতাকা টানিয়ে দেওয়া হয়। বেদী হল কাদা দিয়ে তৈরী একটা মাটির ঢিবি মাত্র। পূজারীকে বলা হয় বৈগ। ইনি হলেন গুনিন। পূর্বদিকে মুখ করে তিনি দেবীর উদ্দেশে একটি মুরগি বা ছাগল বলি দেন। অল্প কয়েক ফোঁটা রক্ত বেদীর উপর ঢেলে দেওয়া হয়। গুনিন ও তাঁর বন্ধুবান্ধব সেখানেই রান্না করে মাংস খেয়ে নেয়।

২। **দন্তেশ্বরী :** ইনি মধ্য প্রদেশের গোণ্ড বা গণ্ডদের এক দেবী। দন্তেশ্বরী অর্থ দাঁতওয়ালী দেবী। তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য বস্তার রাজ্যে সেদিন পর্যন্ত নরবলি দেওয়া হত। তাঁর স্বামীর নাম বুধা বা বুরহাপেন। কখনও কখনও তাঁকে শুধু ঠাকুর বা প্রভু নামেও ডাকা হয়। তাঁর বাস তেঁতুলগাছে বলে বিশ্বাস। বর্তমানে তাঁকে হিন্দু দেবতা শিবের সঙ্গে এক করে দেখা হয়। এবং দন্তেশ্বরীকে মনে করা হয় তাঁর পত্নী বা কালী হিসেবে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বস্তারের রাজা একদিনেই এখানে পঁচিশিটি নরবলি দিয়েছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্লীম্যান লিখে গেছেন যে, মধ্যপ্রদেশের কোন এক গোষ্ঠীপ্রধান প্রতি বছর এই দেবীর বেদীতে একজন করে মানুষ বলি দিতেন। সেই মানুষটি ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণী ভুক্ত। প্রতাপগড়ে সাতারার রাজাদের বার্ষিক আগমন কালে দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বলি দিতেন।

৩। **দনু (ডনু) :** দনু হলেন প্রাচীন কেল্টদের এক দেবী। এই শব্দের অর্থ দেবতাদের মাতা। সেই অর্থে তিনি ঋগ্বেদের অদিতির মত— অদিতি যিনি আদিত্যদের জননী। এ দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি সর্বোত্তমা। তথাপি কেল্টদের পৌরাণিক গ্রন্থপঞ্জীতে তাঁকে দেবতা দগ্‌দ-এর কন্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁকে সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও কল্পনা করা হয়। তাঁকেই অনেকে 'অনু' নামেও ডাকত। 'অনু' শব্দ এসেছে অন্ অর্থাৎ প্রাচুর্য থেকে। দনু উর্বরাশক্তিরও দেবী ছিলেন। সেই অর্থে তিনি পৃথ্বী মাতাও। পৃথ্বী মাতা হিসেবে তিনি পাতালের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি দেবী ডেমেটারের সমকক্ষা ছিলেন।

ডেমেটারকে বলা হয় মৃতদের মাতা। কেল্টরা মনে করত যে, শস্য যেহেতু মাটির নিচ থেকে জন্মায় সেই হেতু তা পাতালের দান। এই পাতাল থেকে মনুষ্য জাতিরও সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করত। উর্বরা শক্তির দেবী হিসেবে তন্ত্রক্রিয়া সহকারে এই দেবীর পুজো হ'ত। এই দেবীর কাছে মনুষ্য বলি দেওয়া হ'ত। ইংল্যান্ডের লিচেস্টারশায়ারে Black Annis- এর যে উৎসব হয় - তা সম্ভবতঃ প্রাচীন কেল্টদের দনু-পূজার স্মৃতি মাত্র। লোকের বিশ্বাস Black Annis ডেন-পাহাড়ের গুহায় বাস করে। মানুষ তাঁর প্রিয় খাদ্য। তবে এ ধরনের অনুমান কতটা সত্য তা ভেবে দেখতে হবে। প্রচুর্যের দেবী হিসেবে দনুকে প্লুটাস-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ কেল্টরা বিশ্বাস করত যে, মানুষের সভ্যতা ও প্রাচুর্য পাতাল থেকেই এসেছিল।

অনেকে গাড়িতে চড়িয়ে এই দেবীকে নিয়ে শস্য-ক্ষেতের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতো। অনেকে দনুকে দেবী ব্রিগিৎ-এর সঙ্গে এক করে দেখেন— যিনি জ্ঞানের দেবী। ব্রিগিট্ ছিলেন ভারতীয় সরস্বতীর মত, কাব্যের দেবী। তিনি গ্রীকো-রোমান মিনার্ভা দেবীর সঙ্গেও তুলনীয়া। সেই হিসেবে দনুও সংস্কৃতিদেবী, বিদ্যাদেবী, কাব্যের দেবী।

৪। **দেশওয়ালী :** ভারতবর্ষের অনার্য উপজাতিরা প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের শক্তির পুজো করে, যেটা ঋগ্বেদের যুগে আর্যরাও করতেন। বর্তমান হিন্দু-ভারতেও সরাসরি প্রকৃতি পূজা এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে রূপ আরোপ করে পুজো দেবার ব্যবস্থা আছে। দেশওয়ালী তেমনই এক প্রকৃতি-শক্তির নামরূপ। ছোটনাগপুরের মুণ্ডারা এই দেবীর পূজা করে। দেশওয়ালী হলেন অরণ্যমুক্ত ভূমির দেবী।

৫। **দেবভূতি :** দেবভূতি দেবী গঙ্গারই এক নাম। এই নামের অর্থ স্বর্গ থেকে প্রবাহিতা। বৈকুণ্ঠ লোকে বিষ্ণুর পদগলিত ঘর্ম থেকে অর্থাৎ স্বর্গ থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই তাকে এই দেবভূতি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৬। **দেবী বজ্রেশ্বরী :** জ্বালামুখী প্রাচীন ভারতের শাক্ততীর্থস্থানগুলির মধ্যে একটি। জ্বালামুখী অর্থ অগ্নিশিখামুখী। এই তীর্থক্ষেত্রের দেবীর নাম দেবী বজ্রেশ্বরী। এর অর্থ তিনি বজ্রের দেবী। তবে বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বজ্র অর্থ শূন্যতা। তিনি সেই শূন্যতার শক্তি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি বা কালী। বিস্তৃত জ্ঞাতব্যের জন্য জ্বালামুখী প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থের জ-বর্ণে জ্বালামুখী তীর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। একান্নপীঠ অংশের পঞ্চম পীঠে রয়েছে এই জ্বালামুখী।

৭। **দেবী ভৈরবী (সূর্যা দেবী) :** নেপালের শিব পশুপতিনাথের স্ত্রীইই দেবী ভৈরবী নামে পরিচিতা। নেপালের বিস্তৃত অঞ্চলের তিনিই হলেন রক্ষয়িত্রী দেবী। ভিন্নরূপে দুর্গাপূজা বা দশেরা উপলক্ষ্যে তাঁর উদ্দেশে সাংবাৎসরিক বলি দেওয়া

হয়। তবে বঙ্গদেশে যেমন দেবীর মূর্তি তৈরি করা হয় এখানে তেমন হয় না। কিন্তু যেখানে দেবীর পূজো করা হয় সেখানে অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে ব্রাহ্মণেরা যব পুঁতে দেয়। প্রতিদিন সেখানে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের দশম দিনে তারা চারা গাছগুলিকে তুলে ভক্তজনের মধ্যে বিলি করে দেয়। দেবীশক্তির মধ্যে এখানে সর্বপ্রাণবাদী চরিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দেবীকে রীতিমত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। গুর্খা রাজা রামবাহাদুরের পত্নী গুটি রোগে আক্রান্ত হন। তিনি সেরে উঠলেও সারা মুখে দাগ পড়ে যায়। এই বিকৃত রূপ সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীর সব থানগুলি কলুষিত করে দেন। সব থানেই দেবীর পূজা নিষিদ্ধ হয়।

৮। **দেবী কুমারী :** দেবী ভৈরবী বাদেও নেপালে দেবী কুমারী নামে এক কুমারী শক্তির পূজো হয়। এই কুমারী পূজার ধারাও সম্ভবতঃ সর্বপ্রাণবাদী ধারা থেকেই নেপালে এসেছিল। তবে দেবী কুমারী বা কুমরী পূজার ধারা নেপালে বিশেষ একটা ধারা। নেপালে বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেকটি বিহালে (বিহারে) উলঙ্গ বালিকাকে 'কালী' বা 'দুর্গা' হিসেবে পূজো করা হয়। সারা রাজ্যের জন্যও এই ধরনের কুমারী পূজার ব্যবস্থা আছে। এই কুমারী নির্বাচন করা হয় সাধারণতঃ স্বর্ণ হিন্দুদের মধ্য থেকে। বিশেষ করে পুরোহিতদের ঘর থেকে। নির্বাচনের দিন হল নবরাত্রের শেষ দিন। বিশেষ পরীক্ষা করে নেবার পর এই নির্বাচন হয়। অনেকেরই বিশ্বাস যে, নেপাল উপত্যকা হল কুমারীরই উপত্যকা। সুতরাং প্রতিবছর নেপালের রাজাকে কুমারীর কাছ থেকে নেপাল শাসনের জন্য অনুমোদন নিতে হয়। পুরানো কুমারী যখন ঋতুমতী হবার মুখে তখনই নতুন কুমারী নির্বাচন করা হয়। সুতরাং নেপালে দেবী কুমারীর বিরাট প্রাধান্য।

৯। **দিদি ঠাকুরাণী :** পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে সাধারণ মানুষের জন্য দিদি ঠাকুরাণী নামে এক দেবী আছেন। পাথরেই তাঁর পূজা হয়। জড়পিণ্ডে শক্তি আরোপ করে যে পূজার ধারা এ তেমনই এক পূজার ধারা। গল্প আছে, এক সময় কলেরা যখন মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল, একটি মহিলা সেই সময় পুকুরে একটি শাদা পাথর পায়। পাথরটি ছিল রীতিমত জ্বলজ্বলে। সে পাথরটিকে বাড়ি নিয়ে যায়। সেই রাত্তেই এক বৃদ্ধা মহিলা স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে শিখিয়ে দেন যে, কিভাবে সেই পাথরে পূজো দিয়ে কলেরা দূর করতে হয়। তিনি সেই স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে ফল পান। সেই পাথরটিকে বর্তমানে দিদি ঠাকুরাণী বা ঠাকরুণ নামে পূজো করা হয়।

১০। **দিতি :** অদিতি যেমন আদিত্যদের জননী তেমনই তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে পুরাণ কাহিনীতে দিতির কল্পনা করা হয়েছে। দিতি খুব জনপ্রিয়া দেবী নন। ঋগ্বেদে তাঁকে তিনবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অথর্ববেদে বহুবার

তাঁর উল্লেখ আছে। অবশ্য প্রত্যেকবারই অদিতি প্রসঙ্গেই তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে অদিতির ভগ্নী হিসেবে দেখানো হয়েছে। দিতির সন্তানরাই দৈত্য নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন পুরোহিত শ্রেণীই দিতির কল্পনা করেছিলেন।

রামায়ণ ও পুরাণে দিতি সম্পর্কে এই ধরনের গল্প আছে : সমুদ্রমন্থন জাত অমৃত লাভের জন্য দেবতা ও অসুর অর্থাৎ দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। অসুররা দেবতাদের দ্বারা অমৃত লাভে বঞ্চিত হন। ক্ষুব্ধ দিতি এজন্য ঋষি কাশ্যপের কাছে অসুরদের জন্য বর প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা করেন এই যে, তাঁর এমন পুত্র হোক যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে এই বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে পারবেন। কাশ্যপ এই শর্তে বর দেন যে, সেই পুত্রের জন্য হাজার বৎসর দিতিকে শুচিশুভ্র হয়ে প্রার্থনা জানাতে হবে।

ইন্দ্র সব লক্ষ্য রাখছিলেন। গর্ভাবস্থায় একবার দিতিকে অশুচি লক্ষ্য করে তিনি তার গর্ভে প্রবেশ করেন ও ভ্রূণটিকে সাত টুকরো করে কেটে দেন। এ থেকেই পরে সাতটি মরুৎ দেবতার সৃষ্টি হয়। তবে এ কাহিনীটিকে খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না।

মহাভারতে অদিতি ও দিতিকে দক্ষের দুহিতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মহাভারতে দিতিই দক্ষের জ্যেষ্ঠা কন্যা এরকম উল্লেখ আছে। দিতির একটিই সন্তান ছিল, তার নাম হিরণ্যকশিপু। দক্ষের তেরটি কন্যা ছিল। তাদের তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির পুত্র কাশ্যপের সঙ্গে বিবাহ দেন। কাশ্যপও একজন প্রজাপতি ছিলেন।

১১। **দো-তেনঙ্গন :** মালয় উপদ্বীপে কয়ান জনগোষ্ঠী নানা দেবদেবীর পুজো করে। দৈত্য শক্তি ও ভূত প্রেতেরও তারা পুজো করে। তবে সবার উপর তাদের এক দেবতা আছেন তাঁর নাম লকি তেনঙ্গন। তাঁরই পত্নীর নাম দো-তেনঙ্গন। ইনি মহিলাদের রক্ষয়িত্রী দেবী।

১২। **দুর্গম্মা :** দুর্গম্মা হলেন দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়দের এক সর্পদেবী। সাপের গর্তের উপর তাঁর মন্দির তৈরি করা হয়। সেই গর্তে যদি পবিত্র মারগোসা গাছ হয় তবে তো কথাই নেই— আমাদের যেমন ফনী মনসা গাছ। মারগোসা গাছ ও সাপ দুইই দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়দের কাছে পবিত্র এবং উভয়েই দেবী দুর্গম্মার প্রতীক। আমাদের দেশে মনসা পূজার মত দুর্গম্মার পূজাও বেশ জনপ্রিয়।

১৩। **দুর্গা :** কোন বাঙ্গালী পাঠকের কাছেই দুর্গাকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তবু তাঁর একটা ইতিহাসতো আছেই। তা দেওয়া যাক। উমা প্রসঙ্গে দেবী দুর্গারই মরমিয়া কিছু যৌগিক ব্যাখ্যা, তান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবার দেবীর ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলছি। দেবী দুর্গার সহজ পরিচয় শিবের পত্নী হিসেবে। তাঁর অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছে

দেবী, উমা, গৌরী, পার্বতী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, কালী, কপালিনী, ভবানী, বিজয়া ইত্যাদি। দুর্গা নামের মধ্যেও এই দেবীর ভয়ঙ্করী চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। এই দেবীর মধ্যে প্রাকবৈদিক বহু ভারতীয় দেবীও মিশে গেছেন। ফলে দেবীর মধ্য চরিত্রেরও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

এই কারণে জনসাধারণের কাছেও এই দেবী খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। দেবী দুর্গা বৈদিক যুগের শেষ দিকে জনচিত্ত ক্রমশ বেশি করে অধিকার করে নিতে থাকেন। দেবীর কিছু কিছু নাম শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। বাজসনেয়ী সংহিতাতে দেবীকে রুদ্রের ভগ্নী হিসেবে অম্বিকা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তৈত্তিরিয় আরণ্যকে দেবীকে দেখানো হয়েছে রুদ্রের পত্নী হিসেবে। ঐ তৈত্তিরিয় আরণ্যকেই দেবীকে বৈরোচনী নামে সম্বোধন করা হয়েছে। বৈরোচনী অর্থ সূর্য বা অগ্নি-কন্যা। সেখানেই অগ্নিস্তোত্রে আরও দুটো নাম পাওয়া যায়, কাত্যায়নী ও কন্যাকুমারী। 'কেন' উপনিষদে দেবীকে বলা হয়েছে উমা যিনি ব্রহ্মণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। অনেকে সেইজন্য তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যার ব্যক্তিরূপ বলে মনে করেন। কিন্তু তৈত্তরিয় আরণ্যকের দ্রাবিড় ভাষ্যে রুদ্রকে উমাপতি অর্থাৎ উমার স্বামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদে আবার দেখা যায় দেবীকে ডাকা হয়েছে কালী ও করালী নামে। এ দুটো নাম আবার অগ্নির সপ্তজিহ্বার দুটি জিহ্বার নাম। দুর্গার সঙ্গে দেবী সরস্বতীরও একটি সম্পর্ক আছে। কারণ, দেখা যায়, সরস্বতীর নামও বরদা মহাদেবী ও সন্ধ্যাবিদ্যা করা হয়েছে। সরস্বতীর এ নাম পাওয়া যায় তৈত্তিরিয় আরণ্যকে।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে দেখা যায়, ভারতের বহু আঞ্চলিক দেবীই রুদ্র শিবের পত্নী হিসেবে বর্ণিতা হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ পাহাড় পর্বতের সঙ্গে যুক্ত, কেউবা অগ্নির সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ বিভিন্ন আদি নরগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। যেমন, কাত্য জাতির দেবী হয়েছেন কাত্যায়নী, কুশিক নরগোষ্ঠীর দেবী কৌশিকী, পর্ণশবর জাতির দেবী পর্ণশবরী ইত্যাদি। এইভাবে দেবীর অঙ্গীভূতা হবার জন্য নানা ধরনের গল্প ফাঁদা হয়েছে। অগ্নির চরিত্র তাঁর মধ্যে ঢুকে যাওয়াতে দেবীর মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়ঙ্করিতা। অপরপক্ষে পাহাড়-পর্বতের দেবী হিসেবে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে করুণার্দ্রতা। আবার নররক্ত পিপাসিনী বহু আঞ্চলিক দেবী তাঁর মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাঁকে মহিষাসুরমর্দিনী রূপ দান করেছে। তাঁরা মহাদেবীর মধ্যে ঢুকে গেলেও নিজেদের চরিত্র সবটা হারাতে পারেন নি।

ভারতীয় বহু দেবদেবীর মহান এক দেবতা ও দেবীর মধ্যে মিশে যাবার এই যে সূচনা তা হয়েছিল বৈদিক যুগ থেকেই। পূর্ণতা লাভ করে মহাকাব্যের যুগে। তবে দেবীকে নিয়ে অনুষ্ঠানের এমন বাড়াবাড়ি ছিল না। তখন দুর্গার অবস্থা কি

ছিল মহাভারতে অর্জুনের দুর্গা স্তবের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, "হে সিদ্ধসেনী তোমাকে প্রণাম জানাই (সিদ্ধসেনী অর্থ সকল সিদ্ধদের পরিচালিকা অর্থাৎ মহিলা সেনাপতি)। তুমি মন্দরবাসিনী (মন্দার কি মেরুদণ্ড যাকে ঘিরে ওঠা তিনটি নাড়ি দিয়ে প্রবাহিতা হচ্ছেন কুলকুণ্ডলিনী?) কুমারী, কালী, কাপালী, কপিলা ও কৃষ্ণপিঙ্গলা। হে দেবী, ভদ্রকালী তোমাকে নমস্কার। হে দেবী মহাকালী তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডী, চণ্ডা তোমাকে নমস্কার। হে তারিণী, হে বরবর্ণিনী (সুন্দরভাবে রঞ্জিতা), হে ভাগবতী কাত্যায়নী, হে করালী, বিজয়া, জয়া, রণসাজে সজ্জিতা, হে কৃষ্ণানুজা, সর্বজ্যেষ্ঠা নন্দ সন্তান, মহিষ রক্তপ্রিয়া, পীত বসন শোভিতা কৌশিকী, উচ্চহাস্যকারিণী কোকামুখা তোমাকে নমস্কার। হে রণপ্রিয়া উমা শাকম্ভরী, হে শ্বেতা (শ্বেতবর্ণা) হে কৃষ্ণ, হে কৈটভঘাতিনী তোমাকে নমস্কার। হে হিরণাক্ষী, হে ধূম্রাক্ষী, হে বেদশ্রুতি তোমাকে নমস্কার। হে জাতবেদসী (মহিলা অগ্নি) জম্বু সন্নিকর্ষবাসিনী, হে পার্বতী তোমাকে নমস্কার। হে বিজ্ঞান, হে শিব, হে ব্রহ্মবিদ্যা, হে নিদ্রা, স্কন্দমাতা, দুর্গা, অরণ্যাণি তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি কলা, কাষ্ঠা (সময়ের সূক্ষ্মতম বিভাগ) সরস্বতী, সাবিত্রী ও বেদমাতা। হে মহাদেবী তোমায় পবিত্র চিত্তে স্তুতি করছি। তোমার আশীর্বাদে আমি যেন রণজয়ী হতে পারি। মরুভূমিতে, ভয়ে, সঙ্কটে, শরণাগতকে রক্ষা করতে পাতালে সর্বক্ষেত্রেই তুমি দানব বিজয়িনী। তুমিই জম্ভাণী (ধ্বংসকারিণী), মোহিনী মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, জ্যোতির্ময়ী, সাবিত্রী, মা, তুষ্টি (পরিতুষ্টি) ধৃতি, দীপ্তি, সূর্যচন্দ্রবর্ধিকা, রণক্ষেত্রে শক্তিমানের শক্তি। তুমি শুধু সিদ্ধগণ ও চারণগণ কর্তৃক দৃষ্ট, ইত্যাদি।

অনুরূপ স্তব যুধিষ্ঠিরও দেবীর উদ্দেশে করেছিলেন। সেখানে নতুন যা বলা হয়েছে, তাতে তাঁকে বিন্ধ্যবাসিনী বলেও বর্ণনা করা হয়েছে যিনি মদ্য, মাংস ও বলিতে প্রসন্না।

হরিবংশে দেখা যায় দেবী অসভ্য শবর, বর্বর ও পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা হতেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, তাঁকে হিমবৎ ও মেনার কন্যা বলা হচ্ছে। এই মেনা হচ্ছেন রামায়ণের মতে মেরু পর্বতের কন্যা। কিন্তু পুরাণ মতে মনেস-এর মানস কন্যা। রামায়ণে উমাকে গঙ্গার কনিষ্ঠা ভগ্নী হিসেবেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু হরিবংশে (হরিবংশে দেবীকে অপর্ণা বলে ডাকা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি পত্রদ্বারাও আচ্ছাদিতা নন, অর্থাৎ নগ্না) তাঁকে হিমবতো জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর আর দুই ভগ্নীর নাম একপর্ণা ও একপাটলা। তাঁরা যথাক্রমে জৈগিসব্য ও অসিত দেবলের পত্নী ছিলেন। আবার দুর্গাকে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ভগিনী হিসেবেও দেখানো হয়েছে। সেখানে তাঁকে কৌশিকী নামেও

অভিহিতা করা হয়েছে। বৈরোচনী নামে তিনি যেমন সূর্য ও অগ্নির কন্যা, তেমনই গৌতমী হিসেবে তিনি সপ্তঋষির এক ঋষির সঙ্গে যুক্তা। দেবীর এমন মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা বর্ণনা, ঐতিহাসিকদের মতে শৈব ভক্তেরা করেছিলেন, যাতে শিবের পাশে একজন উপযুক্ত পত্নী দাঁড় করানো যায়। এ ধরনের চিন্তা থেকেই দেবীকে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরাণ কাহিনীতে দেখা যায়, দক্ষ কন্যা সতী শিবের পত্নী হয়েছিলেন। সতী পতিনিন্দা শুনে যোগবলে দেহত্যাগ করেছিলেন। তবে মহাভারতের দক্ষযজ্ঞে কিন্তু এমন ঘটনার উল্লেখ নেই। মহাভারতের দক্ষযজ্ঞ গল্পে শিবপত্নীকে 'দেবী' ও 'উমা' নামে ডাকা হয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়ই হল শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ। তারকাসুর দ্বারা পরাজিত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করতে গেলে ব্রহ্মা দেবতাদের বলেন যে, শিব উমাকে বিবাহ করলে তার গর্ভজাত যে পুত্র হবে তিনিই তারকাসুরকে বধ করবেন। কিন্তু শিব উমাকে বিবাহ করবেন কি, তিনি তখন হিমালয়ে নিবিড় ধ্যানমগ্ন। সুতরাং শিবের অন্তরে শিবের জন্য ধ্যানরতা উমার প্রতি কামনা জাগানোর জন্য দেবরাজ ইন্দ্র কামদেব মন্মথকে সেখানে পাঠালেন। মন্মথ শিবের ধ্যান ভাঙানোর জন্য তাঁর প্রতি ফুলশর নিক্ষেপ করেন। ধ্যান ভঙ্গ হওয়াতে শিব ক্রুদ্ধ নেত্রে মন্মথের দিকে তাকান। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মদন ভস্ম হয়ে যায়। পরে উমার সাধনার কাছে নত স্বীকার করে শিব তাঁকে বিবাহ করেন। ফলে উমার গর্ভে কুমার (কার্তিকেয়)-এর জন্ম হয়। তিনি তারকাসুরকে বধ করেন। হিমালয় কন্যার নাম উমা হবার কারণ কালিদাস মনে করেন এই রকম : উমার তপস্যার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মা মেনকা বলে উঠেছিলেন উ-মা অর্থাৎ না-না। সেই থেকে তাঁর কন্যার নাম হয় উমা।

দুর্গার আর এক সন্তানের নাম গণেশ। গণেশের ছিল গজমুণ্ড।

দেবী দুর্গার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাজ হল অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়। তাঁর এই বীরত্বের কাহিনী দেবী মাহাত্ম্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে গল্প আছে যে, দেবতাদের তেজ থেকে দেবী চণ্ডিকা নামে এই দেবীর জন্ম হয়েছিল। মহিষাসুর ইন্দ্রকে বিতাড়িত করে নিজেই স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। দেবী অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সমগ্র অসুর বাহিনীকে বিনাশ করেন। এর পর চণ্ডিকার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহিষাসুর নানা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। বিশেষ করে মহিষের রূপ ধারণ করার জন্য তিনি মহিষাসুর নামে পরিচিত হন। অবশেষে দেবী এই মহিষের স্কন্ধে পা রেখে তাকে বধ করেন। মহিষের কর্তিত স্কন্ধে পা রেখে মহিষাসুর স্বরূপে নিজে নির্গত হন। তখন মহিষাসুরকে দেবী হত্যা করেন। এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপেই দেবী বিশেষভাবে

নির্মিত। সপ্তম শতাব্দীতে কবি বানভট্টও এই মূর্তিতে তাঁর কাব্যগ্রন্থ চণ্ডীশতকে দেবীর রূপ বর্ণনা করে গেছেন।

মহিষাসুর হত্যার পর দেবী আরও দুটি অসুরকে বধ করেছিলেন, যেমন, শুম্ভ ও নিশুম্ভ। দেবী মাহাত্ম্যে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। এই দুই অসুর দেবতাদের পরাজিত করে ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়েছিলেন। দেবতারা তখন গঙ্গা-স্নানরতা পার্বতীর কাছে সাহায্য ভিক্ষার জন্য আসেন। তখন দেবীর দেহ থেকে ভিন্ন এক দেবী নির্গতা হন। তাঁর নাম অম্বিকা বা চণ্ডিকা। শুম্ভ ও নিশুম্ভের দুই অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর রূপ দর্শনে মোহিত হন। তাঁরা শুম্ভকে এই দেবীকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। ফলে শুম্ভ দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। দেবী এক শর্তে রাজি হন, শর্ত এই যে, যদি শুম্ভ তাঁকে পরাজিত করতে পারে তবে তিনি তাঁকে বিবাহ করবেন। শুম্ভ তাঁর সেনাপতি ধূম্রলোচনকে দেবীকে বন্দী করার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবী তাদের সকলকে নিধন করেন। তখন চণ্ড ও মুণ্ডের নেতৃত্বে ভিন্ন একটি বাহিনী পাঠানো হয়। তাদের দেখে দেবী এতই ক্রুদ্ধা হন যে, দেবীর কপাল থেকে ভয়ঙ্করী দেবী 'কালী নির্গতা হন। 'কালী ছিলেন কৃশকায়া, ব্যাঘ্রাম্বর পরিহিতা, নরমুণ্ডমালা শোভিতা, নগ্না ও লোল জিহ্বা। ভয়ঙ্কর সংগ্রামের পর তিনি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কেই হত্যা করেন। এজন্য তাঁর নাম হয় চামুণ্ডা।

এবার শুম্ভ নিজেই বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে রক্তবীজ নামে এক অসুর ছিল। তার একফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে সেখান থেকে অনুরূপ আর এক অসুর গজাতো। ফলে অসংখ্য অসুরের জন্ম হয়। চণ্ডিকা তখন চামুণ্ডাকে আদেশ করেন যে, রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই যেন সে তা খেয়ে ফেলে। এতে রক্তবীজ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেবী ক্লান্ত রক্তবীজকে বধ করেন। এর পর নিশুম্ভ দেবীকে আক্রমণ করেন। দেবীর বাহন সিংহ অসুর সৈন্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর দেবী নিশুম্ভকে বধ করেন। তারপর শুম্ভও নিহত হয়।

'দুর্গার আর একটি রূপও কল্পনা করা হয়েছে, সে রূপ হল নিদ্রাকালরূপিণীর। এই রূপে তিনি বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তা। হরিবংশে এই ধরনের গল্প আছে : কংস কারাগারে বন্দিনী তার ভগ্নী দেবকীর সন্তানদের হত্যা করছিলেন। যাতে তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান বেঁচে না থাকতে পারে, কারণ দৈববাণী অনুসারে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁকে হত্যা করার কথা। কংসের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য ভগবান বিষ্ণু পাতালে প্রবেশ করেন ও নিদ্রা কালরূপিণীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি সাহায্য করলে কালনিদ্রা সর্বলোকে পূজনীয়া হবেন। দেবকীর গর্ভে কংস হত্যার জন্য

ভগবান বিষ্ণু যখন অষ্টম গর্ভের সন্তান হিসেবে জন্ম নেবেন, তখন কালনিদ্রা যশোদার গর্ভে নবম সন্তান হিসেবে জন্ম নেবেন। বিষ্ণুকে তখন যশোদার গৃহে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কালনিদ্রাকে দেবকীর কারাগারে। তাকে পা ধ'রে কংস আছড়ে মারার চেষ্টা করবে, কিন্তু দেবী আকাশে উঠে শাশ্বত স্থান লাভ করবেন। ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গে স্থাপন করবেন, বিষ্ণু তাঁকে নিজের ভগ্নী কৌশিকী হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং ইন্দ্রের কাছ থেকে কালানিদ্রা বিন্ধ্যারণ্যে স্থায়ী আসন লাভ করবেন। সেখানে তিনি বিষ্ণুকে চিন্তা করতে করতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরকে বধ করবেন। লোকে তাঁকে পশুবলি দিয়ে পূজো করবে। এই একই গল্প অন্যান্য পুরাণেও, যেমন, বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও দেখা যায়, এই দেবী বিষ্ণুর সঙ্গে গৌরব ভাগ করে নিয়েছেন। কল্প শেষে যখন ভগবান বিষ্ণু কারণ সমুদ্রে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাঁর কর্ণফুল থেকে নির্গত দুই অসুর মধু ও কৈটভ বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত পদ্মে আসীন ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু বিষ্ণু তাদের সুদর্শনচক্র দিয়ে হত্যা করেন। এখানে যোগনিদ্রার ভূমিকা এই যে, তিনি ভগবান বিষ্ণুর আঁখি পল্লব ত্যাগ করে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়েছিলেন। মহাভারতে এই জন্য তাঁকে কৈটভঘাতিনী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেন অসুর দ্বয়কে বধের সকল কৃতিত্ব তাঁরই।

উপরোক্ত কাহিনীগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাকাব্যের যুগের শেষের দিকে দুর্গা পূজার ধারা রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। হরিবংশ ও পুরাণের সময় মাতৃসাধনা আরও প্রবল হয়। তবে তন্ত্রের আবির্ভাবের পর দেবী মাহাত্ম্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আর কখনও তেমন হয়নি।

উইলসনের মতে তন্ত্র আসে শিব ও পার্বতীর মধ্যে আলোচনার আকারে। দেবী এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রার্থনা ও জাদুমন্ত্র সম্পর্কে শিবের কাছে জানতে চেয়ে যে জবাব পেয়েছিলেন তাই তন্ত্রাকারে দেখা দিয়েছে। একেই বলে আগম তন্ত্র। আগমে বৈদিক পূজা আর্চার ধারা অনেকটাই পাল্টে যায়। শক্তিতত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। শক্তিকে ঈশ্বরের, বিশেষ করে বিষ্ণু ও শিবের শক্তি হিসেবে দেখানো হয়। তিনি এঁদের পত্নী হিসেবে দেখা দেন। সাংখ্য দর্শনে তিনি প্রকৃতি রূপে বর্ণিতা হন। শক্তিতত্ত্বের পেছনে যেমন কাজ করে মরমিয়া অভিজ্ঞতা তেমনই বিজ্ঞান। পুরাণে নানা গল্পের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শক্তির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রূপ হল শিবের পত্নী পার্বতী, ভবানী বা দুর্গা হিসেবে। সকল শাক্তই এই দেবীর পূজো করেন।

মহাভারতেই দেখা গেছে যে, দেবী মদ্য, মাংস ও বলিপ্রিয়া রূপেই বেশী প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। বঙ্গদেশে পূর্বে এই পূজায় হাজার হাজার ছাগ শিশু ও মহিষ বলি দেওয়া হ'ত। কোন কোন জায়গায় দেবীর কাছে নরবলিও দেওয়া

হ'ত। কবি বাণভট্টের চণ্ডিকা শতকে নরবলির উল্লেখ আছে। অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতির মালতী মাধবে চামুণ্ডা পূজারীদের নরবলি দেবার উল্লেখ রয়েছে। নবম শতাব্দীতে সমরাইচ্চ কহা-তে হরিভদ্র চণ্ডিকার কাছে শবরদের দ্বারা নরবলি দেবার কথা উল্লেখ করেছেন। কালিকাপুরাণে নরবলি দেবার রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। নরবলি দেওয়া হলে সহস্র বৎসরের জন্য দেবী শক্তি পান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বামাচারীরা এই শক্তিপূজাকে ন্যক্কারজনক অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে মৈথুন তত্ত্ব নোংরামির পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল, যদিও শাক্ততত্ত্বের মরমিয়া ভাব নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেন। যেমন,

বামাচারীরা তন্ত্রের যে অংশের সাধনা করেন তার নাম পঞ্চ 'ম'-কার। পঞ্চ 'ম'-কার হল মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। সাধারণ অর্থে সব কয়টিই ভোগের ব্যাপার। কিন্তু মরমিয়ারা এর ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, মদ্য : কুলকুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে তখন মস্তিষ্ক স্নায়ু থেকে এক ধরনের রসধারা নিচের দিকে নামতে থাকে। তখন এমন এক আলস্য জড়ানো নিদ্রালুভাব হয় যে, মনে হয় দেহে মদ্যপানের নেশা লেগেছে। মস্তিষ্ক স্নায়ু ক্ষরিত এই রসকেই ভারতীয় তান্ত্রিকেরা মদ্য জাতীয় পানীয় বলে কল্পনা করেন। তবে এই মদ সুরাসার বলতে যা বোঝায় তা নয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে একে বলা হয়েছে প্রকৃতির তেজ। যিনি যোগ বলে প্রকৃতি থেকে Cosmic Energy লাভ করতে পারেন তিনিই মদ্য সাধক।

মাংস : আগমসার তন্ত্রমতে মাংস হল রসনা সংযম। ভিন্নমতে পরমপুরুষ অর্থাৎ শিবই মাংস। পুরুষের শক্তি বা তেজ হল মদ্য। কেউ যদি পুরুষকে আত্মস্থ করতে পারেন তবেই তাঁর মাংস ভক্ষণ করা হয়।

মৎস্য : মেরুদণ্ডের পাশ দিয়ে দুটি নাড়ি মূলাধার থেকে উপরে উঠে গেছে। এই ইড়া ও পিঙ্গলা দিয়ে মানুষের শ্বাস ও প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। এই দুটি নাড়িকে নদীর মত কল্পনা করা হয়, যেমন, গঙ্গা ও যমুনা। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শ্বাস ও প্রশ্বাসকেই দুটি মাছের মত কল্পনা করা হয়। কুম্ভক করে যে যোগী এই শ্বাস ও প্রশ্বাসকে বদ্ধ করতে পারেন তিনিই মৎস্য ভক্ষণ করেন বলে বিশ্বাস। মহানির্বাণতন্ত্রে জলকেই মৎস্য রূপে কল্পনা করা হয়েছে, সুতরাং জলপানই মৎস্য ভক্ষণ।

মুদ্রা : মুদ্রা হল দৈহিক শক্তির একটি ঊর্ধ্ব পর্যায়। ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে স্নায়ু কোষগুলি দেখতে ঠিক পায়রের মত। বর্ণ মূলতঃ শ্বেত। কুলকুণ্ডলিনী এখানে এসে পৌঁছুলে দেহে অদ্ভুত ধরনের একটা প্রেরণা জাগে। যেমন, মদ্য জাতীয় কোন মাদক পানীয়ের সঙ্গে বিশেষ ধরনের কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, যাকে

বলে মুদ্রা, তেমনই কুম্ভকস্থ যোগীদের এখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করতে হয়। যার ফলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ উভয়ই ক্রিয়াশীল থাকে। যিনি কুলকুণ্ডলিনীকে এখানে এনে ক্রিয়াশীলা করতে পারেন তিনিই মুদ্রা সাধক। ভিন্ন মতে অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ লাভকে মুদ্রা সাধনা বলে। তবে অর্থ একই, কারণ, সহস্রার নিকটস্থ পারদোপম মস্তিষ্ক স্নায়ুর কাছে কুণ্ডলিনীকে আনা গেলে তা সৎ-এর অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ কূটস্থানের কাছে চলে আসে। এই কূটস্থানই সৎ। সুতরাং কুণ্ডলিনীর এখানে আসা মানেই সৎসঙ্গ লাভ। মহানির্বাণ তন্ত্রে অবশ্য মুদ্রাকে বলা হয়েছে পৃথিবী, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে স্থূলদেহে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে সেই প্রতিক্রিয়া।

**মৈথুন ঃ** মৈথুন হল মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারের কূটস্থানে মিলিয়ে দেওয়া অর্থাৎ শক্তিকে শূন্যতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। শূন্যতা হল পুরুষ। শক্তি মহিলা। পুরুষরূপী শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গমেই মৈথুন। এ হলেই সাধকের সমাধি হয়। এই হল সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি। এই জন্য ভারতীয় তন্ত্রে মৈথুনকে বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'মৈথুনং পরম তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণম।' অর্থাৎ মৈথুন হল এমন তত্ত্ব যা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের কারণ।

১৪। **দেবী ঃ** দেবী হল ভারতের মহামাতৃকা। 'দুর্গা, 'তারা, 'কালী ইত্যাদি নানা নামে যেসব শক্তি আছেন সবই সেই এক মহামাতৃকা। এঁদের সকলেই দেবী। অঘোর সংস্কৃতি, আহেরিয়া সংস্কৃতি, অহীর সংস্কৃতি, অরণ্য সংস্কৃতি, বৈগা সংস্কৃতি, বঞ্জার সংস্কৃতি, বেদিয়া সংস্কৃতি, বঙ্গ সংস্কৃতি, মধ্য প্রদেশীয় সংস্কৃতি, ডাকাত কৃষ্টি, দ্রাবিড় অগ্নিদেবী, হিংলাজ সংস্কৃতি, মূর্তি পূজা, মহার সংস্কৃতি, সর্পদেবী সংস্কৃতি সর্বত্রই এই দেবী শক্তি নামে অভিহিতা হয়েছেন। সুতরাং দেবী সমগ্র মাতৃকাশক্তির পরিচায়িকা নাম।

১৫। **দশ মহাবিদ্যা ঃ** দশ মহাবিদ্যা দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পের সঙ্গে যুক্ত। সতীর পিতা দক্ষপ্রজাপতি গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার ও কনখল উভয় স্থানকেই বলা হয় গঙ্গাদ্বার)। বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় শুধু শিব ও সতী বাদে। আকাশচারী দেবতা ও দেবপত্নীদের মুখে এই যজ্ঞের কথা শুনে সতীর চিত্ত ব্যাকুল হল। তিনি পিতার কাছে এসে বললেন— 'দেবগণ পিতার যজ্ঞে যাচ্ছেন। আমার ভগ্নী ও আত্মীয়রাও আসবেন। বড় ইচ্ছা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও সেই যজ্ঞে যাই। পিতৃদত্ত বসন ও ভূষণ গ্রহণ করি। বহুদিন আত্মীয় স্বজনকে দেখিনি। চিত্ত বড় ব্যাকুল হয়েছে। যজ্ঞস্থানে সবারই দেখা পাব। যজ্ঞ দেখবারও কৌতূহল হচ্ছে। আপনি দেবাদিদেব মহাদেব। সকল কিছুর উৎস। সুতরাং কোন কিছুর জন্যেই আপনার কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু আমি স্ত্রী জাতি, রমণী স্বভাব। আমার কৌতূহল অপার।

শিব বললেন, হে দাক্ষায়ণী, দক্ষ তোমার পিতা হলেও তাঁকে দর্শনের ইচ্ছা অনুচিত। কারণ, বিশ্ব স্রষ্টাদের যজ্ঞে বিনা অপরাধে তিনি দুর্ব্যবহার করেছিলেন আমার প্রতি। আমার ভয়, যজ্ঞে গেলে তুমি অপমানিতা হবে, তোমার অমঙ্গল হবে।

মনক্ষুণ্ণ সতী প্রত্যুত্তর করলেন না শিবের কথার। কিন্তু স্বজন দর্শনের ব্যাকুলতায় মনের মধ্যে দগ্ধ হতে লাগলেন অহরহ। ব্যাকুল চিত্তে ঘরবার করতে লাগলেন। কখনও অশ্রু ত্যাগ করতে লাগলেন। কখনও বা ক্রোধের বশে কম্পিত হতে লাগলেন। এই সময় সতী শিবের ভীতি উৎপাদনের জন্য দশটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে ভয় দেখিয়েছিলেন তাঁকে, যেমন, 'কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। তন্ত্রে আছে সারা দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুহূর্তের গুণ অনুসারে তিনি এক একটি মূর্তি ধারণ করেছিলেন।

সতী প্রথম রূপ ধরলেন 'কালীর। শিব দেখলেন তাঁর সামনে ভীষণা 'কালী মূর্তি। তিনি নিজে অচেতন হয়ে শায়িত। সেই মহাশক্তির দক্ষিণ চরণ তাঁর বুকের উপর। এলোকেশী সেই মহাশক্তি চতুর্ভুজা। গলায় মুণ্ডমালা। পরনে কঙ্কাল। উর্দ্ধ বামহস্তে ভীষণ খড়্গ। নিম্ন বাম হস্তে নরমুণ্ড। উর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে বর ও অধঃ দক্ষিণ হস্তে অভয়। কালের চিদ্‌শক্তি রূপে সতী তখন ভীষণা মহাকালী অর্থাৎ কালের অধিশ্বরী পরমা প্রকৃতি 'কালী। যে কোন ব্যক্তি বা দেবতারই এই রূপ দেখে ভীত হবার কথা কিন্তু শিব ভীত হলেন না। তিনি নীরবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু যেদিকেই তিনি তাকান দেখেন যে, সর্বদিক আচ্ছন্ন করে সতী দাঁড়িয়ে আছেন নানা মূর্তি ধরে।

'কালী মূর্তির পরেই শিব দেখলেন 'তারা মূর্তি (তারা অর্থাৎ ত্রিতাপ থেকে যিনি তারণ করেন)। ব্যাঘ্রাম্বর পরিহিতা 'তারা নির্বিকার শিবের উপর ভীষণা শক্তি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। এলোকেশী লোলজিহ্বা দেবী। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। স্তনযুগল ও নাভি উন্মুক্ত। চতুর্ভুজের চার বাহুতে অনন্ত নাগ। এবার হাতে কোন আশীর্বাদের ভঙ্গী নেই। চতুর্ভুজে শুধু মহা ধ্বংসের ইশারা। সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে শিব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। কিন্তু কোথায় তাকাবেন তিনি? সর্বত্রই সেই মহাশক্তি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে।

শিবার এবার দেখলেন ষোড়শী মূর্তি। অর্দ্ধশায়িত পুরুষের অর্থাৎ তাঁর নিজের নাভি থেকে উঠেছে পদ্মের মৃণাল। সেই মৃণাল মুখে সহস্রদল পদ্মের উপর আসীনা মাতৃমূর্তি চতুর্ভুজা ষোড়শী অর্থাৎ ষোড়শ কলার শ্রীদানকারিণী। 'মায়ের প্রত্যেক করেই কমল ধৃত। শিব দেখলেন। দেখে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

এবার শিবার দেখলেন ভুবনেশ্বরী মূর্তি। ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ বিশ্বভুবনের দেবী। পদ্মাসনের উপর উপবিষ্ট আশ্চর্য রূপশালিনী দেবী। রূপের ছটায় দশ দিক আলোকিত। দুই হাতে তাঁর আশীর্বাদ। এক হাতে শাসন দণ্ড অপর হাতে পাশ। দেখে শিব দৃষ্টি ফেরালেন।

এবার সামনে দেখলেন ভৈরবী মূর্তিতে সতীকে। ভৈরবী অর্থ ভয়ের কারণ। মহাসলিল থেকে উঠেছে মহাপদ্ম। পদ্মে আসীনা, পদ্মে পদস্থিতা চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি। তাঁর উর্ধ্ব বাম ও অধঃ দক্ষিণ করে আশীর্বাদ। উর্ধ্ব দক্ষিণে শঙ্খ, অধঃ বামে বেদ। আলোতে জগৎ আচ্ছন্ন করে আছেন ভৈরবী।

শিব দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু এবার তিনি যে মূর্তি দেখলেন— তার তুলনা নেই। তিনি দেখলেন মিথুন মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিন্নমস্তা, উলঙ্গিনী শক্তি মূর্তি। তিনি ছিন্নমস্তা অর্থাৎ মায়াপাশ ছিন্নকারিণী। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তাই দিয়ে তিনি ছিন্ন করেছেন নিজের মস্তক। বাম হস্তে সেই আলুলায়িত কেশসম্পন্না ছিন্ন মস্তক ধারণ করে আছেন। দুধারে উলঙ্গা আলুলায়িতকেশা দুই সখী। তিন ধারায় রক্ত ছুটে ফেনিল উচ্ছ্বাসে উর্ধ্বে উঠে ধনুকের মত বঙ্কিম ভঙ্গীতে নিচে পড়ছে। সেই তিন ধারার এক ধারা নিজের ছিন্ন মস্তকে পান করছেন দেবী। বাকী দুই ধারা পান করছেন দুই সখী। যেন দৃশ্য অবিশ্বাস্য। দেখে শিব চোখ ফেরালেন।

কিন্তু এবার তিনি দেখলেন আরও ভয়ঙ্করী মূর্তি। দেখলেন, মহাকালের নির্মমরূপিণী শক্তি ধূমাবতী সামনে দাঁড়িয়ে। ধূমাবতী, অর্থাৎ মোহনাশিনী দেবী। নিষ্ঠুর নির্মম মরুভূমির মত সময়ের হাহাকার চলেছে। তাতে নিরাভরণা বৃদ্ধা বিধবার বেশে কাকধ্বজ রথে বসে ধূমাবতী। শিব শিহরিত হলেন সেই মূর্তি দেখে। অন্তরে সভয়তঃ কম্পন অনুভব করলেন। ভয়ে তিনি আবার মুখ ফেরালেন।

এবার তিনি দেখলেন আরেক মূর্তি, বগলা রূপে সতী। বগলা অর্থাৎ বিশ্বকে যিনি নিজের বশে রাখেন। সিংহাসনের উপর এক পা, আর এক পা নামিয়েছেন অসুরের উপর। রক্তবর্ণা রজোরূপিণী দেবী। সশস্ত্র অসুরের জিহ্বা আকর্ষণ করে রয়েছেন বাম হস্তে। দক্ষিণ হস্তে প্রহরণ তুলেছেন তাকে আঘাত করতে। নারীর মধ্যে শক্তির অমন বলিষ্ঠ প্রকাশ অভূতপূর্ব। শিব বিভ্রান্ত হয়ে আবার দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু চোখের সামনে আবার নতুন মূর্তি।

এবার মূর্তি মাতঙ্গীর অর্থাৎ মলনাশিনীর। চতুর্ভুজা মা। উর্ধ্ব দক্ষিণ ও উর্ধ্ব বাম করে তরবারি ও গদা। অধঃ দক্ষিণ করে আবদ্ধ মুষ্টি। অধঃ বামে পদ্মকলি। রাজেশ্বরীর মত বস্ত্রবিভূষিতা। মা বসে আছেন সিংহাসনে। রূপে অতুলনীয়া অথচ শক্তিতে তিনি দৃঢ়া। শিব ক্ষণিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে আবার দৃষ্টি ফেরালেন।

এবার তিনি দেখলেন কমলা রূপ অর্থাৎ শক্তির কান্তিশান্তিদাত্রী রূপ। আদি

সলিলে ভাসমান সহস্রদল পদ্মের উপর 'মা উপবিষ্টা রাজেন্দ্রানীর মত। তাঁর আসনভঙ্গী যোগাসন। অষ্ট ঐশ্বর্যশালিনী। চতুর্দিক রূপের ছটায় উদ্ভাসিত। শিব আবার ভাবতে লাগলেন।

তান্ত্রিকেরা দশ মহাবিদ্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন এই ধরনের : প্রথম মহাবিদ্যা— মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি 'কালী। এবং দ্বিতীয় মহাবিদ্যা 'তারা অনন্তদেশের প্রকৃতিরূপিণী, দেশ (Space) শক্তি দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী। অনন্তশক্তি 'তারা তাই অনন্তনাগ বেষ্টিতা হয়ে ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টির প্রতিমা। প্রতিমা সবই ধ্যানরূপ। আকাশই হল দেশ এবং কাল। 'কালী ও 'তারা সেই কাল ও দেশশক্তি। সর্বশক্তির আধার এই আকাশ। তারই প্রতিমা 'কালী ও 'তারা। দেশ ও কালে যে বিভিন্নতা 'কালী ও 'তারাতে সেই প্রভেদ। 'কালী ও 'তারা উভয়েই কাল ও দেশে আত্মশক্তিতে সংহারকারিণী। শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ যেমন একমাত্র কৃষ্ণবর্ণেই বিলীন হয় তেমনই সমস্ত কালজ পদার্থ 'কালীতে ও দেশজ পদার্থ 'তারাতে বিলীন হয়। নির্গুণ নিরাকার বিশ্ব হিতৈষিণী কালশক্তি কৃষ্ণবর্ণা ও দেশশক্তি নীলবর্ণা। এঁরা নিত্য অব্যয়া ও কল্যাণময়ী। অকৃতত্ত্ব প্রযুক্ত বলে এঁদের ললাটে চন্দ্রকলা। দেশ ও কাল অনন্ত বলে এঁরা আবরণশূন্যা। সেই কাল ও আকাশই সর্বশক্তি সম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর কারণ। শক্তির বল চিরকালই অক্ষুণ্ণ। ষোড়শী তাই চিরযৌবনা। ষোড়শী সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠা— তাই রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বলবীর্য। তাই সর্বশক্তিরূপিণী রাজেশ্বরীকে ধ্যান করেন পঞ্চ দেবতা (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানের প্রাণশক্তি পঞ্চ দেবতা? বৌদ্ধ তন্ত্রের ধারা থেকে এসেছেন 'এরা?)। কারণ, এই আদ্যাশক্তিই তাদের উৎস। 'কালী 'তারা মহাবিদ্যা থেকেই ষোড়শীর উৎপত্তি। চতুর্থ শক্তি ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুই রূপ— কোমল ও প্রচণ্ড। ভুবনেশ্বরী শক্তির মনোহারিণী রূপ। ভৈরবী চণ্ডশক্তি। অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হয়ে তন্ত্রের অষ্টনায়িকা। ভৈরবীই আবার ছিন্নমস্তা, ষষ্ঠবিদ্যা।

ভগবতী সকল মূর্তিতেই বিশ্বপালিকা। কারণ, তিনি যেমন সৃষ্টির কারণ, তেমনই স্থিতিরও মূল। ছিন্নমস্তারূপে পালিকাশক্তি প্রবল হলে প্রকৃতি ভৈরবী থেকে ভিন্ন। ছিন্নমস্তার তিন রুধির ধারাতে অন্নপূর্ণার ত্রিধাশক্তি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপা হলেন অন্নপূর্ণা। তাই তাঁর রুধির ধারা হল ত্রিধারা। জগৎভোক্তা রূপে নিজ জগদ্দেহ থেকে ভোগ্য সংগ্রহ করছেন প্রকৃতি, আবার ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করে পরিপুষ্টা ও পালিতা হচ্ছেন নিজেই। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিনই পৃথক শক্তিরূপে বিরাজমানা। ভোক্তা থাকতে পারে, ভোগ্যও থাকতে পারে, কিন্তু ভোগ না হলে পুষ্টি নেই। জগতের পালনের জন্যই এই ভোগ। তাই ত্রিরুধির ধারার একটি ধারা ছিন্নমস্তা পান করছেন স্বয়ং

এবং অপর দুই ধারা পান করছেন একান্ত দুই সখী ভোক্তা এবং ভোগা— শক্তিরূপা। সেই জন্য স্বতন্ত্রদেহী। ছিন্নমস্তায় আছে অন্নপূর্ণার জগৎ পালন রীতি। কিন্তু ভোগই শেষ কথা নয়। ভোগ শেষ হলেই হয় প্রলয়। তাই ছিন্নমস্তার পর শক্তি হলেন প্রলয় রূপিণী ধূমাবতী। জগতের ভোগ শেষ হলে জরাজীর্ণা ভগবতী আসেন বৃদ্ধাবেশে, কাকধ্বজ যমের প্রলয় রথে চড়ে, ক্ষুধাতুরা ও বিস্তৃতবদনা হয়ে। সকল সৃষ্টিকে কুলায় সংগ্রহ করে নিজের উদর পূর্ণ করেন তিনি। ধূমাবতী তাই প্রলয়রূপিণী ভৈরবীর ভয়ঙ্করী মূর্তি। অষ্টম মূর্তি রক্তবর্ণা রজরূপিণী বগলা। এই মূর্তিতে দেবী ঘোর বেদবিরোধী অসুরকে বিনাশ করেন। সেই অসুর নাশে যে জ্ঞানের উদয় সেই নির্মল জ্ঞানরূপিণী ভগবৎশক্তিই মাতঙ্গী। মাতঙ্গী মূর্তিতে বিশ্বরূপিণী শক্তি অজ্ঞানরূপ অবিদ্যানাশিনী, কৃষ্ণাঙ্গী, তমোরূপিণী শক্তি। এই সমস্ত শক্তিধারিণী হয়ে শক্তি অষ্ট ঐশ্বর্যশালিনী কমলারূপে জগৎ ব্যাপ্তিনী। সর্বত্রই তাঁর ঐশ্বর্য মূর্তি।

যে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার কমল আসনরূপ কারণবারি থেকে সঞ্জাত সেই কমলেই কমলার ব্রাহ্মী শক্তি এবং অপর বিদ্যারও আসন। কেবল 'কালী ও 'তারা মূর্তিতেই ভগবতী মহাকাল ও মহাদেবরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের বক্ষারূঢ়া। তাই এই 'কালী ও 'তারা মূর্তিই আসলে মহাবিদ্যা। অন্য আটটি মূর্তি এই দুই থেকে উৎপন্না 'পরাপরবিদ্যা' ও 'সিদ্ধবিদ্যা' নামে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভক্ত। সুতরাং যে বিশ্বকমল(১) ত্রিগুণময় হয়ে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত অষ্টবিদ্যার আসন স্বরূপ হল তাই। ব্রহ্মস্বরূপ শিব শক্তির এই আশ্চর্য লীলা যখন বুঝলেন তখনই সতীকে পিতৃগৃহে যাবার জন্য পথ ছেড়ে দিলেন।

কালের দুই মূর্তিতে শক্তির প্রকাশ— কর্মশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তি যখন কালের সঙ্গে ওতপ্রোত থাকেন এবং ব্রহ্মশক্তি ও কর্মশক্তির মধ্যে যতক্ষণ সাম্য রক্ষা পায় ততক্ষণই শক্তি। কিন্তু কেউ যদি কর্মশক্তির মদগর্বে ব্রহ্মশক্তিহীন হয়ে শক্তিকে কালের অচ্যুত করে, ধ্বংস তখন অনিবার্য হয়। আত্ম অহংকারে অহংকৃত দক্ষ কালের কর্মশক্তিকে যজ্ঞে আহ্বান করেছিল। শক্তিরূপিণী শক্তিকে তাই যেতেই হবে। কিন্তু শিবব্রহ্মশক্তিচ্যুত 'কালীর কর্মশক্তি জড় মাত্র। তা দিয়ে কর্মসিদ্ধি হবে না। তাই শক্তির আবির্ভাবে যজ্ঞ পণ্ড হবে মাত্র। হৃদি চঞ্চলা সতীর দিকে তাকিয়ে শিব বুঝলেন, প্রকৃতি আবার আবির্ভূতা হতে চান নতুন তেজে। কিন্তু তবু কি আশ্চর্য মমতা সেই শক্তির প্রতি। ব্রহ্মপুরুষে শিব বেদনা বোধ করতে লাগলেন। প্রকৃতি সতী গমন করলেন দক্ষযজ্ঞে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ

---

(১) বিশ্বকমল অর্থাৎ ত্রিকোণ রূপ ব্রহ্মযোনি যা দিয়ে জগৎ আকাশে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মযোনি = বীজাবস্থা। বিশ্বকমল ব্ল্যাকহোল বা নিউট্রন বিন্দু।

হল কর্মশক্তি। ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশিত। যার পরিণতি ধ্বংসের মধ্যে। সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন হল তাঁর তিনগুণে প্রকাশ। তাঁর পুরুষ তখন নিষ্ক্রিয়, অচৈতন্য। শক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে একান্নটি অংশে বস্তুসত্তারূপে প্রকাশিত। শিবের দক্ষযজ্ঞনাশ হল বস্তুজগতের প্রবল প্রলয়। শক্তির শিবে প্রত্যাবর্তন অর্থ পুনরায় জ্ঞানের জয়।

১৬। **দক্ষিণা কালী** : কালীকে দেখা যায় শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে। যদি তিনি দক্ষিণ চরণ বাড়িয়ে থাকেন তাহলে তা সৃষ্টির প্রতীক। সাধারণতঃ এই মূর্তিতেই আমরা তাঁকে পূজা করি। তবে তিনি যদি বামচরণ বাড়িয়ে থাকেন তবে তা হয় ধ্বংসের প্রতীক। দক্ষিণ চরণে শক্তি প্রকৃতিতে গুণসাম্য বজায় রাখেন। এখানে তাঁর দাক্ষিণ্য ফুটে উঠে। বামাচরণে ধ্বংস— তিনি শ্মশান কালী। এ প্রসঙ্গে ক-বর্ণে কালী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

## ধ

১। **ধরতী মাতা** : ওরাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার নাম ধর্মে বা ধর্মেশ। বঙ্গদেশে এঁর পূজো হয় ধর্মরাজ নামে। তাঁর পত্নীর নাম ধরতী মাতা বা পৃথ্বী মাতা। বঙ্গ দেশেও পৃথিবী মাতৃরূপ মান করে পূজো করা হয়। তাঁর দুটো রূপ আছে একটি কল্যাণদাত্রী, অপরটি ভয়ঙ্করী। কল্যাণময়ীরূপে তিনি সর্বপ্রাণীর মাতা রূপে গণ্য। তিনি অন্নপূর্ণা স্বরূপা, অন্নদাত্রী। এই ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় ভূ-দেবী বা ধরতী মাঈ। কখনও বলা হয় বসুন্ধরা অর্থাৎ ঐশ্বর্য-বাহিনী। অম্বুবাচীও তিনিই। তাঁর আর এক নাম হল বসুমতী ঠাকুরাণী। ধর্মপ্রাণ হিন্দু ঘুম ভেঙে উঠেই তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়। মরণোন্মুখ ব্যক্তি ও সন্তানদাত্রী মাতাদের তার বুকের উপর রাখা হয়। গোবৎসা জন্মানোর পরে গাভীর প্রথম দুগ্ধ ফোঁটা মৃত্তিকাতে ফেলা হয়।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে ধরতী মাতা রজস্বলা হন বলে ধারণা। তখন ভূমি কর্ষণ বাদ রাখা হয়। চাষ সম্পর্কিত সব কাজই বন্ধ থাকে। বিধবা মহিলারা রান্না করা খাবার খান না। একেই বলে অম্বুবাচি। চতুর্থ দিনে স্নান করে পবিত্র হতে হয়। ঋতুবতী মহিলারা ঋতুকালে সর্বদাই এই নিয়ম অনুসরণ করে চলে। দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি পাথরের স্তম্ভ মাটিতে পোঁতা হয়। এর উপরি ভাগ সিঁদুর দ্বারা চর্চিত করা হয়। গৃহিণীরা হলুদ গোলা জল দিয়ে পাথরটি ধুইয়ে দেয়। এর কাছাকাছি কোন কাঠের কাছে সুপুরী রেখে দেওয়া হয়। তখন পাথরটির উপর ফুল চড়ানো হয় এবং দুধ ও কলা ঢালা হয়। সিঁদুর লেপন সম্ভবতঃ অতীত দিনের রক্তদানের একটি চিহ্ন মাত্র।

দ্রাবিড়দের বিশ্বাস, ধরতী মাতার উর্বরা শক্তি মাঝে মাঝেই কমে যায়। তখন তাঁর উর্বরতা শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বলি দিয়ে রক্তদান করতে হয়। কন্ধদের ক্ষেত্রে নরবলি দেওয়া হ'ত। সেই মনুষ্যের মাংসের কিছুটা অংশ মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত কিংবা পুঁতে দেওয়া হ'ত যাতে ধরিত্রী তাঁর উর্বরতা শক্তি ফিরে পেতে পারে। এই জন্য প্রতিবছর সর্বপ্রধান গ্রাম দেবতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবার প্রথা ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রধান গ্রাম দেবতাকে বলা হয় ক্ষেত্রপাল। ক্ষেত্রপাল অর্থ ভূমিপালক।

ধরতী মাঈ বা মাতা সাধারণতঃ কল্যাণময়ী হিসেবে বিবেচিতা হলেও—তাঁর ভয়ঙ্করী রূপও আছে। তাঁকে যেমন গ্রামরক্ষয়িত্রী দেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়, যিনি বিপদ-আপদ ও রোগ-শোক থেকে রক্ষা করেন, তেমনই রোগশোক মহামারী দাত্রী হিসেবেও দেখা হয়। বিশেষ করে কলেরা ও গুটি রোগের দেবী হিসেবে দেখা হয়,— কারণ এ দুটো রোগই মহামারী আকারে দেখা দেয়। দেবীর ভয়ঙ্করী রূপ হল কালী, দেবী, দুর্গা ইত্যাদি। এই রোগের প্রাদুর্ভাব হলে গ্রামের লোকেরা নির্দিষ্ট থানে এঁদের পুজো দেয়। কলেরা দেখা দিলে সাধারণত কালীরূপে পৃথ্বী মাতার পূজা দেওয়া হয়। অপর পক্ষে গুটি রোগ দেখা দিলে দেবীর পূজো করা হয় শীতলা রূপে। শীতলা অর্থ যিনি শীতলতা পছন্দ করেন। অনেকে তাঁকে বলে বসন্তী বুরহী। বসন্তী বুরহী অর্থ বসন্তের বৃদ্ধা দেবী। বসন্তী চণ্ডী নামেও তাঁকে ডাকা হয়, যার অর্থ বসন্তের নির্মম দেবী। তাঁকে অনেক সময় কঙ্কর মাতাও বলা হয়। কঙ্কর মাতা হিসেবে তিনি সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করী। তবে কঙ্কর মাতার আক্রমণ খুব কমই হয়। ফুলমাতা ও পানসাহী মাতা হিসেবে তিনি সাতবছরের নিচের শিশুদের আক্রমণ করেন। সাত বছর থেকে পনের বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরদের আক্রমণ করেন বদ্রী মাতা হিসেবে। গুলসলিয়া মাতা হিসেবে সব বয়সের লোককেই আক্রমণ করেন। এরা সবাই শীতলা মায়ের ছয় ভগ্নী।

শীতলা ও তাঁর ছয় ভগ্নীকে সাতটি মাটির ঢেলা দিয়েও বোঝানো হয়। এই সাতটি মাটির ঢেলাকে একটি খড়ের ছাউনী তুলে তার নিচে সার বেঁধে বসানো হয়। মহামারীর সময় উচ্চবর্ণের লোকেরা দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগল, কবুতর ইত্যাদি বলি দেয়। নিম্নবর্ণের লোকেরা কাটে শূকর। মহামারী ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দিলে উচ্চবর্ণের লোকেরাও দেবীর উদ্দেশ্যে শূয়র কেটে দেয়। তবে যেহেতু ধরতী মায়ের এই সব নানা রূপের পূজো মহিলারাই বেশি করে, সেই জন্য এই ধরনের পশুবলি দেবার জন্য তারা নিম্নবর্ণের লোকদেরই নিয়োগ করে।

ছয় বোন সহ শীতলার পূজা করা হলেও এতে প্রাধান্য থাকে শীতলারই। শীতলা সাধারণতঃ নগ্নমূর্তি। বর্ণ লাল। বাহন গর্দভ। ডান হাতে থাকে ঝাড়ু যা দিয়ে তিনি রোগ ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন। বাঁ হাতে থাকে মাটির পাত্র। তাঁর মাথার

উপর থাকে কুলো। অনেক আরও কিংভূতকিমাকার মূর্তিতেও তাঁকে দেখা যায়।

অনেক সময় কাঠ বা পাথরের উপর শুধু খোদাই করা মুখেও শীতলাকে দেখা যায়। আগাগোড়া সিঁদুর চর্চিত। সারা দেহে সোনা, রুপো ও পেতলের পেরেক ঠুকে দেওয়া দাগ। দাগগুলি গুটি রোগের প্রতীক। যশোর ও নোয়াখালিতে দেবীকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। ওড়িশা ও চম্পারণ-এ মাটির ঘটেই দেবীকে কল্পনা করা হয়। খুলনাতে পোদরা এই দেবীকে শুধুমাত্র যে গুটিরোগের দেবী হিসেবে কল্পনা করে তা নয় তাদের প্রধান দেবী হিসেবেও চিন্তা করে। যদি কাউকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়, বা অন্য কোন বন্যজন্তু সে দেহ গ্রাস করে তাহলে মনে করা হয় যে, দেবী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলেই এমনটি ঘটেছে।

শীতলা শুধুমাত্র গুটি রোগের দেবী এমনতর ধারণা পরবর্তীকালে এসেছে। কোথাও গুটি রোগ, হাম ও কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিলেও তাঁর পুজো করা হয়। কখনও কখনও দেবীর মূর্তিকে মন্দিরে রাখা হয়। কখনও রাখা হয় পূজারী গুণিনের বাড়িতে। তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা শীতলা দেবীর পুজো করলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে করান। মালী শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকেই সাধারণতঃ শীতলাদেবীর পূজারী ঠিক করা হয়। এরা গুটি রোগ হলে নিমের ডালের সাহায্যে হাওয়া দিয়ে চিকিৎসা করে। রুগীর জ্বর দূর করবার জন্য দেবীকে স্নান করায়। নানা ধরনের মন্ত্রও পড়ে।

শীতলারই মত মাতা পৃথিবী কখনও কলেরার দেবী হিসেবেও দেখা দেন। কেউ তাঁকে ডাকেন ওলাবিবি অর্থাৎ কলেরার দেবী হিসেবে। কেউ ডাকেন ওলাচণ্ডী হিসেবে অর্থাৎ নিষ্ঠুর দেবী হিসেবে। কখনও দেখা যায় তিনি গাউন পরে ঘোড়ায় চেপে আছেন। তবে সাধারণতঃ মাটির ঘটই তাঁর প্রতীক। এই ঘট বসানো থাকে নিম গাছের নিচে। তাঁর পূজারীরা সাধারণতঃ নিচু জাত থেকে আসে। এই দেবীর প্রিয় ভোগ হল ছাগল।

পৃথ্বী মাতার এই কয়টি রূপের বাইরেও আরও নানা মূর্তি আছে। সর্বপ্রাণবাদ থেকেই এঁদের উদ্ভব ঘটেছে বলে বিশ্বাস। পৃথ্বী মাতার মতই এঁদের সবারই স্বামী হিসেবে একজন করে পুরুষ দেবতা আছেন। শীতলার স্বামীর নাম হল ঘণ্টা করণ। ঘণ্টা করণ অর্থ ঘণ্টার মত বড় বড় যার কান। হিমালয় অঞ্চলে জলপূর্ণ ঘটে তাঁর পুজো করা হয়। তুকতাক্ করে যে রোগ সারানো যায় তিনি এমন সব রোগেরই দেবতা। অনেক সময় তাঁকে দ্বাররক্ষক হিসেবেও দেখানো হয়। হিন্দু ধর্মের আঙ্গিনায় এসে ছোটখাটো দেবতারূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

ওড়িশাতে ওলাবিবির সমকক্ষ দেবী হলেন যোগিনী। বর্ধমানে তিনিই দিদি ঠাকুরাণী। রাজবংশী সম্প্রদায় তাঁকে বলে চিতন ঠাকরুণ। চিতন ঠাকরুণ মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব দূর করেন। ভয়ঙ্করী কালী হিসেবে পৃথিবী দেবী কল্যাণময়ী

মূর্তি ধরেন রক্ষকালী নামে। এই রক্ষাকালী যেমন রোগ আনেন তেমনই রোগ দূরও করেন।

বোম্বাইতে ঢোল বিবাহে একটুকরো কাঠকে লাঙ্গলদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে একুশটি মাটির ঘট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তারপর ঢোল পূজো করে বিবাহ উৎসব আরম্ভ হয়। এরপর হলুদ ও ভাত দিয়ে ঢোলটি রেখে দেওয়া হয়। ঢোলের গায় পাঁচটি সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়। এই ঢোল বাজিয়ে মহিলারা পার্শ্ববর্তী মাঠে চলে যায়। সেখানে বয়ঃবৃদ্ধা এক মহিলা ধরতী মায়ের পূজো করেন। এরপর পাঁচ কোদাল মাটি তুলে ঘরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে জলভর্তী একটি ঘট, লাঙলদণ্ড ও একটুকরো কাঁচা বাঁশ রাখা হয়। এই ঘট যখন পূজা করা হয় তখন বর বধূ ও পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণ করার বিধি আছে। সেখানে ঘটের পাশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নৈবেদ্য নিক্ষেপ করা হয়। বাঙালী হিন্দুদের ঘরেও বিবাহ উপলক্ষ্যে যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা হয় ও দেয়ালে সিঁদুর দিয়ে বসুধরার চিত্র অঙ্কন করা হয় তাও এক ধরনের ধরতী মায়েরই পূজা।

উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুরের মঝওয়াররা হরিয়ারী মাতা নামে এক দেবীর পূজো করে। হরিয়ারী মাতা হল সবুজের মাতা অর্থাৎ শস্যের মাতা। সুতরাং তাঁকে ধরতী মঈয়ের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। শস্য সংগ্রহের সময় জীবজন্তু পুড়িয়ে তাঁর পূজো করে নেওয়া হয়।

রাজস্থানে গৌরীর যে পূজা করা হয় তিনি অন্নপূর্ণা স্বরূপা অর্থাৎ যিনি অন্নদান করেন। নববর্ষের প্রথমেই শহরের বাইরে গৌরীর জন্য মাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এতে এটাই বোঝা যায় যে, গৌরীই হলেন পৃথিবী মাতা। শিবকে এই দেবীর সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়। ছোট একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে যব পুঁতে দেওয়া হয়। এরপর মাটি চ'ষে কৃত্রিম তাপ দিয়ে শস্য গজানো হয়। মহিলারা হাতে হাত লাগিয়ে এর চারদিকে নৃত্য করে। তারা গৌরীর কাছে তাদের স্বামীদের জন্য প্রার্থনা জানায়। এরপর নবোদ্গত শস্য চারা তুলে নেওয়া হয়। এই চারাগুলি মহিলারা পুরুষদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। পুরুষেরা এই চারা তাদের পাগড়ীতে ধারণ করে। দক্ষিণ ভারতে ভূমি দেবী হিসেবে এই ধরতী মাঈ বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত— অর্থাৎ বিষ্ণু স্বামী হিসেবে প্রদর্শিত। পরে অর্ধনারীশ্বর হিসেবে তাঁর সঙ্গে শিব যুক্ত হয়ে যান।

বহু দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী পৃথ্বী মাতার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সাংবাৎসরিক বিবাহ দেন। ছোটনাগপুরের খারওয়াররা প্রতি তিন বৎসরে এই পৃথ্বীমাতা অর্থাৎ মূচক রানীর ধূমধাম সহকারে বিবাহ অনুষ্ঠান করে থাকে। ভারতের মধ্যবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা মনে করে যে, গৃহের পবিত্র বৃক্ষের নিচে স্তূপীকৃত পাথর খণ্ডের মধ্যে অন্যান্য গ্রামদেবতার সঙ্গে ধরতী মাঈ বাস করেন। কৃষিকাজের সময়

ফুল ও ছাগলের মাংস দিয়ে এই দেবীর পুজো করা হয়। অন্যান্য পাহাড়ী নরগোষ্ঠী জঙ্গল কাটার সময়, পাহাড়ী ঘাস সংগ্রহের সময় ও মহুয়া ফুল সংগ্রহের সময় এই ধরিত্রী দেবীর পুজো করে নেয়। পৃথিবীর উদ্দেশে মদ, মাংস, ঘৃত ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয়।

ধরতী মাঈ যখন কল্যাণময়ীরূপে, তখন তাঁর উদ্দেশে ফুল, দুধ, ফল ইত্যাদি দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। ভয়ঙ্করীরূপে তাঁকে খুশি করার জন্য পশুবলি ও নরবলি দিয়ে পুজো করা হয়। বর্তমানে নরবলি আর হয়না।

পূর্ব পাঞ্জাবে ধরতী মাঈ শাগুন মাতা অর্থাৎ উর্বরা শক্তির মাতা রূপে পূজিতা। দুইতাল গোবরের মধ্যে একটি লাঙলের ফাল রেখে তাকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এর উপর পবিত্র বৃক্ষের পাতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভয়ঙ্করীরূপে এই পৃথ্বী মাতা সর্পের সঙ্গে যুক্ত। সাপ মাটির গর্তে বাস করে এবং অন্ধকারে বিচরণ করে। এই জন্য তাঁকে পৃথিবীর শক্তি বলে মনে করা হ'ত। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীসে গ্রীকরা থেসমোফেরিয়াতে মাটির ফাটলে শূয়রের মাংস ছুঁড়ে দিত। কারণ পৃথিবীর শক্তি হিসেবে সেখানে রক্ষক সাপ বাস করত বলে বিশ্বাস। ছোটনাগপুরের কুরুসরা মনে করে যে, তারা নাগভূইয়া ও নাগ ভূইয়াইন থেকে এসেছে। এঁরা হলেন পৃথিবী পুরুষ ও মহিলা জুটি। দক্ষিণ ভারতের মাতৃদেবী এল্লম্মার মন্দিরে সর্পমূর্তি আছে। এই পৃথ্বী মাতারই আর এক নাম দুর্গাম্মা। দুর্গম্মার মন্দির সাপের গর্তের উপর নির্মিত। পাশেই আছে সারগোসা বৃক্ষ। এই বৃক্ষকে পাশে কোন সাপ থাকলে বিশেষ ভাবে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। উভয়েই দেবীর প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। উত্তর প্রদেশের ডাঙ্গিরা পৃথিবী মাতার পূজা না করলেও পৃথিবী দেবতা ভূমিয়ার পূজা করে। ভূমিয়া হল বৃদ্ধ সর্প। বুন্দেল খণ্ডে পৃথ্বী মাতার পুজো করা হয় ভিয়রানী হিসেবে। ভিয়রানী অর্থ ভূমিতে বসবাসকারিণী। একই কারণে বহু জনেই সাপকে মাটির নিচে গুপ্তধনের পাহারাদার বলে মনে করে।

প্রাচীন এই ধারণা থেকেই কল্যাণময়ী ও ভয়ঙ্করীরূপে পৃথ্বী মাতার পুজোর ধারা চলে এসেছে। শিল্পেও মাতৃ দেবতার সঙ্গে পৃথিবীর নিবিড় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। গ্রীক পাত্রে যেমন দেখা যায় মাতৃদেবতা মাটির ঢিবি থেকে উঠে আসছেন তেমনই দেখতে অনেকটা দক্ষিণ ভারতের এল্লম্মার মূর্তি। এল্লম্মার মূর্তিতে দেখা যায়, শুধু মুখটাই দর্শনীয়। বাকী দেহটা যেন মাটির নিচে ঢাকা রয়েছে।বৌদ্ধ শিল্পেও দেখা যায় মহাপৃথ্বী অথবা পৃথিবী মাটি থেকে উঠে বুদ্ধের অশ্বকে ধরে রাখছে।

মায়ের চিন্তা দ্রাবিড় মানসেই বেশি। তাদের কাছ থেকেই হিন্দু ধর্মে এসে প্রবেশ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। এই পৃথ্বী মাতার মত হিন্দুদের অন্যান্য

মাতৃদেবতাও কল্যাণময়ী ও ভয়ঙ্করী উভয় রূপেই দেখা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার পৃথ্বী দেবী বা মাঙ্গিয়েরই একটি রূপ, যেমন, 'দুর্গা, 'কালী ইত্যাদি। মধ্যপ্রদেশে গ্রামদেবতা অর্থাৎ 'দেবী' পৃথ্বী মাতারই প্রতীক। তিনি মহামারীরূপে রোগ শোক ছড়াতেও পারেন, দূর করতেও পারেন।

২। **ধিষণা** : ইনি প্রাচীন এক বৈদিক দেবী। ধিষণা অর্থ প্রাচুর্যের দেবী।

৩। **ধূমাবতী** : দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য সতী শিবকে ভয় দেখাতে যে দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করেছিলেন তারই এক মূর্তি হল ধূমাবতীর মূর্তি। ধূমাবতী মহাকালের নির্মমরূপিণী শক্তি। ধূমাবতী অর্থ মোহনাশিনী দেবী। যে পটভূমিতে ধূমাবতীর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ : নিষ্ঠুর নির্মম মরুভূমির মত সময়ের হাহাকার চলেছে। তাতে নিরাভরণা বৃদ্ধা বিধবার বেশে কাকধ্বজ যমরথে বসে রয়েছেন ধূমাবতী। আশেপাশে মৃত্যুর বার্তাবহ কালো কাক। চতুর্দিক নির্মম মহাকালের মত কর্কশ। কুলাহাতে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক অমঙ্গলের প্রতীক ধূমাবতী। তান্ত্রিকরা ধূমাবতীর অর্থ বর্ণনা করেছেন এইভাবে : ছিন্নমস্তায় আছে অন্নপূর্ণার জগৎপালন রীতি ও ভোগ। কিন্তু ভোগই তো শেষ কথা নয়। ভোগ শেষ হলেই হয় প্রলয়। তাই ছিন্নমস্তার পর শক্তি হলেন প্রলয়রূপিণী ধূমাবতী। জগতের ভোগ শেষ হলে জরাজীর্ণা ভগবতী আসেন বৃদ্ধাবেশে, কাকধ্বজ যমের প্রলয়রথে চ'ড়ে, ক্ষুধাতুরা ও বিস্তৃতবদনা হয়ে। সকল সৃষ্টিকে কুলায় সংগ্রহ করে তাই নিজের উদর পূর্ণ করেন তিনি। ধূমাবতী তাই প্রলয়রূপিণী ভৈরবীর ভয়ঙ্করী মূর্তি।

৪। **ধাতৃ** : মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীকে ধাতৃরূপে আহ্বান করা হয়েছে। এখানে তিনি পালিকা মা হিসেবে চিহ্নিতা। কিন্তু ঋগ্বেদে ধাতৃ ইন্দ্র বা বিশ্বকর্মণের উপাধি। স্বতন্ত্র এক দেবতা হিসেবেও তাঁর কল্পনা আছে যেখানে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, চন্দ্র ও সূর্যের স্রষ্টা। বেদপরবর্তী যুগে ধাত্রীকে স্রষ্টা ও বিশ্বরক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৫। **ধারণী** : মধ্যযুগের বঙ্গদেশে যিনি বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, এমন করে তাঁকে অর্থাৎ শক্তিকে কল্পনা করা হয়েছিল।

৬। **ধৃতি** : ভারতবর্ষে বিভিন্নস্থানে মহাদেবীকে যে যে নামে স্মরণ করা হয়েছে— পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে তারই একটি তালিকা পাওয়া যায়। বিষ্ণু সাবিত্রী দেবীকে পরম ভক্তিভরে স্তব ক'রে বিভিন্ন স্থানে যে নাম ও রূপে তাঁকে স্মরণ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, পিণ্ডারক নামক স্থানে তিনি ধৃতি নামে অধিষ্ঠান করেন। সুতরাং ধৃতি ভারতীয় মহাদেবীরই এক নাম।

৭। **ধ্বনি বা ধরা** : সম্ভোদ্ধার-এ ভারতীয় মহাদেবীই ধ্বনি বা ধরা নামে বিরাজ করছেন।

৮। **ধূম্রিনী** : কামরূপের কামগিরিকে দশমহাবিদ্যার স্থান বলে মনে করা

হয়। সেখানে দশমহাবিদ্যার নাম এইভাবে দেওয়া হয়েছে— যেমন ভৈরবী, কামাখ্যা (ক্ষেত্র দেবতা), প্রচণ্ডচণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা), মাতঙ্গী, ত্রিপুরা, অম্বিকা, বগলা, ভূবনেশী (ভূবনেশ্বরী) ও ধুমিনী (ধূমাবতী)। সুতরাং ধুমিনী স্বতন্ত্র নামে উচ্চারিত হলেও আসলে তিনি ধূমাবতীই। কিন্তু দশমহাবিদ্যায় যে নামে সাধারণতঃ তাঁদের ডাকা হয় তা হল কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। অনেক সময় কমলাকে সুন্দরী ও বগলাকে বগলামুখী বলে উচ্চারণ করা হয়েছে।

ন

১। নানী : ভারতবর্ষে মহাতীর্থ একান্ন শাক্তপীঠের প্রথম পীঠ হিংলাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয় নানী। স্থানীয় লোকেরা উচ্চারণ করে বিবি নানী। এ নামের অর্থ পিতামহী মাতা। ইনিই প্রকৃত পক্ষে সেমিটিক দেবী ননিয়া বা ঋগ্বেদের ননয়া। এ কথার অর্থ মাতৃদেবতা। প্রাচীন সিরিয়া, পার্সিয়া, আর্মেনিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে তাঁকে বলা হত অনইতি, অনিয়, অনাঁতিস, তনইস্‌ ইত্যাদি। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় দেবী ননাও তিনিই। উরুক-এ প্রথম মন্দিরের তিনি দেবী ছিলেন।

হিংলাজ পাহাড়ের একটি গহ্বরে দেবীর অধিষ্ঠান। বলি দেওয়া পশুর রক্তে স্থানটি রঞ্জিত হয়ে থাকে। পাহাড়ের উপর দেবীর যে মন্দির আছে তার কোন স্থাপত্য গৌরব কিছু নেই। একটি শিলাসনের নিচে গহ্বরে মরী বা নানীর আসন। তবে দেবীর কোন মূর্তি আছে বলে মনে হয় না। হিংলাজের এই বেদীকে বলে 'হিংলাজ জরিয়াং'। গুজরাটের আশাপূর্ণা দেবীর কাপড়ি ভক্তেরাই এখানে বেশি যান। তাদের প্রধান যদি রাত্রি শেষ হয়ে যাবার পরও সেখানে থাকেন তবে দেবী তাদের ডুবিয়ে মারেন বা যে-কোন প্রকারে ধ্বংস করেন।

এই দেবীরই দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কোঙ্কণ অঞ্চলে কোলাবা জেলার পাহাড়ী চেউল-এ আর একটি বেদী আছে। এই দেবী হিন্দুদের কাছে হিংলাজ দেবী নামে পরিচিতা। গল্প আছে যে, মারবারের উগ্রপ্রভু নামে এক রাজা এই দেবীর কাছ থেকে একটি তরবারি লাভ করে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত সারা দক্ষিণদেশ জয় করেছিলেন। তিনি পশ্চিম ভারতের এমনকি উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলা পর্যন্ত বহু গৃহের গৃহ-দেবতা হিসেবে বিরাজ করেন। খারওয়াররা দেবীর উদ্দেশে পাঁঠা বলি দিয়ে প্রার্থনা করে যে, হে দেবী হিংলাজ, আমাদের শত্রুদের ধ্বংস কর। পশ্চিমবঙ্গের দশনামী গোসাইরাও এখানে পূজা দিতে যান।

হিংলাজে মাতৃশক্তি অশুভ রূপে রয়েছেন বলে বিশ্বাস। একে নগইয়াও বলা

হয়। নগইয়া অর্থ অগ্নিমাতা। হিংলাজে মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে নিসৃত অগ্নিশিখাই এই দেবী। এখানে একটি কুয়ো আছে। বগ্ বগ্ করে সেই কুয়ো থেকে শব্দ ওঠে। হিন্দু-তীর্থযাত্রীরা তখন এখানে গুপুরি, রসুন, লবঙ্গ, এলাচ, নারকেল ইত্যাদি ছুঁড়ে দেয়।

হিন্দু-তান্ত্রিকেরা এই দেবী সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পাহাড়ের গহ্বরে অর্থাৎ কোটরে বাস করেন বলে তার নাম কোট্টরীশা। তিনি জ্যোতিরূপে বিরাজিতা। এই জ্যোতিরূপে অবস্থানের একটা শাস্ত্রীয় তাৎপর্যও বের করেছেন কেউ কেউ। ঋগ্বেদে স্পন্দন বা শব্দের অন্তর্নিহিতা দেবী হলেন প্রকৃতি বা শক্তি। তাঁর নাম বাক্, গৌ, গাভী ইত্যাদিও। বাক্ গাভীর প্রাথমিক স্ফূরণ ধ্বনি হল হিঙ্— অর্থাৎ Big Bang -এর বিস্ফোরণের শব্দ বাম্ বা ওঁ। সামগানে প্রথমেই এই হিঙ্ শব্দ উচ্চারণের বিধান আছে। অগ্নিও প্রজ্জলিত হবার মুখে শব্দ করে হিঙ্। হিঙ্ শব্দ উচ্চারিত হবার পর অগ্নি সর্বদা ক্রিয়াযুক্ত থাকে। সেই জন্য অনেকে অগ্নিকে প্রকৃতি স্বরূপা মনে করেন অর্থাৎ নারী বা শক্তি। এই অগ্নি সর্বদা ঋত্ ও ছন্দগতি পূর্ণ হয়ে লাস্য বিলাসে যুক্ত থাকেন। লাস্যবিলাস রাজ্যের অধিশ্বরী হিসেবেই তিনি হিংলাজ বা হিঙলাজ। অন্ধকার পর্বত গহ্বরে বিদ্যুতের ন্যায় স্ফূরজোতি হয়ে তিনি দৃষ্ট। যেখানে এ স্থান অবস্থিত তা লাসবেলাস রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। হয়তো লাসবেলাস শব্দটি লাস্য বিলাসেরই অপভ্রংশ। জীবের ব্রহ্মরন্ধ্রপথে প্রাণশক্তির যে তড়িৎ তরঙ্গবৎ লাস্যলীলা— দেবী হিংলাজ হলেন তারই প্রতীক। ঐতিহাসিকদের মতে ইনিই হলেন কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় অঙ্কিত নন্ দেবী। একদা মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এঁর পূজা হ'ত। কারও মতে ইনিই হলেন সুমেরীয় ইন্নিনি, প্যালেস্টিনীয় নিনা ও ঋগ্বেদের নন্দা। ইনিই হলেন ব্যাবিলনের ইশ্তার এবং অথর্ববেদের রূপদেবী ইন্দ্রাণী। অথর্ববেদে বাক্‌কে বলা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির অধিশ্বরী পিত্র্যারাষ্ট্রী। রাষ্ট্রী হল রাজ্ঞী, যাকেই বলা হয় মুসলিম শব্দে শাহী বা শাহি। উচ্চারণ ভেদে অনেকে বলেন কাই। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে দেবতা বালের প্রকৃতির নাম ছিল বালিৎ বা শাইবেলী। উচ্চারণ ভেদে কাইবেলি। কেউ বলেছেন সিবিলি। ঋগ্বেদের ইন্দ্র ছিলেন 'সহসঃ নুনু' অর্থাৎ সাহস বা বালের পুত্র শচ। তাঁরই প্রকৃতির নাম শচী। এই ভাবে বালের প্রকৃতির নাম বালুচি। এই শচী বা বালুচীর স্থানই বালুচীস্তান, ইন্দ্রাণী বা নানীর দেশ।

হিঙ্‌লাজে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের কাছে শোনা, পাহাড়ের নিচের দিকে সুড়ঙ্গ আছে। এই সুড়ঙ্গ হল যোনি স্বরূপা। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যা নিয়ে যাওয়া যায় তাই প্রসাদ হয়ে যায়। এই ভাবেই সুড়ঙ্গ পথে ঘুরে এসে বহু সন্ন্যাসী জটায় ধারণ করেন প্রসাদী গুপুরী বা স্বর্ণমক্ষী নামে এক ধরনের ধাতুদ্রব্য। অর্বাচীন কালে মন্দিরে যে কালিকা বিগ্রহ বসেছে তার কোন মানে নেই।

২। **নীথ বা নীৎ ঃ** ইনি এক প্রাচীন মিশরীয় দেবী। মনুষ্য আকৃতিতেই এঁকে দেখানো হ'ত। তাঁর হাতে থাকত তীর ধনুক। কপালে থাকত আড়াআড়িভাবে দুটো তীর। মাঝখানে কোন কিছু গুটিয়ে রাখা। অনেক সময় কপালে তাঁতের মাকুও থাকত। কিন্তু বুনন কার্যের সঙ্গে এই দেবীর কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। হয় তো ভুল করে একটা বসানো হত গুটিয়ে রাখা কোন কিছুকে বোঝাতে। গুটিয়ে রাখা জিনিষটি হয়তো কোন পশুচর্ম। এতে মনে হয় তিনি হয়তো শিকারের দেবী বলে গণ্য হতেন। মিশরের প্রথম রাজবংশের কাছে নীৎ যে খুব প্রিয় দেবী ছিলেন তার প্রমাণ রাজবংশের অনেকেই তাঁর নামে নাম রাখতেন যেমন, নীৎ হোটেপ, মের নীৎ ইত্যাদি। তিনি হয়তো প্রাচীন লিবিয়াবাসীদের কোন দেবতা ছিলেন। পিরামিডের যুগে নীৎ-এর পুরোহিত্দের সর্বত্রই প্রায় দেখা যেত। লিবীয় মূর্তিতে তাঁর প্রতীক উল্কি চিহ্নে আঁকা থাকত। মিশরের বদ্বীপ অঞ্চল, সইস, অফ্রিকি ও জহু-এ তাঁর পূজার খুব প্রচলন ছিল।

মিশরে গ্রীকদের শাসন কালে বদ্বীপ অঞ্চলের সইস-কে দেবী আথেনের মাতৃনগরী বলা হ'ত। অনেকে মনে করেন, সইস-এর দেবী নীথ বা নীৎ থেকেই এই দেবী এসেছেন। তবে আথেন নামে তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রীক ভাস্কর্য-রীতি অনুসারেই এসেছিলেন, মিশরীয় কোন প্রভাব তার উপর পড়েনি। বরং তাঁর রণদেবী মূর্তির জন্য অনেকে তাঁকে মিশরীয় দেবী থোয়েরিস বা তউরৎ-এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

ইরানের শাসক ক্যাম্বিসেস মিশরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার পর এই দেবীকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নিজে মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলের সইস-এ গিয়ে এই দেবীর পূজো দিয়েছিলেন।

নীথ্ বা নীৎ-কে অনেকেই প্রাচীন মিশরের এক সৃষ্টিকারিণী দেবী হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি আছে, 'যে মা সূর্যের জন্ম দিয়েছিলেন।' সুতরাং আদিতে তিনি সৃষ্টিকারিণী কোন দেবী ছিলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি বুনন করেছিলেন, এটা বোঝাবার জন্যই তাঁর কপালে তাঁতের মাকু দেওয়া হত।

তবে নীৎ-এর বহু ধরনের ক্রিয়া ছিল। যে জন্য অন্যান্য দেবতার নামের সঙ্গে যুক্ত করেও তাকে ডাকা হ'ত, যেমন নীৎ-আমোন।

অনেকে মনে করেন, এই দেবী মিশরে প্রাক-রাজবংশীয়। গোষ্ঠীতন্ত্রের কালেই বদ্বীপ অঞ্চলে এঁর পূজো হ'ত। আদিতে অনড় কারণ সমুদ্রের ব্যক্তিরূপ ছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে তাঁকে তীর ধনুক দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এতে তাঁর মধ্যে যেমন ফুটে উঠে রণদেবী মূর্তি (দেবী দুর্গা বা আথেন-এর মত) তেমনই ফুটে উঠে শিকারের দেবীর চিত্র।

৩। নেখবেৎ :- ইনি প্রাচীন মিশরের প্রস্ফুটনের দেবী। ঋগ্বৈদিক ঋষিদের মত প্রাচীন মিশরীয় দার্শনিকেরাও প্রকৃতির প্রতিটি কাজের জন্য কোন এক মননশীল শক্তিকে দায়ী মনে করতেন।

৪। নেখেবৎ : নেখেবৎ হল প্রাচীন মিশরের শকুনী দেবী। হিয়েরকোন্-পোলিসকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ মিশরীয় যে রাজ্য গড়ে উঠেছিল নেখেবৎ ছিলেন তারই দেবী। পরবর্তী কালে দক্ষিণ মিশরের প্রতীক হিসেবে একে দেখানো হ'ত। শকুনী মিশরের রাজা ও পিরামিডস্থ আত্মাকে রক্ষা করে বলেও বিশ্বাস ছিল। অনেক সময় সর্প-আকারে তাঁকে ভয়ঙ্করী দেবী হিসেবেও দেখা হ'ত। তবে তখন নাম হ'ত নেখেবস্ত।

সর্প ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে অগ্নি বা সূর্য গোলকের প্রতীক। তাকে দেবতার জ্বলন্ত চক্ষুরূপেও কল্পনা করা হ'ত। দেবতার দুই চক্ষু ছিল সূর্য দেবতার দুই কন্যা স্বরূপা। মিশরীয় রাজা রাণীদের মুকুটে এই জন্য সর্প শোভা পেত। এই সর্পই 'নেখেব্' নামে উর্ধ্ব ও নিম্ন মিশরের অভিভাবিকা শক্তি হিসেবে গণ্য হতেন।

৫। নেমন : নেমন হলেন প্রাচীন কেল্টদের এক দেবী। তিনি ছিলেন যুদ্ধের দেবী। তার স্বামী নেট ছিলেন বর্বর গলদের যুদ্ধের দেবতা।

৬। নেফেবেৎ : নেফেবেৎ ছিলেন প্রচীন মিশরের রণদেবী। তিনি এবং তার ভগ্নী উয়াচেৎ দেবতাদের শত্রুদের ধ্বংস করতেন বলে বিশ্বাস ছিল। তিনি কিছুটা ভারতীয় চামুণ্ডার মত।

৭। নেফ্থাইস : নেফ্থাইস হলেন প্রাচীন মিশরীয় দেবী আইসিস-এর ভগ্নী। আইসিস বিবাহ করেছিলেন মিশরের ন্যায়পরায়ণ রাজা ও উর্বরা শক্তির দেবতা স্বরূপ অসিরিসকে। নেফ্থাইস ছিল অসিরিসের কনিষ্ঠ দুষ্ট ভ্রাতা সেট-এর পত্নী। সেট ছিলেন অনুর্বর মরুভূমী ও মরুপ্রাণীদের দেবতা। সেই অর্থে নেফ্থাইস ছিলেন মরুভূমি ও মরু-পশুদের দেবী। তবে লেটোপোলিস, এড্ফু, ডিওসপোলিস, পর্ব, ডেনডেরেহ্ প্রভৃতি স্থানে তাঁরও পূজো হ'ত।

তাঁরই এক নাম নেব্হেট— অর্থাৎ প্রাসাদের দেবী। এতে মনে হয়, আদিতে তিনি অসিরিসেরই পত্নী ছিলেন। আইসিসের চিন্তা মিশরীয়দের মনে আসার পর তাঁকে সরে যেতে হয়। তখন তিনি আইসিসের বিপরীত প্রান্তে এসে দাঁড়ান। এবং অসিরিস-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেট-এর পত্নীতে পরিণত হন। কিন্তু সেট আসিরিসকে হত্যা করলে অসিরিসের জন্য তিনি শোকার্তা হন।

আইসিস-এর মত নেফ্থাইস-ও ছিলেন- পৃথিবী দেবতা সেব ও আকাশ দেবী নুটের কন্যা।

নেফ্থাইসকে প্রাচীন মিশরীয়েরা পশ্চিম দিগন্তের সঙ্গেও তুলনা করতেন।

কিংবা ওঁকে সন্ধ্যা বলে চিন্তা করা হ'ত। শৃগাল দেবতা অনুবিসের তিনি মা ছিলেন বলেও মনে করা হয়। অনুবিস ছিলেন অন্ধকার পরলোকের দেবতা। কেউ কেউ নেফ্‌থাইসকে সূর্যাস্তের সঙ্গে তুলনা করেন। সেই জন্যই সেট অর্থাৎ অন্ধকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল বলে কল্পনা করা হয়। আইসিস, নেফ্‌থাইস, হেকি ও মেসখেনি প্রমুখ দেবী অনেক সময় ধাত্রীর মতও কাজ করতেন। কখনও নর্তকীর ছদ্মবেশে এঁরা এসে উপস্থিত হতেন। এক মুঠো বার্লির জন্যও এরা শ্রম দিতেন। ধাত্রী হিসেবে এঁরা কাজ করার পর মহিলারা ১৪ দিনের জন্য পবিত্র হয়ে যেতেন।

৮। নেপ্রিৎ : ইনি হলেন প্রাচীন মিশরীয় এক দেবী। অনেক সময়ই তিনি মিশরীয় শস্যদেবতা নেপ্রির ভূমিকা পালন করতেন। সুতরাং নেপ্রিৎ-কে প্রাচীন মিশরীয় শস্যদেবী বলা যেতে পারে।

৯। নেরিও : ইনি প্রাচীন রোমানদের এক দেবী। একে মঙ্গলের অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের পত্নী হিসেবেও মনে করা হয়। কিন্তু নেরিও মার্টিস হিসেবে তিনি বরং মঙ্গল গ্রহের সাহস ও শৌর্যের প্রতিমূর্তি। ভারতীয় শক্তির মতন তিনি।

১০। নের্থাস : ইনি হলেন প্রাচীন টিউটন জাতির পৃথ্বী মাতা। জার্মান ঐতিহাসিক টাসিটাস অন্ততঃ সেই রকমই মনে করেছেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল ফ্রে। এই নের্থসই উত্তর অঞ্চলে ন-জোরো নামে পুরুষ দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে দেবতা ফ্রের পিতার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

টিউটনরা এই নের্থাসকে বসন্ত কালে পুজো করতেন, আমরা যেমন বাসন্তী পুজো করি। এই দেবীর কাছে নরবলি দেওয়া হ'ত। বাল্টিক সাগরের তীরে সাতটি জার্মান উপজাতি প্রতি বসন্তে এই দেবীর পুজো করতেন। পূজারী নানা স্থানের উপর দিয়ে নের্থাসের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতেন। উদ্দেশ্য ছিল সারা অঞ্চলকে উর্বর করে তোলা। যখন এই গাড়ি-যাত্রা শেষ হ'ত তখন যে-সব ভৃত্য এই গাড়ির সঙ্গে যেত তাদের দেবীর কাছে বলি দেওয়া হ'ত।

পৃথিবীকে মা রূপে চিন্তা করার ধারা টিউটনিক বিশ্বাসে অতি প্রাচীন এক ব্যাপার। নানা জিনিষে মাতা ধরণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে তারা পুজো করত। মাতা পৃথিবীর প্রাণশক্তিকে পাথর জাতীয় বা ধাতু জাতীয় জড়পদার্থে আরোপ করেও পুজো করা হ'ত। ইংরেজরা পর্যন্ত এর পুজো করত। দক্ষিণ পশ্চিম বাল্টিক অঞ্চলে এঁর পুজোর ধারা অত্যন্ত প্রবল ছিল। একটি দ্বীপের পবিত্র কুঞ্জে এই দেবীর থান ছিল। সেখান থেকে একটি মন্ত্রপুত কাপড়ে ঢাকা গাড়িতে চড়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন।

একজন পুরোহিতই শুধু এই গাড়ি স্পর্শ করে থাকতে পারত। তাঁর পবিত্র থানে দেবীকে শুধু ঐ পুরোহিতই দর্শন করতে পারতেন। দেবীর গাড়ি টেনে নিত

গরুতে। বসন্তকালেই ঘটনাটি ঘটত। এই সময় টিউটনরা যুদ্ধবিগ্রহ করত না। অবশেষে দেবী মানুষের সান্নিধ্য থেকে আবার তাঁর পবিত্র কুঞ্জে ফিরে যেতেন। একটি পবিত্র হ্রদে তিনি পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতেন। যে ভৃত্যেরা তাঁকে এখানে স্নান করাতো তাদের কাজ হয়ে গেলে সেই পবিত্র হ্রদের জল তাদের গ্রাস করে নিত।

ভ্রাম্যমান আনন্দমেলা জাতীয় উৎসব, যাকে বলে কার্নিভাল, তা আজও দেবী নের্থাসের স্মরণিকা হিসেবে কাজ করে থাকে।

বসন্তোৎসব শেষে পবিত্র হ্রদে দেবীর বিসর্জনের ঘটনা থেকে মনে হয়, জার্মানদের মধ্যে এই দেবীর কোন ধরনের মূর্তি ছিল। মূর্তি না থাকলেও এক ধরনের প্রতীক ছিল নিশ্চয়ই। প্রাচীন সব মানুষই প্রতিমার মাধ্যমে অতীন্দ্রিয়ের পুজো করতেন। তাই বিশ্বশক্তি অসীম এক মহিমময়ী ভঙ্গীতে তাদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন। প্রতিমারূপের মধ্য দিয়ে এসেছিল অপ্রতিম অনন্ত। প্রত্নপ্রস্তর যুগের ইউরোপে এমন কয়টি মূর্তি পাওয়া গেছে; প্রাচীন মানুষের হাতে তৈরি হলেও এগুলি অত্যন্ত আবস্ট্রাক্ট মূর্তি। এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে যে ভাব তা উর্বরা শক্তি ও মাতৃত্বের পরিচায়ক। উর্বরা হলেই মা জন্ম দেন এবং সতেজ হলেই প্রতিপালন করেন। এই জন্যই মূর্তিগুলির সেই সব অঙ্গই পুষ্ট যা জীবন ধারণে সাহায্য করে, যেমন স্তন। জীবন দান করার জন্য যে উর্বর ক্ষেত্র— উদর তা হল স্ফীত। এবং জন্মদাত্রী বলেই মা হলেন উলঙ্গ। এই মূর্তিগুলির একটি পাওয়া গেছে অস্ট্রিয়ার ডানিউব উপত্যকাতে। বাকী দুটি দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের মেনটন নামক স্থানে। সবই মাতৃমূর্তি, বিশ্বজননীর প্রতিমা। সেই জন্যই স্ফীতোদরা, পুষ্টস্তনা এবং একই সঙ্গে বলিষ্ঠ নিতম্বা, অর্থাৎ উর্বরা শক্তি ও প্রতিপালিকা শক্তির প্রতীক। এরই মধ্যে একটি মূর্তি দেবী নের্থাসের ব'লে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। টাসিটাসের বর্ণনাতেও দেখা যায় যে, উৎসব যানে তিনি দেবীর মূর্তি বহনের কথা বলছেন। অনেক সময় লাঙলকেই দেবীর প্রতীক করে বহন করা হত। মহিলারা এই সময় কটিবস্ত্র পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র দেহাবরণ পরে আলুলায়িত কেশে উন্মাদের মত নৃত্য করতে করতে যেত।

নের্থাস উৎসবের সঙ্গে কিছুটা তুকতাক জাতীয় জাদুক্রিয়াও জড়িত ছিল।

১১। **নিদ্রা কালরূপিণী :** নিদ্রা কালরূপিণী হল ভগবতী দুর্গারই আর এক নাম। এই নামে তাঁকে ভগবান বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে জুড়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। হরিবংশে গল্প আছে যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে নাশ করার জন্য কংস যখন উন্মাদ হয়ে উঠেছেন, তখন ভগবান বিষ্ণু পাতালে প্রবেশ করে সময় রূপে ঘুমন্ত শক্তি নিদ্রা কালরূপিণীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্য করা হলে দেবী ত্রিলোকে পূজিতা হবেন বলেও প্রতিশ্রুত দেন। তিনি যশোদার গর্ভে নবম সন্তান হিসেবে জন্ম নেবেন— এবং একই সময় ভগবান বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে অষ্টম

সন্তান রূপে জন্ম নেবেন। বিষ্ণু যশোদার গৃহে নীত হবেন এবং নিদ্রা কালরূপিণী দেবকীর কাছে চলে আসবেন। তাঁকে পা ধরে কংস আছড়ে মারার চেষ্টা করবে। কিন্তু তিনি আকাশে উঠে গিয়ে চিরন্তন স্থান লাভ করবেন। ইন্দ্র তাঁকে নিজ ভগ্নী কৌশিকী হিসেবে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে স্থাপন করবেন। শেষপর্যন্ত তিনি বিন্ধ্য অরণ্যে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিতা হবেন। সেখানে তিনি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ ক'রে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুরকে বধ করবেন। পশুবলি দিয়ে ভক্তেরা তাঁর পূজা করবেন।

১২। নিঙ্গল : প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় হর্‌রান নামে একটি স্থান ছিল। বেল হর্‌রান ছিলেন তার অধীশ্বর। তাঁর স্ত্রীর নাম নিঙ্গল। নিঙ্গল অর্থ মহীয়সী নারী, সম্রাজ্ঞী ইত্যাদি। হররানের পুত্রই ছিলেন শম্ বা সূর্য দেবতা। কারও কারো মতে দেবী ইশতারও ছিলেন তাঁরই সন্তান। সেই অর্থে নিঙ্গল দেবী ইশতারেরও জননী।

১৩। নিনহ্ বুরসিলড়ু : ইনি ছিলেন প্রাচীন মিশরীয় স্বর্গের দেবী। জাদু মন্ত্রেও তিনি ছিলেন রাণী। জলপূর্ণ একটি ঘট ছিল তাঁর প্রতীক। আমাদের দেশেও অনেক সময় ঘট প্রতীকে বহু দেবীর পূজো করা হয়।

১৪। নিন্ কি : প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের জলদেবতার নাম ছিল ইয়া। প্রাচীন সুমেরীয়রা এঁকে বলত এনকি অর্থাৎ পৃথিবী-দেবতা। ব্যাবিলনীয়রা তাঁকে সুমিষ্ট জলের দেবতা হিসেবেই কল্পনা করত। তাঁরই পত্নীর নাম নিন্-কি অর্থাৎ পৃথিবীর দেবী। গভীর সমুদ্রের রাণী হিসেবেও তাঁকে সম্বোধন করা হ'ত।

১৫। নিন লিল্ :- প্রাচীন ব্যাবিলনের নিপ্পুরের দেবতা এন্ লিলের তিনি ছিলেন সহধর্মিণী। তাঁকে পাতালের দেবী বলা হ'ত। আবার স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিশ্বরী হিসেবেও ডাকা হ'ত। তাঁর একটি উপাধি ছিল— নিন্-হর-সগ অর্থাৎ পর্বতের দেবী। সেক্ষেত্রে তিনি পার্বত্য দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, যেমন ছিলেন আমাদের দেবী দুর্গা। নিন্-লিল্‌কে 'বেলিৎ মাতাতে' অর্থাৎ ভূমির দেবী হিসেবেও মানা হ'ত। আবার 'বেলিৎ ইলে'ও বলা হ'ত অর্থাৎ দেবতাদের দেবী। তাঁকে শুধুমাত্র মাতৃদেবী হিসেবেও ডাকা হত। নিন্ লিলের আর এক উপাধি ছিল নিন্ মহ্— অর্থাৎ মহীয়সী। এই নামে এ-মহ্-তে তার একটি মন্দিরও ছিল। তিনি শুধু মাত্রই নির্ভেজাল দেবী অর্থাৎ 'বেলিৎ' ছিলেন। তাঁকে বায়ুর অধিশ্বরীও বলা হ'ত। এই হিসেবে নিপ্পুরে তাঁর একটি মন্দিরও ছিল, নাম— এ-গু-ইব্। কিশ-এর-এ-মে-তে উর-সগ-এ 'নিন-হর-সগ' নামে এই দেবীর একটি মন্দিরও ছিল। ইন্নিন তাঁরই এক নাম ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরই আর এক নাম ছিল ইশতার। ব্যাবিলনের ইশতারই দেবী নিন্ লিল।

ব্যাবিলনে এন-লিল ছিলেন পৃথিবী দেবতা। তবে তাঁর পূজার আগে এক পৃথ্বী মাতার পূজা করে নেওয়া হ'ত। ইনিই এন-লিলের পত্নী নিন্ লিল। অনেক

সময় তাকে ডমকিন অর্থাৎ পৃথ্বী-দেবী নামেও ডাকা হত। ডমকিন হিসেবে তিনি ছিলেন দেবতা ইয়ার পত্নী। সেমেটিকদের মহামাতৃকা অশতিট, অত্তরতিস, ইশতার সবাই ছিলেন পৃথ্বী-মাতা। তাঁরা প্রত্যেকেই উর্বরাশক্তি, মাতৃত্ব, জন্মদাত্রী, মানব জননী ইত্যাদি নামে অভিহিতা ছিলেন।

১৬। নিন্ তু : প্রাচীন সুমেরীয় অক্কাদিয়ানদের মাতৃদেবতার নাম ছিল নিন্ তু। তিনি কয়েকটি নরগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন। মহাপ্লাবনে সেই মানব প্রজাতি ধ্বংস হলে তিনি ক্রন্দনাতুর হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং নিন্ তু ছিলেন মানব জননী।

১৭। নির্মলি : আফগানিস্তান ও চিত্রল, বদখশান ও কুনর উপত্যকার মধ্যে কাফিরিস্তান অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী কাফিরিদেরই এক দেবীর নাম নির্মলি। সন্তানসম্ভবা ও রুগ্না মহিলাদের তিনি রক্ষয়িত্রী দেবী। আমাদের ষষ্ঠী দেবীর মত শিশুসন্তানদের উপরও তিনি নজর রাখেন। মহিলারা তাঁর রক্ষণাধীনে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে।

১৮। নির্ঋতি : ইনি প্রাচীন বৈদিক দেবী। তিনি অশুভ শক্তিরই দেবী হিসেবে প্রসিদ্ধা। কালী ও দুর্গা মূর্তিকে নৃতত্ত্ববিদেরা এই দেবীরই পরবর্তী কালে রূপান্তরিতা রূপ বলে মনে করেন। মৃত্যুর দেবী হিসেবেও তিনি চিহ্নিতা। তবে বৈদিক সাহিত্যে তাঁর খুব উল্লেখ নেই। শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নির্ঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁকে কৃষ্ণা ও ঘোরা বলা হয়েছে। যেমন, 'কৃষ্ণা হি ত্তম আসীনথ কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতিঃ ৭/২/৭ এবং 'ঘোরা বৈ নির্ঋতিঃ' ৭/২/১১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪/১৭) নির্ঋতি দেবীকে পাশহস্তা বলা হয়েছে। নির্ঋতি দেবীর এই হস্তস্থিত পাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে এই দেবীর আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

১৯। নিসব : ব্যাবিলনের উদ্ভবের পূর্বে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় বরসিপ্-এর নাগ-দেবতা ছিলেন নবু। নবু শব্দের অর্থ ঘোষক। আমাদের দেশের বিধাতার মত তাঁকে কল্পনা করা হ'ত। লিখনশৈলীও এবং বিজ্ঞানেরও তিনি দেবতা ছিলেন। উর্বরা শক্তির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই পত্নীর নাম নিসব। নিসব ছিলেন শস্যদেবী।

২০। নিস্কে অব : বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন তাতারদের অঞ্চলের এরজা উপজাতিদের দ্বারা পূজিতা এক দেবী হলেন নিস্কে-অব। নিস্কে শব্দের অর্থ স্রষ্টা। এদের দেবতা এরজা নিস্কে বা নিষ্কে পাস-এর পত্নীর নাম নিস্কে-অব বা মা নিস্কে। মহিলারাই গৃহে এর পূজো করতেন। বর্তমানে কুমারী মেরী তাঁর স্থান অধিকার করে নিয়েছেন।

২১। **নজই :** ইনি ইন্দোনেশীয় এক দেবী। লোকের ধারণা, তিনি সমুদ্রের রাণী। যবদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে গভীর সমুদ্রের নিচে মনোরম এক প্রসাদে বাস করেন। মাটির নিচের প্রাণীদের উপর তিনি শাসন করেন। এই দেবীর নামে পুজো দিয়ে তবে যবদ্বীপবাসীরা সমুদ্রের নিচে নামে। যবদ্বীপের দক্ষিণ সমুদ্রকূলে এখানকার অধিবাসিরা উপকূলে শুয়ে থেকে ঘুমোবার চেষ্টা করে— যাতে দেবী তাদের কোন প্রত্যাদেশ দেন। যারা পাহাড়ের ফাটলে যাযাবর পাখির বাসা সংগ্রহ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে তারা এই দেবীকে বিশেষভাবে পুজো করে নেয়। এই জন্য এখানে দেবীর উদ্দেশে একটি মন্দিরও তৈরি করা হয়েছে। সেখানে রীতিমত বলি দিয়ে পুজো দেওয়া হয়।

২২। **নর্সিয়া :** ইনি প্রাচীন রোমানদের এক দেবী। ভাগ্যের দেবী নামে প্রসিদ্ধা। এখানে ভোলসিনীতে মন্দিরের দরজায় পেরেক ঠুকে বছর গণনা করা হ'ত।

২৩। **নোউব্‌ :** ইনি প্রাচীন মিশরের স্বর্ণধাতুর দেবী হিসেবে পূজিতা হতেন। রাজশাসনকালে মিশরের মধ্য অঞ্চলে এঁর পুজো হ'ত। তবে তাঁকে দেবী হ্যাথরের সঙ্গেও এক করে দেখানো হ'ত। হ্যাথর ছিলেন সৌন্দর্য, নৃত্য ও অলংকারের দেবী।

২৪। **নুমেরিয়া :** ইনি প্রাচীন রোমান দেবী। মহিলাদের সন্তান প্রসবকালে এঁকে স্মরণ করা হ'ত। প্রসূতির প্রসবগৃহে এই সময় এক ধরনের মোম জ্বলত। এই মোমের আলো অশুভ শক্তিকে দূরে রাখে বলে বিশ্বাস। আমাদের দেশ গাঁয়ের আতুর ঘরে এমনটি ঠিক আজও করা হয়। হয়তো মা ষষ্ঠীর সঙ্গে এঁর কিছুটা সামঞ্জস্য আছে।

২৫। **নুট :** প্রাচীন মিশরে আকাশকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে দেখা হ'ত। তাঁর নাম ছিল নুট। মৃত্তিকাকে মনে করা হ'ত পুরুষ হিসেবে। তাঁর নাম ছিল টো। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে এ অঞ্চলে সেমেটিক প্রভাব পড়লে, যেমন, হিব্রু, তার লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটে। আকাশ তখন হয় পুরুষ (শাময়ীম) পৃথিবী হয় মহিলা (আদামাহ্‌)।

মিশরীয় সৃষ্টি-কাহিনীতে সর্বোপরি ধরা হয়েছে কারণ সলিলকে— যার নাম নু বা নুন। বর্তমানে পরাবিজ্ঞানে একে আত্মিক তেজক্ষেত্র বলা হয়। তা থেকে র-তুম বা অতুম নামে এক স্থূল সত্তার উদয় হয়— যার মধ্যে পুরুষাত্মক ও মহিলাত্মিকা শক্তি একত্রে যুক্ত ছিল। এই জন্য তাকে HE-SHE-GOD-ও বলা হয়। আমাদের ব্রহ্মা যেমন তিনিও তেমনই। ব্রহ্মার চিন্তাকে বর্তমান বিজ্ঞান নিউট্রন ফিল্ড রূপে কল্পনা করছে। নিউট্রন ফিল্ড থেকে প্রতি ১২ থেকে ১৫ মিনিটে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন নির্গত হয়ে বস্তুবিশ্বের পটভূমি তৈরি

করেছে। এর মধ্যে ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন প্রোটনকে পুরুষের সঙ্গে ও ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রনকে মহিলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রাচীন মিশরীয়রাও চিন্তা করেছিলেন যে, র-তুম বা অ-তুম থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন শু (বায়ু বা দেশ) ও তেফনুৎ আর্দ্রতা। এই শু ও তেফনুৎ থেকে আসে গেব (পৃথিবী) ও নুট (আকাশ)। এঁদের থেকেই আসেন অসিরিস (নীলনদ) ও আইসিস (উর্বর ভূমি) এবং সেট (মরুভূমি) ও নেফথাইস (পশু জীবন)। শু (বায়ু)— গেব (পৃথিবী) ও নুটের (আকাশ) মধ্যখানে এসে দাঁড়ালে বর্তমানে যে অবস্থাতে সৃষ্টিকে দেখা যায়— সৃষ্টি সেই অবস্থাতে এসে দাঁড়ায়। আদিতে এঁরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিল। এঁদের বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। এই বিচ্ছিন্ন হবার ফলে আকাশ পৃথিবীর উপর খিলান তৈরি করে আছে। [আসলে দেশে (Space)-কোন ভারি বস্তুর উদয় হলে আকাশ তার চতুর্দিকে বেঁকে যায়, আধুনিক বিজ্ঞানই এ-কথা প্রমাণ করেছে।] আকাশ সজ্জিতা হয়েছে নক্ষত্র মণ্ডলী দ্বারা।

নুট প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে ছিলেন আকাশ স্বরূপ। তাঁকে মহিলা হিসেবে দেখানো হয়েছে। হেলিওপোলিস-এর কাছে ডিওসপোলিস পর্বতে তিনি বাস করতেন বলে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁর নামে কোন মন্দির নেই। তাঁর পুজো হত বলেও মনে হয় না। শুধু মহাকাশের দৃশ্যের সঙ্গে তাঁকে দেখানো হ'ত। তাঁর যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ধনুকের মত উল্টোদিকে বেঁকে হাত ও পা দিয়ে পৃথিবী স্পর্শ করে রয়েছেন। দেহটাকে খিলানের মত তৈরি করেছেন। দেশ (Space)-দেবতা 'শু' তাঁকে দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন। এর নিচে মনুষ্য আকারে গেব শায়িত রয়েছেন। এর অর্থ দেশশক্তি আকাশ ও ভূমিকে নিবিড় আলিঙ্গন থেকে পৃথক করছে। তার পিঠের উপর দিয়ে দেখা যায় সূর্য দেবতার নৌকো বয়ে চলেছে। এতে তাঁর আকাশত্বই প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি দেবী হ্যাথরেও রূপান্তরিতা হয়েছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। কারণ, দেবী হ্যাথরও ছিলেন আকাশ-দেবী। তবে কারও সঙ্গে মিলন ব্যতীতই তিনি জন্ম দিতে পারতেন। আদি সলিলের দেবী হিসেবে অতি প্রাচীন মিশরে লোকে কল্পনা করত দেবী নীট-এর। পরে তিনি রণদেবী হিসেবে চিত্রিতা হয়েছিলেন। মিশরে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে স্বর্গের কারণসলিলের দেবতা বা মূর্তিরূপ ছিলেন পুরুষ দেবতা, যাঁর নাম নু। তারই পত্নী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল নুটকে। নু-কে বলা হ'ত আত্মসৃষ্ট বা স্বয়ম্ভু। নু-কে স্থূলকায় ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। নীলনদের সঙ্গে তাঁকে এক করেও দেখা হ'ত। তাঁরই পত্নী নুট ছিলেন কারণ সলিলের মহিলাত্মিকা শক্তি। এই কারণ সলিল থেকেই সব কিছু এসেছিল। নুট ছিলেন শু ও তেফনুতের কন্যা। অপর পক্ষে অসিরিজ, আইসিস, সেট ও

নেফথাইসের জননী। তাকে যে-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে তাঁর কাঁখে জলভরা এক কলসী দেখা যায়। অনেক সময় আবার তাঁকে গো-শৃঙ্গে সজ্জিতা করা হ'ত। সাইকামোর বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে সেই কলসী থেকে তিনি জল ঢালছেন এমন দেখা যায়। মৃতের পুস্তকে তাঁকে লক্ষ্য করে এই ধরনের প্রার্থনা আছে : 'তোমার মধ্যে যে আকাশী সলিল রয়েছে, আমার প্রতি তা বর্ষণ কর।'

২৬। **নবপত্রিকা :** শরৎকালে দেবী দুর্গার অকাল বোধন যার মধ্য দিয়ে করা হয় তাঁরই নাম নবপত্রিকা। বোধনের সময় দেবীর প্রতীক কোন মূর্তি নয় বিল্বশাখা। এর পরই স্নান ও নবপত্রিকা। একটা কলা গাছের সঙ্গে কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক ও ধান বেঁধে দিয়ে নবপত্রিকা তৈরি করা হয়। এ-সব মিলে যা তৈরি হয় তা আসলে একটি শস্যবধূ। এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে পূজো দিতে হয়। আসলে দুর্গা মূর্তিতে শস্য দেবীরই অর্থাৎ পৃথিবী মায়েরই পুজো হয়। এ হল আদিম উর্বরাশক্তির পূজা, ফার্টিলিটি কাল্ট। দুর্গা পূজায় বেশ্যাদ্বারের যে মৃত্তিকা প্রয়োজন হয় তাও উর্বরা শক্তির পূজার প্রতীক। সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাচ্যের অন্ততর দেবীর পূজাতে যে দেবদাসী প্রথা বা বেশ্যাবৃত্তি ছিল সেই রীতির সঙ্গে একদা ভারতীয় মাতৃমূর্তি পূজাও পরিচিত ছিল। তারই রেশ স্বরূপ বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা প্রথা থেকে গেছে। দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক উর্বরাশক্তি পূজার গন্ধ খুঁজে পান। যেমন প্রাচীন পারস্যের দেবী অনাহিত-এর কাছে একটি বৃষকে নিধন করা হ'ত। বিশ্বাস ছিল যে, বৃষরক্তে স্নাত হয়ে পৃথিবী নবরূপে সৃজনময়ী ও উর্বরা হয়ে উঠবেন। মহিষ হয়তো সেই বৃষেরই রূপান্তর যার রক্তে ধরিত্রী উর্বরা হয়ে উঠবে। বর্তমানে দেবীর কাছে ছাগ বলি দেওয়া হয়— তাও বোধ হয় উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্যই। কারণ, ছাগল মুহুর্মুহু যৌন সংসর্গের জন্য উর্বরাশক্তির প্রতীক। অনেকে বলি না দিয়ে যে কৃষ্ণতিল ব্যবহার করেন তাও ছাগলের পরিবর্ত হিসেবে। মহাগৌরীরূপে দেবী দুর্গা নিজেও কিন্তু বৃষবাহনা।

অবশ্য শাস্ত্রকারেরা নবপত্রিকার এক একটি ফল ও শস্যকে এক একটি প্রতীক হিসেবে মনে করেন। যেমন, কলা হল ব্রাহ্মাণী, কচু কালিকা, হরিদ্রা দুর্গা, জয়ন্তী কার্তিকী, বিল্ব শিবা, দাড়িম্ব রক্তদন্তিকা, অশোক শোকরহিতা, মান চামুণ্ডা ও ধান লক্ষ্মী।

তবে কালিকাপুরাণ ও চণ্ডীতে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। স্মার্ত রঘুনন্দন (১৬০০ খ্রীঃ) প্রভৃতির বিহিত বিধানে অনেক শতাব্দী পরে দুর্গার সঙ্গে নবপত্রিকার যোগ স্থাপিত হয়।

২৭। **নাচন চণ্ডী ও নাটাই চণ্ডী :** এ-সব হল শক্তির বা চণ্ডীর স্থানীয় নাম। নাচনচণ্ডীকে দেখা যায়— মাণিক গাঙ্গুলীর 'শ্রীধর্ম মঙ্গলে' তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

তাঁকে নিমপুরের দেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নাটাই চণ্ডী পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার দেবী। অঘ্রাণ মাসের রবিবার সন্ধ্যায় অনেক ঘরেই তাঁর পূজো হ'ত। ঠিক অঘ্রাণ মাসেরই প্রতি রবিবার ইতু পূজাও হ'ত। ইতু পূজা সূর্য পূজা। কিন্তু নাটাই চণ্ডীর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

নাটাই চণ্ডীর ব্রতে যে আয়োজন লক্ষ করেছি তাতে দেখেছি আমাদের পিসিমা পশ্চিমের ঘরের পূর্বদিকের মাটির বারান্দায় একটি চৌকোণ পুকুর কাটতেন। তার উপর দিকে মাটিতে সিঁদুর দিয়ে বসুন্ধরা মায়ের মত মূর্তি আঁকা হ'ত। নুন দেওয়া পিঠে ও নুন ছাড়া পিঠে তৈরি করে দেবীর পূজো হ'ত। পূজোয় লাগতো কলমী ফুল ও ঘাটি ফুল (ঘেঁটু ফুল নয়)। পূর্ববঙ্গে মাঠের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য ঘাটি নামে এক ধরনের শস্যের চাষ হ'ত। তাতে ছোট ছোট হলুদ ফুল ধরত। সেই ঘাটি ফুল ও কলমী ফুলে দেবীর পূজো হ'ত। তিনি শস্যদেবী ছিলেন বলেই মনে হয়। মেয়েরাই পূজো করতেন। আমাদের বাড়িতে করতেন আমার বাল্য বিধবা পিসিমা— শরৎকামিনী গুহ নিয়োগী। পূজো শেষে তিনি পুকুরে জল ঢেলে দিতেন। তাতে একটি মড়া শামুকের খোলা ভাসিয়ে দেওয়া হ'ত। পূজো শেষে পিসিমা ব্রত কথার গল্প বলতেন : এক যে ছিল সওদাগর...। গল্পের মূল বক্তব্য এক সওদাগর তাঁর এক কন্যা ও এক পুত্রকে বিমাতার কাছে রেখে বাণিজ্য করতে যান। বিমাতা তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। তারা এঁটো পাতা চেটে দিন কাটাতে থাকে। এমন সময় এক গেরস্ত বাড়িতে কোন এক সন্ধ্যায় নাটাই চণ্ডীর ব্রত কথা শুনে জিজ্ঞাসা করে— এ পূজো করলে কি হয়? জবাব আসে (পিসিমার ভাষা অনুসারে) নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রকের পুত্র হয় ইত্যাদি। দুই হতভাগ্য বালক বালিকা তাদের দুঃখ মোচনের জন্য সেই নাটাই চণ্ডী পূজো করে। তাদের বাবা সওদাগর দেশে ফিরে এসে সস্নেহে সন্তানদের তুলে নেন। তাদের দুঃখের অবসান ঘটে। নাটাই চণ্ডী ব্রতের এই হল বক্তব্য। শক্তিরই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে পূজো করার যে ধারা ছিল নাটাই চণ্ডী তারই একটি রূপ মাত্র। ইতু পূজোর সঙ্গে গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

২৮। নারায়ণী ও নারসিংহী : এই দুই রূপই হল ভগবান বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী পত্নীর। আদি নর হিসেবে বিষ্ণুর নাম নারায়ণ— অর্থাৎ নারাতে অর্থাৎ আদি সলিলে যাঁর অয়ন বা বাস। সেই আদি পুরুষের যিনি শক্তি তিনিই নারায়ণের পত্নীরূপে নারায়ণী।

নারসিংহী রূপও ভগবান বিষ্ণু যখন নরসিংহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন— তাঁর সেই অবতার রূপের শক্তি। চণ্ডীতে দেখা যায় এঁরা সবাই মহাদেবী দুর্গার অঙ্গে তাদের শক্তি দিয়ে এসে জড় হয়েছিলেন— যাতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করতে পারেন।

**২৯। নৈরাত্মা :** বৌদ্ধ দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে এক দেবীর উল্লেখ লক্ষ করা যায়— যাঁকে দেবী নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাধনতন্ত্রের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে এই বৌদ্ধ দেবীর নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে বলে মনে হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মাতৃদেবীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নেপাল, ভূটান, তিব্বত এবং চীন দেশের কিছু কিছু অংশে এক আদিবুদ্ধ ও তাঁর নিত্যা শক্তিরূপে এক আদিশক্তি রয়েছেন।

আদিবুদ্ধের ধারণা এসেছে পরবর্তী মহাযান বৌদ্ধধর্মের ধর্মকায় বুদ্ধ থেকে। এই প্রপঞ্চাত্মক সৃষ্টির পরম অধিষ্ঠান হিসেবে রয়েছেন করুণাত্মক দ্বিতীয় বিহীন এক বুদ্ধ। তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার। কিন্তু সকল বিশেষ গুণ ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান। এই বিশ্বনিখিল তাঁর থেকেই জাত। সকল বিকারের মূল কারণ হয়েও তিনি কিন্তু অবিকারী।

আবার কোথাও কোথাও দেখা যায়, ধর্মকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের ত্রিকায়-এর শেষ 'কায়' ধর্মকায়কেই তান্ত্রিক বৌদ্ধরা চরম 'কায়' বলে স্বীকার করেন নি। ধর্মকায় বুদ্ধও যেন কিছুটা অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব। তাঁরও উপরে হ'ল বুদ্ধের চরম স্থিতি, যাঁকে বলা হয়েছে স্বভাবকায় বুদ্ধ। 'এই স্বভাবকায়াই হলেন অবিকারী শূন্যকায়— বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায়ই আদি বুদ্ধ। ইনিই তন্ত্রের পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী, তেমনই আদি বুদ্ধের নিত্যাশক্তি হলেন আদি দেবী।

কিন্তু এই যে আদি দেবী বা প্রজ্ঞা, তিনি শূন্যতারূপিণী, ধনাত্মক। তাঁর সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধ হলেন ধনাত্মক, করুণারূপ। এঁদের দুইয়ের মিলন থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। এই যে শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞা, তিনিই নৈরাত্মারূপিণী নির্বাণ।

বৌদ্ধদের মতে সাধক-চিত্তই স্বয়ং ভগবান,— নৈরাত্মা গৃহিণী। চর্যাপদে এই নৈরাত্মাকে যোগিনী, ধরণী, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী নানা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নৈরাত্মা অনেকটাই ভারতীয় তন্ত্রযোগীদের কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপা,— তথাপি তা থেকে পৃথক, কারণ, তন্ত্রে পুরুষ শূন্যতারূপী এবং কুলকুণ্ডলিনী, সৃষ্টিরূপা। কিন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রে তিনি নৈরাত্মারূপে নিজেই শূন্যতারূপিণী। বুদ্ধ হলেন করুণারূপী পুরুষ।

**৩০। নিত্যা :** ইনি সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকদের এক তন্ত্রের দেবী। সহজিয়া মতে প্রেমই পরমশক্তি। এই নিত্য প্রেমশক্তির মূল দেবীই হলেন নিত্যা। অবশ্য কোথাও কোথাও তাঁকে নিত্যারূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নিত্য প্রেমস্বরূপিণী।

১। **পজউ যণ :** ইন্দোচীনের প্রাচীন চম্পায়— এখনও সামান্য কিছু প্রাচীন অধিবাসী বাস করে, যাদের বলে চম্। এঁরা হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করত। ফলে বহু হিন্দু দেবদেবী এদের পূজ্য ছিল। পজউ যণ অর্থাৎ দৈবী মহিলা পুরোহিত নামে তাদের এক দেবী ছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি অনুকূল স্বভাবা ছিলেন। এই দেবী মানুষকে সুখ স্বাচ্ছন্দ দান করেন ও তাদের রোগ-শোক দূর করেন বলে বিশ্বাস ছিল। যে কোন পূজা উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করা হ'ত। তাঁর কোন মূর্তি নেই। তবে তাঁকে ত্রিশ বছরের এক মহিলা বলে মনে করা হয়। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিনে তাঁর উদ্দেশে ফল দান করা হয়। তিনি পৃথিবীতেই বাস করেন বলে বিশ্বাস।

২। **পতউ কুমেই:** ইন্দোচীনের প্রাচীন চমদের ইনো নোগর বা পো-যন ইনো নোগর তহা বা মহাদেবী, রাজ্যের অধিশ্বরী ইত্যাদি নামে এক দেবী ছিলেন। তাঁরই এক নাম ছিল মুক্ জুক্, কৃষ্ণাঙ্গিনী দেবী ও পতউ-কুমেই বা মনুষ্যের রাণী। তিনি চমদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালিনী দেবী। বিশ্বাস, তাঁর জন্ম হয়েছিল মেঘ থেকে বা সমুদ্রের ফেনা থেকে (অফ্রোদিতের মত?)। তার ৯৭টি স্বামী ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন— পো-যন-অমোহ্ বা পিতৃদেবতা। তাঁর কন্যার সংখ্যা ছিল ৩৮। এঁদের আগে পূজা করা হ'ত। তিনি ধান উৎপাদনে সাহায্য করতেন এবং কৃষিকার্যে সহায়তা ও রক্ষা করতেন। আসলে তিনি ছিলেন স্থানীয় এক দেবী। আঞ্চলিক নরগোষ্ঠী এঁর পুজো করতেন। তাঁরই সঙ্গে পরবর্তীকালে ভারতীয় শ্রী (লক্ষ্মী) দেবী ও দুর্গার গুণসমূহ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দোচীনের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও তাঁর কন্যারা নানা নামে পুজো পান, যেমন, পো-নোগর দরা, পো-ব্যা তিকুহ্ (ইঁদুরের দেবী), তরা নই অনইহ্, পো-সহ্ অনইহ্ প্রমুখ। এঁরা সবাই কুমারী। এঁদের প্রসন্ন না করা গেলে বিপদ ঘটে বলে বিশ্বাস।

৩। **পক্শ-অব :** রাশিয়ার অন্তর্গত ফিন্নো উগ্রিয়ান জাতির মধ্যে দুটি বড় গোষ্ঠী আছে এরজ ও মোক্ষ। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার আগে তারা ছিল পৌত্তলিক। নানা দেবদেবীর পুজো করত। এদের মোক্ষ গোষ্ঠীরই এক দেবীর নাম পক্শ-অব। এরজা গোষ্ঠীর পৃথ্বী মাতার নাম ছিল মস্তোর অব। মোক্ষ গোষ্ঠীরও মস্তোর-অব নামে পৃথ্বী দেবী ছিলেন। কিন্তু তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে বেশি পুজো করতেন পক্শ অব নামে এক দেবীর। এই নামের অর্থ 'মাঠ-মা', 'মা-মাঠ' বা পক্শ-অজের-অব অর্থাৎ মাঠের দেবী। মাঠের গৃহিণী বা নোরপক্শ অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র নামেও তাঁর পুজো হ'ত।

৪। **পক্শ অজের অব :** পক্শ অব বা পক্শ অজের-অব একই দেবী অর্থাৎ মাঠের দেবী। মূলতঃ শস্য দেবী।

৫। **পনকিয়া :** ইনি প্রাচীন গ্রীসের এক সর্বনিরাময়ী ভেষজ-এর নাম।

চিরোন ও হেরাক্লিসের সঙ্গে এই ভেষজটির নাম পাওয়া যায়। গ্রীক আরোগ্যের দেবতা অস্‌ক্লেপিয়স-এর তিনি কন্যা ছিলেন বলে বিশ্বাস। অসক্লেপিওস-এর সর্ব ক্ষমতাময় নিরাময়ী শক্তির তিনি ব্যক্তিরূপ হিসেবে এসেছিলেন। গুণবাচিকা এই ধরনের শক্তির ব্যক্তিরূপ ভারতের ঋগ্বেদেও প্রচুর লক্ষ করা যায়। সম্ভবতঃ চিকিৎসকদের রোডেশিয়া অঞ্চল থেকে এই দেবীর উৎপত্তি হয়েছিল। প্রাচীন ঋষিরা চিকিৎসা কালে এই দেবীর নামে শপথ নিয়ে তবে চিকিৎসা আরম্ভ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে এসে যুক্ত হন তাঁর ভগ্নী আইয়াসো। আরও পরে একেসো এসেও যুক্ত হন। এই তিন-এ মিলে গ্রীক আরোগ্যের জগতে অদ্ভুত এক ত্রয়ী সত্তা গঠন করেছিল।

৬। **পঞ্চ খণ্ডা** : ওড়িশার পতিত শূদ্ররা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের দেবদেবীকে খুব একটা স্বীকার করে বলে মনে হয়না। সর্বপ্রাণবাদী এক দেবীর তারা পূজা করে। তাঁর নাম পঞ্চখণ্ডা। পঞ্চখণ্ডা অর্থ পাঁচটি তরবারির শক্তি। তাঁকে পূজা করা হয় ছাগল ও মুরগি বলি দিয়ে এবং রান্না করা ভাত দিয়ে। যারা পূজো করে তারাই প্রসাদ পায়। বারোয়ারী পূজো হলে গ্রামের প্রধানই সেই পূজা পরিচালনা করেন। পূজো আর্চার জন্য এদের কোন ব্রাহ্মণ নেই।

৭। **পঞ্চনন্দা** : পঞ্চনন্দা হলেন পূর্ববঙ্গের এক লৌকিক দেবী। বিশ্বাস ইনি শিশুদের রোগশোকাদি থেকে রক্ষা করেন।

৮। **প্যানথিয়া বা পনথিয়া** : প্রাচীন রোমানদের এক রহস্যময়ী দেবী ছিলেন— তাঁর নাম পনথিয়া। বহু দেবদেবীর চরিত্রের তাঁর মধ্যে একত্রে সমাবেশ ঘটেছিল। সমুদ্রযাত্রীরা তাঁর পূজো করতেন বলে মনে হয়। শৃঙ্গসম্পন্ন দেবতা টেনন্ট-এর সঙ্গে তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের লিবিয়া ও মুর সীমান্ত বরাবর স্থানে তাঁর পূজো হ'ত।

৯। **পপ** : ইনি পলিনেশিয়ানদের পৃথ্বী মাতা। একে ও-টে-পপও বলা হয়। ইনি ছিলেন মহিলাস্থিকা। পৃথিবীর মৃত্তিকা, পাহাড়, পর্বত সবই ছিল তাঁর মধ্যে ঘনসংবদ্ধ হয়ে। এই অবস্থা বিদীর্ণ হয়ে যাবার পরই নানা সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে। গল্প হল এই প্রকার :

আকাশ দেবতা রঙ্গী বা টঙ্গোয়া মাতা পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িত ছিলেন। তাদের এই মিলন থেকে অসংখ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তারা অন্ধকারের মধ্যে থাকতেই বাধ্য হয়। অন্ধকারের এই বিষাদ সহ্য করতে না পেরে সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ পিতামাতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। অবশেষে তনে মহুৎ নামে এক সন্তান মাকে পিঠ দিয়ে ও বাবাকে পা দিয়ে ঠেলে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিচিত্রভাবে সৃষ্টি প্রকাশ পায়।

১০। **পরভা বা প্রভা** : উত্তর ভারতের একশ্রেণীর যাযাবর জাতীয় বেদের

নাম কঞ্জর। উত্তর প্রদেশের আগ্রা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, ইত্যাদি নানা স্থানে তাদের দেখা যায়। তাদেরই এক উপাস্যা দেবীর নাম পরভা বা প্রভা। পরভা বা প্রভা হলেন আলোর দেবী। তিনি প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। তবে বিশেষভাবে দেখাশোনা করেন পশুদের। তাঁর সঙ্গে ভুইঞা বা ভবানী দেবী অর্থাৎ পৃথ্বী মাতারও পূজা হয়।

**১১। পার্বতী** ঃ দেবী দুর্গারই এক নাম পার্বতী। পর্বতের কন্যা হিসেবেই তিনি পার্বতী বা পর্বতবাসিনী বলে পার্বতী। তবে তিনি যে হিমালয়ের কন্যা পুরাণ কাহিনীতে তার উল্লেখ আছে। হিমবৎ কন্যা হিসাবে তাঁর নাম হৈমবতী।

মরমিয়া তান্ত্রিকেরা মনে করেন যে, এই দেবী মূলতঃ কুলকুণ্ডলিনী। পাঁচটি অসুরের সঙ্গে তাঁর যে সংগ্রাম, তা হল সাধকের বন্ধনের কারণ পাঁচটি বৃত্তির সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম। এই বৃত্তিগুলি অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতি থেকে সূক্ষ্ম প্রকৃতি পর্যন্ত নানা স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। একেবারে নিম্নতর পর্যায়ে যে বৃত্তি বন্ধনের কারণ তা মধু ও কৈটভ নামে বর্ণিত হয়েছে। এরা উভয়েই তমোগুণাত্মক প্রবৃত্তি। মহিষাসুর হল রজগুণাত্মক প্রবৃত্তি। শুম্ভ ও নিশুম্ভ রজ + সত্ত্বগুণাত্মক প্রবৃত্তি। এই পর্যায়ের বৃত্তিকে নাশ করতে পারলেই প্রকৃতিকে জয় করা যায়।

কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার থেকে সহস্রারের কূটস্থানে নিয়ে যাবার পথে মেরুদণ্ডের প্রতিটি চক্রেই প্রতিবন্ধকতা আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধকতা আছে তিনটি গ্রন্থিতে। এই তিনটি গ্রন্থির নাম— ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি।

মণিপুর চক্র ও প্রাণময় কোষে রয়েছে ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক যোগবলে কুলকুণ্ডলিনীকে এই গ্রন্থি ভেদ করাতে পারলে দেহের ষড়কোষের মনোময় কোষ লাভ করেন।

দেহের ভিতর যে পরমাত্মা রয়েছে তাঁকে আবৃত করে রয়েছে ছটি কোষ বা আচ্ছাদন। এই কোষগুলি হল স্থূলদেহ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

এর মধ্যে স্থূল চোখে আমরা শুধু স্থূল দেহ কোষটিকেই দেখতে পাই। সাধনার দ্বারা সূক্ষ্ম দৃষ্টি জন্মালে আরও সূক্ষ্ম কোষগুলি নজরে পড়ে। এই সূক্ষ্মগ্রন্থি ভেদ হলে যে রজঃগুণ লাভ হয় তা সত্ত্বগুণাভিমুখী। কিন্তু তবু যে তম গুণের দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না তা নয়। এই সময় সাধক যে ভূমি বা লোক লাভ করেন তাকে জনলোক বলা হয়েছে। এই কোষের নিয়ন্ত্রক দেবতা সূর্য। সাধক এই কোষে প্রবেশ করে প্রথম অতীন্দ্রিয় লোকের আলো দেখতে পান। তিনি তখন সূক্ষ্ম শরীর থেকে রহস্যময় শরীরে প্রবেশ করেন।

এই ভিত্তি পর্যায় লাভ করেই সাধককে তুষ্ট থাকলে চলবে না। 'সৎ' পর্যায় লাভ করার অভীষ্ট থেকে সে তখনও অনেক দূরে। এই সময়ও রজঃগুণের

প্রাধান্যে সাধক প্রায়শঃই অহংকার থেকে ভুগতে থাকেন। ফলে অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধি আসেনা। এই জন্য আরও সাধনা করতে হয়। যোগীকে তাঁর কুলকুণ্ডলিনীকে অনাহত চক্র ভেদ করে আরও উর্ধে উঠাতে হয়। এই পর্যায়কেই শ্রীশ্রী চণ্ডীতে মহিষাসুর বধ পর্যায় রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহিষাসুর হল ভয়ঙ্কর তেজ সম্পন্ন শক্তিশালী জীব বা অসুর। এই অসুর সংসার ক্ষেত্রে রজঃগুণ প্রভাবে গুণসাম্য নষ্ট করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ব্যক্তিজীবনে অত্যধিক অহংবোধ অধ্যাত্ম উন্নতি ব্যহত করে। সুতরাং অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধককে আরও অগ্রসর হতে হয়।

সাধক মণিপুর চক্র থেকে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে অনাহত চক্রের মনোময় কোষে বিচরণ করতে থাকেন। এই অঞ্চলে মেরুতে বিষ্ণুগ্রন্থি রয়েছে। যোগ প্রভাবে এই বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদ করতে পারলে সাধক সাধন মার্গের উচ্চতর স্তরে গিয়ে উপনীত হন। তিনি তখন দেহ-কোষের বিজ্ঞানময় কোষ এবং ভূমি বা অঞ্চলের মধ্যে তপলোকে বাস করেন। তিনি কারণশরীর অবস্থা প্রাপ্ত হন। রজঃগুণ অতিক্রম করে তিনি সত্ত্বগুণ লাভ করেন। এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক দেবতা চন্দ্র (কোটিচন্দ্র সুশীতলম জ্যোতির অঞ্চল)। সাধক মনোময় কোষে অন্তর্জগতে তীব্র ঐশ্বরিক দীপ্তি দেখতে পান। এই জ্যোতি প্রথম দিকে কোটিসূর্যপ্রভাস হলেও পরে চন্দ্রকরোজ্বল স্নিগ্ধতায় ভরে উঠে। এই সময় সাধক অহংকারের উর্দ্ধে শান্তি লাভ করেন।

এখানে থেকেও যে সাধকের পতন হতে পারেনা তা নয়। রজঃগুণের অহংকার ভাব প্রকট হয়ে উঠতে পারে। ফলে সাধককে আরও অগ্রসর হতে হয়। অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হলে সাধক বিশুদ্ধচক্রের জ্যোতির্ময় আকাশে বিচরণ করেন। বিশুদ্ধ চক্র অঞ্চল থেকে আজ্ঞা চক্র অঞ্চল পর্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীকে উঠানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আজ্ঞা চক্র অঞ্চলে এসেই অনেকের কুলকুণ্ডলিনীর গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। অনন্ত সম্পর্কে তাঁর যথাযথ জ্ঞান হয়না। তিনি ভূমিত্যাগের অধিকারী হন না। আজ্ঞাচক্রে সাধক সত্যলোকে বিচরণ করেন। তাঁর সত্ত্বগুণ আরও শুদ্ধ স্বভাবের হয়। চন্দ্রজ্যোতি স্নিগ্ধতর হয়। কিন্তু সবিকল্প বা নির্বিকল্প সমাধি হয় না। সুতরাং তাঁকে আরও কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকতে হয়। আজ্ঞা চক্রে আছে রুদ্রগ্রন্থি। সাধন বলে এই গ্রন্থি ভেদ করতে পারলে সাধক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন বা সপ্ততলে চলে যান। আত্মা তখন কোষাতীত পর্যায় লাভ করে। অব্যক্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে সাধক ক্রমশঃ লয় পেতে থাকেন। প্রকৃতির মায়াপর্যায় অতিক্রান্ত হয়। সাধক মুক্তি লাভ করেন।

এই রুদ্রগ্রন্থি ভেদের সাধন পর্যায়ই শ্রীশ্রী চণ্ডীতে শুম্ভ নিশুম্ভ বধরূপ

কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে। শুম্ভ নিশুম্ভ হচ্ছে সাধকের দ্বৈতসত্তা। একটি সত্ত্বগুণের নিম্নপর্যায়ে রজঃগুণমুখী ধাবমান অবস্থা— অপরটি অহংতত্ত্বের সূক্ষ্ম অবস্থা, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়িতে প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে প্রবাহিত। দেবী দুর্গা শুম্ভ ও নিশুম্ভকে শূন্যে হত্যা করেছিলেন অর্থাৎ দুই বায়ুতে সাম্য এলে সাধক ভূমিত্যাগ করতে পেরেছিলেন। সাধকের এটা প্রকৃতি জয়ের সাধনা। অর্থাৎ প্রকৃতিকে বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারের কূটস্থানে নিয়ে গিয়ে উত্তুঙ্গ স্থনবাসিনী করার সাধনা। এখানে শূন্যতারূপী পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হলে শক্তি অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী সর্বোচ্চ স্থনবাসিনী হন অর্থাৎ পার্বতী হন।

যে পাশবদ্ধ জীব বা পশু তাঁর কুলকুণ্ডলিনীকে সাধনা দ্বারা এই স্থানে নিতে পারেন তিনিই পশুরাজ বা পশুশ্রেষ্ঠ— যাঁকেই সিংহরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারস্থ কূটস্থানে নীত হলে জীবের পূর্ণ বীর্য (কার্তিকেয়) পূর্ণ জ্ঞান (গণেশ), সর্ব ঐশ্বর্য (লক্ষ্মী) ও সর্ববিদ্যা (সরস্বতী) লাভ হয়। তাই সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা দেবীকে চতুর্দিকে এই সব দেবদেবী দ্বারা পরিবৃত দেখা যায়। এই হল দেবী দুর্গার পার্বতী-রূপের ইতিহাস।

১২। পেলে : ইনি হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের আগ্নেয়গিরি দেবী। তাঁর অগ্ন্যুদ্গীরণ ক্ষমতার জন্য তিনি অন্যান্য দেবদেবীকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁকে নিয়ে নানা গল্প আছে হাওয়াই দ্বীপে। কখনও তাঁকে তন্বী কুমারী রূপে দেখা যায়, কখনও দেখা যায় দিব্যসম্ভারী নর্তকীরূপে। কখনও দেখা যায় কুৎসিৎ দর্শনা বৃদ্ধা রূপে পথিকদের সামনে দাঁড়িয়ে অসম্ভব সেবা দাবি করছেন। একবার একটি দুর্গ অবরোধ করে তিনি ব্যর্থ হন। ক্রোধে তিনি পুয়নুই নামে শূয়রমুখো ছোটখাটো এক দেবতাকে লাভাস্তম্ভে পরিণত করে দেন। যারা এই ঘটনা লক্ষ করছিল তারাও লাভাস্তূপে পরিণত হয়। এখনও সেই স্তম্ভ ও স্তূপগুলি লক্ষ করা যায়।

কেউ পেলের ছদ্মবেশে ভেদ করে তাঁকে চিনে ফেললে তিনি ভয়ানক রেগে যান। তাদের উপর তিনি ভয়ানক প্রতিশোধ নেন। প্রবাহিত লাভা স্রোতকে পেলের কেশ বলে মনে করা হয়। আগ্নেয়গিরির তিনটি গহ্বরকে মনে করা হয় পেলের তিনটি পদক্ষেপ যে পদক্ষেপের ভার পৃথিবী সহ্য করতে না পারাতে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। দেবী অফ্রেদিতের মত তিনি সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠেছিলেন বলে গল্প আছে। যে তিনটি পদক্ষেপে গর্ত হয়েছিল তাতে সমুদ্রে জল ঢুকে জলাশয় তৈরি করেছে। তার চতুর্থ পদক্ষেপ থেকে যে গর্ত করেছিল তা থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্নি নির্গত হয়। সেখানেই দেবী তাঁর বাসস্থান নির্বাচন করেন।

কমেহমেহ নামে যে গোষ্ঠীপ্রধান প্রথম হাওয়াই দ্বীপকে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন এই দেবী আংশিক ভাবে তাঁর গৃহে বাস করাতেন বলে

বিশ্বাস। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মনুয়া লোয়ার উদ্‌গীরণের ফলে হিলো শহর ডুবে যাবার উপক্রম হয়। তখন কমেহমেহ-র প্রপৌত্রী রাজকুমারী রুথ সেখানে তীর্থ যাত্রা করেন এবং সেই লাভা স্রোতের মধ্যে দেবীর উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রার্থনা জানান, অতীত সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করে দেবী যেন প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এই প্রার্থনা জানানোর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বাকি আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গীরণ বন্ধ হয়ে যায়। এটা লক্ষ্য করে যে সব স্থানীয় নাগরিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা আবার তাদের পুরনো ধর্মে ফিরে আসে।

আসলে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে দৈবী সত্তা আরোপ করে প্রাচীন কালে পূজা করার যে বিধি ছিল অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদ দেবী পেলের কাহিনী তারই পরিচায়ক।

১৩। পেট : পেট হলেন প্রাচীন মিশরের এক দেবী। আকাশেরই ব্যক্তি-রূপ ছিলেন তিনি। আরো অনেক নামে তাঁকেই দেখানো হ'ত যেমন নুট, নীথ, বস্ট, হ্যাথর প্রভৃতি। সেইজন্য তিনিই ছিলেন মিশরের প্রধান দেবী। তাঁকে স্বর্গীয় গাভী মনে করা হত, যার পেট আকাশে খিলান তৈরি করে আছে বা গম্বুজ তৈরি করে আছে। তাঁর স্বামী পৃথিবী-দেবতা 'রে' থেকে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি ঐ ভাবে বেঁকে আছেন বলে অনেকে মনে করেন। হ্যাথর হিসেবে তিনি ছিলেন সূর্যের বাসস্থান। সেইজন্য ডেনডেরাহ্-তে তাঁর প্রচুর সম্মানের আসন ছিল। মিশরীয় সাম্রাজ্যের তিনি হয়েছিলেন প্রধানতমা দেবী। এখানে তাঁকে কল্যাণময়ীবদনা মহিলা হিসেবে দেখানো হ'ত। যার কান ছিল গাভীর মত। বা তাঁর মাথায় থাকত বাঁকানো এক জোড়া শিঙের মুকুট পরানো, যার মাঝখানে সূর্যের ছবি।

যদিও তাঁকে প্রেমের দেবী হিসেবেও দেখানো হ'ত তবু তাঁর এ ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় ভূমিকা। প্রধান ভূমিকা ছিল আকাশের দেবী হিসেবে। প্রেমের ভূমিকা এসেছিল মিশরে সেমাইট জনগোষ্ঠী প্রাধান্য অর্জন করলে। তারা এই দেবীর মধ্যে তাদের নিজস্ব দেবী অশটরট-এর ভূমিকা খুঁজে পেয়েছিল বলে এই দেবীর দেহে যৌনতার গন্ধ ছুঁইয়ে দিয়েছিল। এই জন্যই দেখা যায়, কয়নদের অশটরট যেমন দেবী হ্যাথরের চরিত্র অনেকটা নিয়ে নিয়েছেন তেমনই হ্যাথরও অশটরট-এর বহু চরিত্র ধার করেছিলেন। এই জন্যই উনবিংশ রাজবংশের আমলে দেবী অশটরট স্বনামেই মিশরে যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর এক উপাধি ছিল কদেশ।

১৪। পেট্‌রু-উশ-মং : উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে জাপান পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একটি নরগোষ্ঠী বাস করত— যাদের নাম অইনু। এঁরা একটি প্রধান দেবতায় বিশ্বাস করলেও অন্যান্য দেবদেবীতে আস্থাহীন ছিলনা। তাদেরই এক দেবীর নাম পেট্রু-উশ-মং। এর অর্থ জলপথের মহিলা। তাঁর সঙ্গে থাকত নদনদীর মহিলা উৎস পেট-এটৌক-মং। মৎস্যকন্যারূপী পে-যোসো-কো-

শিনপুক, যারা জলের মধ্যে চলাফেরা করে তারাও এই কারণে এদের শ্রদ্ধা পেত।

১৫। পিটেরি : ভারতবর্ষের আদি নরগোষ্ঠীর মধ্যে আজও যারা স্বতন্ত্র অবস্থায় টিকে আছে তাদের মধ্যে একটি নরগোষ্ঠীর নাম কন্দ বা খোন্দ। মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও অসমের কিছু কিছু অঞ্চলে এদের দেখা যায়। তাদেরই এক দেবীর নাম পিটেরি। এদের প্রধান দেবতার নাম হল বুর পেনু। তাঁরই পত্নীর নাম পিটেরি। সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতীয় পিতারি দেবীই এদের পিটেরি। এঁরা মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ ও মহিলা অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের আদম ও ইভের মত। অন্য বহু দেবদেবীরও তাঁরা নিয়ন্ত্রক।

১৬। পো : মধ্য আমেরিকার আদি অধিবাসীরা নানা দেবদেবীর পূজো করত। প্রকৃতির নানা শক্তিতে তারা পুরুষাত্মক ও মহিলাত্মিকা শক্তি আরোপ করে পূজো দিত, যেমন সূর্য ও চন্দ্র। সূর্যকে তারা বলত ক্ষলম্‌কে (Xlalamke) এবং চন্দ্রকে পো (Po)। চন্দ্রকে তারা সূর্যের পত্নী হিসেবে কল্পনা করত। বর্তমানে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও গুয়াতেমালার পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী এই নরগোষ্ঠী অদ্যাবধি তাদের নানা প্রাচীন দেবদেবীর পুজো করে। সেই হিসেবে দেবী চন্দ্র বা পো তাদের পুজো পান।

১৭। পোগোড : পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতে যে শ্লাভজাতি বাস করে প্রাচীন কালে তারা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত ও তাদের প্রসন্ন রাখার জন্য পুজো করত। পোগোড ছিলেন তাদের এক বিশেষ দেবী। তিনি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাতেন। তাঁর নামের অর্থ অনুকূল হাওয়াদাত্রী।

১৮। পো-ইনো-নোগর : ইন্দি-প্রাচীন ইন্দোচীনের চমদের এক উপাস্যা দেবী। চমরা হিন্দু-দেবদেবীরই পূজো করতেন। শুধু তাদের নামটি পাল্টে গিয়েছিল এই যা। পো-ইনো-নোগর অর্থ আমাদের উমা। নহ-ত্রং-এ এই দেবীর উদ্দেশে একটি মন্দিরও নির্মাণ করা হয়েছিল। এঁকে মনে করা হত রাজ্যের মহামাতৃদেবী। ভারতবর্ষে দেবী দুর্গাকে যেমন উর্বরা শক্তির দেবী হিসেবে গণ্য করা হয়— তেমনই পো-ইনো-নোগারকেও করা হয়। চমরা মাঠের প্রথম শস্য এই দেবীকে উৎসর্গ করে তবে ভক্ষণ করে। দেবীকে যতক্ষণ না এই শস্য নিবেদন করা হয় ততক্ষণ নতুন করে চাষ করা যাবেনা অর্থাৎ হল দ্বারা মাটি কর্ষণ করা যায় না।

১৯। পো-নগর-দরা : পো-নগর-দরা হলেন পো-ইনো-নোগারের কন্যাদের মধ্যে একজন। আমাদের দেশে যেমন দেবীর কন্যাদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি। তবে এঁর ভূমিকা কি জানা যায় না। কিন্তু আর এক কন্যার পরিচয় পাওয়া যায়— যার নাম পো-য়া-তিকুহ্ অর্থাৎ রাণী ইঁদুর। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কুমারী। অনেকে ক্ষতিকর দেবী। নানা ধরনের বলি দিয়ে এঁদের

প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করা হ'ত।

২০। **পো-শাহ্-অনইহ্** : দেবী পো-নোগর-এরই আর এক কন্যার নাম ছিল পো-শহ্-অনইহ্। তিনি সম্ভবতঃ ক্ষতিকর কোন দেবী ছিলেন।

২১। **পো-যান-দরী** : পো-যন-দরী হলেন রোগশোকের দেবী। তিনি পাহাড় পর্বতের গুহা, বনজঙ্গল প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। একটি খাড়া পাহাড়ের গায়ে আড়াআড়ি সাদা একটা রেখা টেনে দেওয়া থাকে। এই রেখাটিকে দেবীর মুখ বলে ভাবা হয়। এই পাথরটিই দেবীর প্রতীক, আমাদের যেমন বৃক্ষনিম্নে বসানো পাথর, গ্রানাইট শিলা প্রভৃতি শিব ও বিষ্ণুর প্রতীক। তিনি নাকি স্বপ্নে জনৈক বৃদ্ধকে দেখা দিয়ে এই পাথরটি পুঁতবার স্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই পাথরটি বৃক্ষনিম্নে স্থাপন করা হয়। চারদিকে বৃত্তাকারে কিছু জায়গা পরিষ্কার করা হয়। এই বৃত্তের মধ্যে ঢোকার জন্য একটি মুখ খোলা রাখা হয়। বৃত্তটি কতবড় হবে তার কোন নিয়ম নেই। একে বলা হয় 'তোনো যন' বা পবিত্র বৃত্ত বা ঘেরাও করা স্থান। যারা এই পাথরের স্বপ্ন দেখে তারাই পাথর কি ভাবে বসাতে হবে তা ঠিক করে নেয়। দেবীর উদ্দেশে মুরগী বলি দেওয়া হয়। ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় রান্না করা ভাত, পান ইত্যাদি। বলি দেবার নিয়ম হল, দুপুরে ও রাতে দেবীর উদ্দেশে কোন প্রাণী বলি দেওয়া যাবে না। যারা অরণ্যে কাঠ কাটতে বা শিকার করতে চায় তাদের জন্য এই দেবীর উদ্দেশে পূজো দেওয়া বাধ্যতামূলক। ইনি সুন্দরবনের বনবিবির মত। বন থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এলে 'তনো যন'-এর মধ্যে আর একটি পাথর রেখে আসতে হয় এই বা। ফন-রাঙ-এ পো-যন-দরীর এই ভাবে পূজা হয়। 'ফনরি' নামক স্থানে বিশ্বাস যে, এই দেবী শিশুদের রোগমুক্ত করেন। বিশেষ করে শিশুদের জ্বর ছাড়ান। তাকে মাতৃগহ্বর প্রতীকের মাধ্যমেও দেখা হয়। তাই যেখানেই কোন প্রকৃতি বক্ষে স্বাভাবিক গুহা, গহ্বর ইত্যাদি দেখা যায়, মাটি পাহাড় পর্বত যেখানেই হোকনা কেন, সেখানেই এই দেবীর অধিষ্ঠান রয়েছে এমন মনে করা হয়। মদ ও জল দ্বারা স্থানটি ধুইয়ে দিয়ে সেখানে একটি গদা জাতীয় জিনিষ ঘোরানো হয়। এরপর একটা অশ্লীল মন্ত্র আউড়ানো হয়। এতে নাকি দেবীর করুণা পাওয়া যায়। এই ধরনের কিছু কথাবার্তা চর্যাপদের মধ্যেও কুলকুণ্ডলিনী সম্পর্কে পাওয়া যায়। এর একটা মরমিয়া অর্থ আছে যা যোগীরা ছাড়া কেউ বুঝতে পারেন না। গালাগাল জাতীয় মন্ত্রের যে আসল অর্থ কি তা তাই গুণিনরাই জানেন। তবে এ ধরনের তুকতাকের মধ্য দিয়ে যে অদ্ভুত একটা শক্তিকে জাগরিত করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২২। **পোস্‌সজো অক্ক** : ইনি রাশিয়ান ল্যাপদের এক দেবী। ল্যাপদের গৃহের পেছন দিকে কিছু জায়গা থাকে যাকে তারা অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। মহিলারা এখানে কখনও পা রাখে না। সেখানে পোস্‌সজো অক্ক অর্থাৎ

পোস্‌স্‌জোর বৃদ্ধা মহিলা থাকেন বলে মনে করা হয়।

**২৩। পৃথিবী :** আদি নরগোষ্ঠী পৃথিবীকে প্রথম থেকেই মা হিসেবে দেখত। তবে কখনও ছিলেন তিনি করুণাময়ী, কখনও ভয়ঙ্করী। উত্তর ভারতের লোকেরা সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মা পৃথিবীকে এমন ভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। ভারতীয় শিল্পেও মা পৃথিবীর চিত্র ফুটে উঠেছে। দ্রাবিড় চিন্তাতে দেখা যায়, মা পৃথিবী মাটির স্তূপ থেকে বেরিয়ে আসছেন, যে ভাবনা দ্রাবিড়দের পাথরের গায়ে এল্লম্মার চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। শুধু তার মাথাটাই দেখা যাচ্ছে। দেহ রয়েছে মাটির অভ্যন্তরে। বৌদ্ধরাও অনুরূপ ভাবে মা পৃথিবীর ভাস্কর্য তৈরি করেছেন, যাকে তাঁরা অভিহিত করেছেন মহাপথবী বা পৃথিবী রূপে।

মায়ের চিন্তা দ্রাবিড় ভাবনাতেই প্রধান। পরে হিন্দু ধর্মের অঙ্গনে এসে জুড়ে গেছে। ভারতের সকল মাতৃমূর্তির মধ্যেই এক সময় দেখা যায় মা পৃথিবী কোন না কোন ভাবে এসে ভিড়ে গেছেন। ভারতবর্ষে যত মহামাতৃকার নাম করা যায় তাঁরা কোন না কোন ভাবে মা পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে গেছেন।

বেদেও পৃথিবীকে মা হিসেবে দেখা হয়েছে এবং দৌস-এর সঙ্গে একত্রে তাঁর পূজো হ'ত। সেখানে তাঁর মধ্যে নৈতিক ও অসাধ্য চরিত্র ফুঠে উঠেছে। কখনও কখনও পৃথিবীকে একাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর উদ্দেশে সূক্ত রচনা করা হয়েছে। দৌস ও পৃথিবীকে আজও হিন্দুদের বিবাহানুষ্ঠানে স্মরণ করা হয়। সকাল বেলার প্রার্থনাতেও মাকে স্মরণ করা হয়। কর্ষণ, রোপণ, গাভী দোহন প্রভৃতি কার্য মা পৃথিবীকে স্মরণ না করে করা হয় না। কোন কোন উপজাতি পৃথিবীকে গৃহ-দেবতা হিসেবে পূজো করে। ভূমিকে কখনও পুরুষ কখনও মহিলা দেবতা হিসেবে পিঠে পায়েস ফল দুধ ইত্যাদি দিয়ে পূজো দেওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে বাঙ্গালীরা যে বাস্তুপূজা করে তা পৃথিবীরই পূজা। তাছাড়া তাদের ক্ষেত্র পূজাও পৃথিবী পূজো।

অনার্য যত গ্রামদেবতা (মাতৃরূপে) আছেন তাঁদের সবাই হলেন মা পৃথিবীরই ব্যক্তিরূপ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারেই আঞ্চলিক। কেউ কেউ আবার সর্বভারতীয় রঙ গায়ে মাখলেও কতকগুলি বিশেষ আঞ্চলিক চরিত্র অতিক্রম করতে পারেন নি, যেমন কালী, মারিয়ম্মা। বেদেও পৃথিবী করুণাময়ী গৃহদেবতা রূপে চিত্রিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে অনার্য মাতৃসাধনার ধারা এসে মিশে গেছে। বাদামী গুহা মন্দিরে পৃথিবীকে ভূমিদেবী বা ভূদেবী বলা হয়। তিনি ধৈর্য ও তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলিতে মাকে যে ভাবে ভাস্কর্য শিল্পে দেখানো হয়েছে তাতে তাঁর মাথাটুকুই শুধু দেখানো হয়েছে। দেহ রয়েছে মাটির নিচে। রাজপুতদের আরাধ্য দেবী গৌরীও আসলে মা পৃথিবী। প্রতি বছর ভগবান শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়। উদ্দেশ্য শস্য বৃদ্ধি করা। এই

জন্য তাঁকে শাকম্ভরী অর্থাৎ লতাগুল্ম শস্যাদি বৃদ্ধিকরিকাও বলা হয়। কৃষকদের কাছে এই জন্যই তিনি আশাপূর্ণা নামেও খ্যাত। দক্ষিণ ভারতে এম্মম্মরূপে ও মারিয়ম্ম রূপে তাঁর যে মূর্তি আছে বলিসহকারে তাঁদের পূজো দেওয়া হয়। চড়ক পূজোয় যে বড়শি দিয়ে পিঠ গাঁথা হয় তাও মা পৃথিবীকে প্রসন্ন করার জন্যই। এমন কতকগুলো মন্ত্র পড়া হয় যার লক্ষ্য শস্যবৃদ্ধি যেন ত্বরান্বিত হয়। মারিয়ম্মকে নিষ্ঠুর প্রথায় পূজো দেওয়া হয়, যেমন কোন গোষ্ঠীপ্রধান বা জমিদার বা রাজা একটি জীবন্ত ভেড়ার গলা চিরে মুখ ভর্তি রক্ত মাংস নিয়ে দেবীর উদ্দেশে ছুড়ে দেয়। গ্রীসে ডাইওনিসাস অনুষ্ঠানেও অনুরূপ প্রথা ছিল। তামিলদের পিডারি দেবী, সংস্কৃতে, যাঁকে বলা হয় কিহরি, তিনি এক ভয়ঙ্করী দেবী। তাঁর দেহ ও মুখ লাল টকটকে। মাথায় দেখা যায় জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। মহামারী ও অনাবৃষ্টির সময় তাঁকে খুশি করার জন্য আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া হয় ও ষাঁড় বলি দেওয়া হয়। যে পথে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই পথে অজস্র মেষ বলি দেওয়া হয়। রক্ত মেশানো মদ আকাশে ছুড়ে দিয়ে দেবীকে খুশি করার চেষ্টা করা হয়। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এই ধরনের দেবী থেকেই কালী, দুর্গা ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবী আত্মপ্রকাশ করেছেন। অবশ্য যাঁরা গোঁড়া হিন্দু তাঁরা মনে করেন যে, ভারতে উল্লেখযোগ্য মাতৃদেবতাদের উদ্ভব বৈদিক সভ্যতার মধ্য থেকেই হয়েছে। আধুনিক কালে যাঁরা যোগশক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন যে, এঁদের যথার্থই ঐ রূপে অস্তিত্ব আছে। যোগকালে তৃতীয় নয়নে এঁদের দেখা যায়।

যদি বৈদিক সাহিত্যেই তাঁদের উদ্ভব হয়ে থাকে তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে, এই দেবীদের ভয়ঙ্কর চরিত্র এদেশের আদি নরগোষ্ঠীর পৃথ্বী-মাতার চরিত্রের যথার্থই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রমাণ স্বরূপ বিন্ধ্যপাহাড়ের বিন্ধ্যবাসিনী, বোম্বাইয়ের কোলাব জেলার সাগরগড়-এর সপ্তশ্রী দেবী, এঁদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের বাসগৃহ গুহায়। মূলতঃ রূপ বা আকৃতি হীন পাথরে তাঁদের পূজো হ'ত। এঁরা হয় তো পাহাড় পর্বতের বাঁকে যে অশরিরী আত্মা ঘুরে বেড়ায় তাদেরই প্রতীক। পাঞ্জাবে এঁকে অল্প বয়সের মেয়ে হিসেবে দেখানো হয়। সে এমন কয়েকটি জাদুক্রিয়া করে যার লক্ষ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। নেপালে এই কারণেই তাঁকে কুমারী বলা হয়। কালীকে নৃতত্ত্ববিদেরা অনার্য দেবী বলে মনে করেন। তিনি পরে হিন্দুধর্মে এসেছেন। তিনিই কারো কারো মতে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। তবে কালীর তত্ত্বগত যে বিরাট ব্যাখ্যা আছে, এবং তা অত্যন্তই বৈজ্ঞানিক। কালী প্রসঙ্গে আলোচনাতে তা বলা হয়েছে। আদি বৈদিক সাহিত্যে অন্ততঃ স্বনামে কালীকে দেখা যায় না। সম্ভবত, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তাঁকে বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেকে তাঁকে বৈদিক নির্ঋতি দেবীর সঙ্গে যুক্ত করে

দেখতে চান। নির্ঋতি ছিলেন বৈদিক সাহিত্যে অশুভ শক্তির দেবী। এই দেবীদের অনেকেরই পশুবাহন একথাই যেন বলতে চায় যে, আদিতে ঐ ধরনের পশুরূপেই তাঁরা মানুষের শ্রদ্ধা পেতেন। অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেক স্পষ্ট হওয়াতে তাঁরা মনুষ্যরূপের মধ্যে আসেন। এই দেবীদের মূল যে পৃথিবী দেবীর মধ্যেই নিহিত ছিল কালিকা পুরাণে জগদ্ধাত্রী সম্পর্কিত বক্তব্য পড়লেই তা জানা যায়। কালিকা পুরাণে (৩৭/২৫-২৮) দেখা যায়— পৃথিবী দেবী জগদ্ধাত্রীরূপে রাজা জনককে দেখা দিয়েছিলেন। পুত্র নরককে পৃথিবী বলেছেন—' পৃথিবীবাহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়াত্মিম (৩৮/৬৩)। বহু পুরাণেই পৃথিবী দেবীকে পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। তাই দুর্গা পূজার মধ্যে নবপত্রিকা পূজা ইত্যাদির যে বিধি আছে তা লক্ষ্য করলে মাতা পৃথিবী থেকে তাঁকে সম্পৃক্তচ্যুত করা যায় না। চণ্ডীতেও তাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, মহীস্বরূপেও দেবী নিজেই স্থিতা ; যেমন,

"আধারভূতা জগতস্তমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।"

এই পৃথিবী দেবী থেকেই শস্যদেবী ও শস্যপূজার উদ্ভব হয়েছে। দেবী দুর্গার শরৎকালে বোধন হল শস্যদেবীরই পূজা। শরৎকাল থেকেই বঙ্গদেশে শস্যাঙ্কুর আরম্ভ। এর শেষ বসন্তে। সুতরাং এই উভয় প্রান্তেই দেবী দুর্গাকে আরাধনা করা হয়। চৈত্রমাসে দেবী বাসন্তী দেবী হিসেবে পূজিতা হন। সুতরাং ভারতে সকল মাতৃদেবীর সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে পৃথিবী মাতা জড়িয়ে আছেন। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর অন্যত্রও সর্বত্রই মহা মাতৃকাগণ পৃথিবী-মাতার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছেন।

২৪। **পুঙ্গম্ম** ঃ ইনি মাদ্রাজে পূজিতা এক দেবী। এঁর উৎস প্রকৃতপক্ষে মানবী। কোন মহিয়সী মহিলা সেবাধর্মের জন্যই দেবতা স্তরে উন্নীতা হয়েছেন। মাদ্রাজের উত্তর আর্কটে কোন পরিবারের তিন ভগ্নী জনসেবার জন্য বিরাট একটি পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। ফলে তাঁরা মানুষের কাছে দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা পেতেন। পরে যথাথই দেবত্বতে পরিণত হন। তাঁদেরই এক দেবী স্তরে উন্নীতা ভগ্নির নাম পুঙ্গম্ম।

২৫। **পুরন্ধি** ঃ ইনি ঋগ্বেদের এক দেবী। দেবী ধিষণার মত তিনিও প্রাচুর্যের দেবী। এঁর সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায়না।

২৬। **পর্ণশবরী** ঃ বাক্‌পতিরাজ তাঁর গৌড়বহোতে শবরদের দ্বারা পূজিতা এক দেবীর উল্লেখ করেছেন। তিনি পত্রপরিহিতা ছিলেন বলে তাঁর নাম পর্ণশবরী। ইনিই সম্ভবতঃ দেবী চণ্ডী। বানভট্ট কাদম্বরীতে অরণ্যের মধ্যে রক্তাক্ত বলিদান করে যে চণ্ডী পূজার কথা বলেছেন, সে পূজা শবরেরা করত। ইনি হয়তো সেই

চণ্ডীই। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার এই দেবীকে বৌদ্ধদেবী বলে উল্লেখ করেছেন (THE SAKTA PITHAS - Dr. D.c. Sarkar P. 3 FN)। তিনি মনে করেন যে, এই দেবী পর্ণশবর নরগোষ্ঠীর আরাধ্য দেবী ছিলেন। পর্ণ শবররা পত্রবস্ত্র পরিধান করত। কিন্তু কালক্রমে তিনি দেবী দুর্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম। পর্ণ বা হলুদ পত্র পরিহিতা পর্ণশবরী দেবীর কথা বৌদ্ধ সাধন মালায়ও দেখতে পাওয়া যায়। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, পর্ণশবরী দেবী বৌদ্ধ তন্ত্র থেকেই হিন্দু ধর্মের অঙ্গনে এসে প্রবেশ করেছিলেন।

২৭। **পিঙ্গলা :** জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরি, ভদ্রিকা, উল্কা সিদ্ধি ও সঙ্কটা নামে আটটি দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা অষ্টযোগিনী নামে বিখ্যাত। এদেরই একজন হলেন পিঙ্গলা।

২৮। **পাটলা, পিঙ্গলেশ্বরী, পুষ্টি, পুষ্করাবতী, প্রচণ্ডা :** এই সব দেবী প্রকৃত পক্ষে একই মহামাতৃকার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

২৯। **প্রজ্ঞা :** ইনি বৌদ্ধ তন্ত্রের এক দেবী। বৌদ্ধতন্ত্রে শক্তি বা ভগবতীই হলেন নির্বাণ-রূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা। সহজযান বৌদ্ধতন্ত্রে বোধিচিত্ত অর্জনের জন্য শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা বলা হয়েছে।

এই শূন্যতাকে মহিলা ও করুণা বা উপায়কে পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রজ্ঞা অর্থ হল পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে নিষ্ক্রিয়। ইনি হলেন সত্তার ঋণাত্মক দিক। কিন্তু সকল সত্তার উৎস। ঠিক এরই উল্টো কল্পনা রয়েছে সাংখ্য দর্শনে। সেখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থাই পুরুষ ও সক্রিয় অবস্থা মহিলা। একে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞা ও করুণা বা উপায়কে স্ত্রী ও স্বামী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

## ফ

১। **ফুলমাতা বা ফুলমতী :** শীতলা দেবী, ওলাবিবি বা ওলাচণ্ডী এঁদের মত ফুলমাতাও দেবীর একটা ভয়ঙ্করী দিক। ইনিও রোগের দেবী। সাত বছর বয়সের নিচে যে সব শিশু তাদেরই তিনি আক্রমণ করেন। শিশুরোগ আরম্ভ হলে বিপদের দিনে পশুবলি দিয়ে এই দেবীর পুজো করা হয়। এঁর পূজা মূলতঃ বঙ্গদেশেই সীমিত। তবে বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে দেশী মদ উৎপাদক কলওয়ার নামে যে নরগোষ্ঠী বাস করে তাঁরাও ফুলমতী নামে এই দেবীর পূজা করে থাকে। এই দেবী মূলত নিম্নজাতীয়দের। ভারতীয় মহাদেবী দুর্গা ও কালীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে গেছেন।

২। **ফুল্লরা** : সতী দেহখণ্ডোদ্ভূত একান্নটি যে শাক্তপীঠ আছে, তারই অষ্টচত্বারিংশৎ পীঠ অট্টহাস পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ফুল্লরা। এখানে সতীর ওষ্ঠ পড়েছিল বলে বিশ্বাস।

ঐতিহাসিকদের ধারণা, পীঠ বর্ণনায় আগে এ পীঠের নাম ছিল না, পরে এসেছে। বীরভূম জেলার লাভপুরের কাছে এ-পীঠের সন্ধান পাওয়া যায়। দেবীর নাম অনুসারে অনেকে এ পীঠকে বলেন 'ফুল্লরা পীঠ।' পীঠটি লাভপুর রেলস্টেশনের কাছেই। দেবীর মন্দির ছোট। পুরানো। সামনেই থামওয়ালা প্রকাণ্ড নাটমন্দির। তার সামনে উপরে পাকা ছাদ আচ্ছাদিত চাঁদনী। তারপর সোপান মণ্ডিত একটি সরোবর। উপরে তিনদিকেই শ্মশান ভূমি। দক্ষিণ দিকে কতকটা জঙ্গল। শ্মশানের সর্বত্রই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নরকপাল। এর পরে রেল লাইন। দেবীর মূর্তি সবটাই রক্তবস্ত্রে ঢাকা। কেবল মুকুট পরা মাথা ও মুখটুকু খোলা। বাকী অঙ্গ জুড়ে আছে সিঁদুরের প্রলেপ। দেবীর ভোগে প্রথম হয় শিবাভোগ। নিত্য ভোগ আমিষ ও নিরামিষ দুইই। বিশেষ পার্বণে ও অমাবস্যায় ছাগ বলি হয়। পঞ্চ 'ম'কারের অনুষ্ঠান কম। এ-পীঠ অতি প্রাচীন তান্ত্রিক অভিচারের ক্ষেত্র।

তবে পীঠের নাম অট্টহাস হওয়াতে এ পীঠ নিয়ে ভিন্ন মতও আছে।

অনেকের ধারণা, 'ফুল্লরা পীঠ' বলতে যা বোঝায় তা বীরভূমে নয়। এ পীঠ বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে। বস্তুতঃ কেতুগ্রাম থানার অধীনস্ত দক্ষিণডি অর্থাৎ দক্ষিণডিহি গ্রামে। কাটোয়ার আধ কিলোমিটার দূরে অজয় নদীর শাখা নদী ঈশান নদীর তীরে এই গ্রাম। কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে আছে প্রাচীন মন্দির। বিগ্রহ চামুণ্ডা— মুণ্ডমালিনী মা 'কালী। কিন্তু স্থানীয় পূজারীরা দেবীর নাম ফুল্লরা না বলে বলবে অধরেশ্বরী। কারণ, দেবীর অধর পড়েছিল এখানে। দেবীর মন্দির ছোট ও পুরানো। পাশেই ছাদ আচ্ছাদিত নাট মন্দিরের মত স্থান। প্রাঙ্গণে একটি বটগাছ। মূর্তি অস্পষ্ট। যেন রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত কোন স্তূপ। অধিকাংশে ফুল বেলপাতা দিয়ে ঢাকা। মূর্তির একটি আভাসের উপর কিছু অলংকারও আছে। আসলে মূর্তি হল একখণ্ড খোদাই করা পাথর। মূর্তি কি রকম, পুরোহিতদেরও ধারণা নেই। মূর্তি হয়তো কোন প্রাচীন ভাস্কর্যকলার নষ্টসৌন্দর্য মাত্র। ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন। আকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিদর্শন লুপ্তপ্রায়। কোনকালে কার দ্বারা সংগৃহীত কেউ জানেনা।

· লাভপুরের পীঠকে যাঁরা মানেন না তাঁদের বক্তব্য :— তীর্থক্ষেত্র যদি যথার্থই তীর্থক্ষেত্র হয় তার পাশে কোন উত্তরবাহিনী নদী থাকে। কেতুগ্রামে সেই ধরনের নদী আছে, লাভপুরে নেই। সেই কারণেই লাভপুর পীঠস্থান নয়, কেতুগ্রামই প্রকৃত পক্ষে অট্টহাস। কেতুগ্রামও যে খুব একটা আধুনিক স্থান তা নয়। কারণ, তন্ত্রপীঠ হিসেবে প্রাচীন 'কুব্জিকা তন্ত্রে' এ-পীঠের উল্লেখ আছে।

কুব্জিকা তন্ত্র পীঠনির্ণয় গ্রন্থ (যে গ্রন্থে একান্ন পীঠের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) থেকেও প্রাচীন। রাজা চন্দ্রকেতুর নাম অনুসারে প্রাচীন বহনার নাম হয় কেতুগ্রাম। দেবী হয়তো মূলতঃ আদি নরগোষ্ঠীর কোন দেবী। মূর্তি aniconic, আকৃতি হীন এক টুকরো পাথর— যাতে রূপ আরোপ করে নেওয়া হয়েছে। আদি নরগোষ্ঠীর পৃথ্বী মাতাকে যে ভাবে কল্পনা করে নেওয়া হত সেই ধরনের আর কি।

তবে এ-সবের যে কোন অর্থ নেই তা হয় তো নয়। ইদানীং বৈজ্ঞানিক ভাবেই চর্চা করে দেখা গেছে যে, জড় বলতে কোন কিছু নেই। সর্বত্রই আছে এক ধরনের সূক্ষ্ম প্রাণতরঙ্গ। সর্বত্রই এক ধরনের মানস শক্তি কাজ করে। সেই মানস তরঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গেলে জড়বস্তু এবং উদ্ভিদও সাড়া দেয়। ফলে প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদীরা যে মিথ্যার সাধনা করে গিয়েছিলেন তা নয়। মনকে প্রসারিত করে নিতে পারলে তাদের সাধনার সারবত্তা বোঝা যায়। উদ্ভিদ জীবনের সঙ্গে আত্মিক ভাবে যোগাযোগ করে তাই আধুনিক বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন : "What shocked them (বস্তুবাদী বিজ্ঞানী) most was his (France's) suggestion that the awarness of plants might originate in a suprameterial world of cosmic beings to which long before the birth of Christ the Hindu sages referred as 'devas' and which as fairies, elves, gnomes, sylphs and a host of other creatures, were a matter of direct vision and experience to clairvoyants among the Celts and other sensitives."

## ব

১। বগ্‌-স্বস্তকা : ইনি প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় এক সর্পরাজ্ঞী। সিন্ধু সভ্যতাতে যে-সব মৃত্তিকা ফলক পাওয়া গেছে সেই মৃত্তিকা ফলকের নিচে উৎকীর্ণ চিত্র ও লিপি থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই দেবী সম্পর্কে কল্পনা করেছেন। ফলকের চিত্রটি এই ধরনের : মুকুটধারিণী এক দেবী মূর্তি একটি উচ্চ আসনে বীরাসনে উপবিষ্টা। তাঁর দুই পাশে নতজানু হয়ে জোড়হস্তে দুই ভক্ত দেবীর কাছে সর্প উৎসর্গ করছে। তাদের প্রত্যেকের পেছনে এক একটি ফণধর সর্প তাদের মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। ফলকের পেছনের পিঠে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে লিপিবিদেরা তাকে পাঠ করতে চান 'বস্বস্তক' এই ভাবে। যদি যথার্থ ভাবে পাঠ করা যায় তবে পাঠ করতে হবে এই ভাবে, বৃস্তকা বা বগ্ স্বস্তকা, অর্থাৎ ভগবতী স্বস্তকা।

বৃত্রকা শব্দের অর্থ হল বৃত্তধর্মযুক্তা বা বৃত্তবর্মে সৃষ্টিকারিণী। একটি বিন্দু কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রসারতা লাভ করলে হয় বৃত্ত। ঐ বৃত্তের আপরিধি সর্বাঙ্গের প্রত্যেকটি বিন্দু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, আবার কেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত। বৃত্তের সাধারণ ধর্ম বহির্মুখি হলেও প্রত্যেকটি অঙ্গবিন্দু কেন্দ্র মুখি। এই বৃত্ত চর ও যুগপৎ অচর। এই হল চরাচর বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য বিজ্ঞান।

শব্দ বা বাক্ অর্থাৎ স্পন্দন বৃত্তাকারে ত্রিভুবনময় বিস্তারিত হওয়ায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি পদার্থ ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকটি তরঙ্গে আদিশক্তি বিদ্যুৎরূপে অবস্থিতা। সুতরাং ঐ শক্তি বিদ্যুৎ রূপা হয়ে বৃত্তধর্মী তরঙ্গ রূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও প্রতিপালন করছেন।

সমুদ্রের জলতরঙ্গ দিয়ে শক্তিতরঙ্গের ধর্মের বর্ণনা করা যেতে পারে। কখনও এটা উপরে ওঠে কখনও নিচে নামে, যাকে বলে ভুজগ। তর্ তর্ করে গড়িয়ে এগোয় বলে এর নাম সর্প। আবার ঢেউ উঠতে ও এগুতে কুণ্ডলী পাকায় বলে একে বলে কুণ্ডলিনী এবং হার। কুণ্ডলি পাকিয়ে স্প্রিং-এর মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে এর নাম পৃদাকু। ঢেউ এগিয়ে গেলেও জল যেখানে ছিল সেখানেই থাকে— অর্থাৎ এগিয়ে যায় না— ন + অগ = নাগ। বাস্তব জগতের সাপের মধ্যে এই গুণগুলি দেখা যায়। সুতরাং উপরোক্ত নাগ, সর্প, হার, পৃদাকু, সবই সর্পবাচক সংজ্ঞা।

উপরোক্ত ফলকে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পদার্থে তার জীবনী শক্তি বা সত্তাশক্তি বিদ্যুৎরূপে অবস্থিত। আকাশে যে মেঘে বিদ্যুৎ দেখা যায় তাও সাপেরই মত বৃত্তধর্মী। এই জন্যই ঋগ্বেদে সূর্যরশ্মির অন্তর্নিহিত তড়িৎ শক্তিকে সর্পরাজ্ঞী বলা হয়েছে (ঋ ৩/৫৪/১৫)। অথর্ব বেদে অগ্নি, ওষধি, জল ও বিদ্যুৎজাত সর্পের স্তুতি করা হয়েছে (অথ ১০/৪/২৩)। বলা হয়েছে যে, এই সর্পগুলির দ্বারাই সৃষ্টির ঐশ্বর্য বহুধা বিকশিত হয়— 'বহুধা মহান্তি'।

সুতরাং সৃষ্টির প্রত্যেকটি পদার্থ বা জীবের প্রাণ এবং স্থিতিসত্তাশক্তি হল তার অন্তর্নিহিত বিদ্যুৎ বা তড়িৎশক্তি। এই শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী।

প্রাচীন মগধ দেশে এক ব্রাত্য দর্শন মতাবলম্বী পরাক্রান্ত সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের বিহীন ব্রাত্য বা শুধু ব্রাত্য বলা হ'ত। তাঁরা ছিলেন রুদ্রের উপাসক। যোগসাধক ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। কিন্তু তাঁরা যাগযজ্ঞ বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন সিন্ধু দেশেও ব্রাত্য-সর্পের দর্শন মতাবলম্বী প্রকৃতির উপাসক একটি সম্প্রদায় ছিল। এদের ঋগ্বেদে অহি, কৃষ্ণযোনি, মায়াবিদ্যা বিশারদ বলে বলা হয়েছে। এদের দলপতির উপাধি ছিল বৃত্র। এই মনুষ্যরূপী অহিজাতির দলপতি বৃত্রের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধ হয়েছিল। একটি নদীর বাঁধের উপর বৃত্রকে বধ ক'রে তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হলে বৃত্রের মাতা এসে পুত্রের

মৃতদেহের উপর রোদন করতে থাকেন। আর্যসেনারা এই সময় নদীর বাঁধ কেটে দেওয়াতে মাতা ও মৃত পুত্রের দেহ নদীর জলস্রোতে ভেসে যায় (ঋ ১/৩২/৭, ৮,১০)।

মরমিয়া ঋষিরা বর্তমানে বৃত্রকে মূলাধারে ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী বলে মনে করেন। প্রাণ বায়ুস্বরূপ তাকে তাড়না করলে তা গর্জন করতে করতে উপরে উঠে এবং আবদ্ধ শক্তিস্রোত ছেড়ে দেয়। এই বায়ুকে তাড়না করেন ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ইন্দ্র। এই বায়ুই বা প্রাণবায়ুই ইন্দ্রের বজ্র।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বৃত্র অর্থ করেছেন অবরোধবোধক শক্তি। তাঁরা আকাশের মেঘমালাস্থ বৃষ্টিধারা অবরোধক শক্তিকে বলেছেন কৃষ্ণবৃত্র। তুষারাবৃত নদীর স্রোতধারার অবরোধক শক্তিকে বলেছেন শ্বেতবৃত্র। অবরোধক শক্তি মাত্রই নাগ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারক শক্তি অনন্ত নাগ। প্রত্যেক পদার্থের ধারকশক্তি ব্যষ্টি-নাগ— বাসুকী। সৃষ্টির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এক একটি বিশেষ গুণযুক্ত নাগ আছে। না হলে কোন পদার্থের স্থিতি বাঞ্ছনা হতে পারত না। আধুনিক বিজ্ঞানের অণু মধ্যস্থ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের ধারকশক্তি যেমনও বৈদিক ব্রাত্য বা সর্প।

শতপথ ব্রাহ্মণে সর্পবেদ, সর্পবিদ ও সর্পজাতির উল্লেখ আছে (১৩/৪/৩/৯)। গোপথ ব্রাহ্মণের যুগে প্রাচ্যদেশে সর্পবেদের চর্চা বেশি হ'ত। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ (মগধ), পক্ষীজাতি ও ইর-পাদ অর্থাৎ সর্প জাতির উল্লেখ আছে (২/৫/১/১/২)।

ক্রীটদ্বীপে প্রাচীন কালে পা-যোস নামে সর্পদেবতা ও শাহী (রাজ্ঞী) হ্রাস বা হাইগ্রাস নামক সর্পদেবীর পূজা হ'ত। সুমেরিয়রা বিশ্বাস করত যে, 'গি' নামক পুরুষ ও 'ইরা' নামক নারী সর্প-যুগলের মিলনের ফলেই পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি জন্মে। এই কারণেই পৃথিবীর গর্ভ থেকে শস্যাদি জন্মে। ইরা, ইলা বা ইড়া শব্দের অর্থ পৃথিবী। 'গি' পৃথিবীর স্বামী। তাঁর বাস্তব জগতের স্বরূপ উন্নত ফণাধারী সর্প বা পুরুষাঙ্গের আকৃতি গিরি বা পর্বত। বেদ বা পুরাণে তাই দেখা যায় গিরিকে বলা হয়েছে পিতা ও ইরা বা পৃথিবীকে মাতা।

ঋগ্বেদের তিনটি সূক্ত (১০/১৮৯, ১০/৭৬, ১০/৯৪) সর্পজাতীয় ঋষি বা ঋষিকা কর্তৃক রচিত। এর মধ্যে প্রথম সূক্তটি (১০/১৮৯) সর্পরাজ্ঞী সূক্ত নামে পরিচিত। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন কারণে যজ্ঞাগ্নি নিভে গেলে অগ্নিস্থ সর্পগুলি মনে করে যে, তারা মরে গেছে, তখন সর্পরাজ্ঞী সূক্তটি গান করলে ঐ সর্পগুলি আবার জেগে উঠে এবং যজ্ঞাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে। (২/২/৬) লোকে সৃষ্টিকর্তার সমশক্তি হবার জন্য সর্পরাজ্ঞী সূক্তের মন্ত্রগুলি সাম-ছন্দে গান করে। সর্পরাজ্ঞী শব্দের অর্থ

পৃথিবী।

গ্রীস দেশে সর্পরী জাতীয় লোকেরা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মন্দিরে সাপ রেখে পূজা করত। তারা সর্পদেবতা সাধু ডোমিনিকোর বাৎসরিক উৎসবে দেবতার উদ্দেশে জীবন্ত সর্প উৎসর্গ করত। জীবন্ত সাপ বা ধাতুনির্মিত সর্প অঙ্গে ধারণ করে রাস্তায় শোভা যাত্রা করত।

এই সাপ যে শুধু সাপই ছিল তা নয়। এর একটা মরমিয়া ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ছিল। সর্পাকারা কুণ্ডলিনী জাগরণ যোগসাধন মার্গের একটি বিশেষ সাধনার ধারা। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্বেকার বাবিলনের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগরণের একটি চিত্র পাওয়া গেছে।

সাধকের দেহস্থিত বন্ধনশক্তিরূপ নাগ বা সর্পকে উৎসর্গ ক'রে বিদ্যুৎশক্তি স্বরূপিণী বাক্-বাহিনী ও মনস-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সর্পরাজ্ঞীর পূজো করলে কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপে জাগরিতা হন। সাধক তখন সৃষ্টিকর্তার সমান শক্তি সম্পন্ন হতে পারেন।

এই ধরনের যে সর্প-সাধনা তা প্রাচীনতম যুগ থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। এক ধরনের যোগী শুধু মানসিক সাধনার দ্বারাই এ-কাজ সম্পন্ন করেন। কেউ কেউ আবার স্থূল জীবন্ত সর্পের পূজো করেন। নাথ যোগীদের মধ্যে গোরক্ষপন্থীরা মানসিক সর্প-সাধনা করেন। ভার্তৃহরিপন্থিরা বাস্তব সর্পের সাধনা করেন।

প্রাচ্যদেশেই সর্পপূজা বিষয়ে বিশেষ চর্চা হ'ত। সেই জন্যই বঙ্গদেশে মনসা পূজা ও চীনে ড্রাগন পূজা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গীয় গীতিকাব্য মনসার ভাসান মতে সর্পরাজ্ঞী মনসাদেবী হলেন জাগতী, জগতের মা (তিব্বতের গ্র-ডম-গ্রা- মাও-এর অনুরূপ)। তিনি বাকবাহিনী বা বাগ্বাহিনী (ঋগ্বেদের সসর্পরী বাক্), কেতকা (সিন্ধু উপত্যকার কতকা ; কেত, কেতি = সৃষ্টি-যোনি)। তিনি বিদ্যুৎস্বরূপিণী হওয়াতে পরম পবিত্র, নিরঞ্জন, বিশুদ্ধ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, প্রাতিভ সংবিৎ রূপিণী। সেই জন্য তাঁর কোন মূর্তি নেই। কিন্তু তাঁকে মুরে অর্থাৎ যন্ত্রে ব্যক্ত করা হয়। সেই জন্য তিনি চেন্ড-মুরী (চেন্ড-পবিত্র, বিশুদ্ধ, মুর = যন্ত্রাঙ্কিত চিত্র)।

এই দেবী অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিণী শক্তি যুগপৎ বহির্বিশ্বে ও শক্তির কেন্দ্রকোষে সৃষ্টিকারিণী। তিনি চোখের এক পলকে বহির্জগৎ এবং আর এক পলকে অন্তর্জগৎ দর্শন করেন। এই জন্য তাঁকে কালী বলা হয়। বাক্ শক্তিই (Black hole থেকে বিস্ফোরণ জাত শব্দ = ওঁ), বিশ্বসৃষ্টিকারিণী শক্তি। তিনি সূর্যদুহিতা (অপরিচ্ছিন্ন জ্যোতি দুহিতা) সসর্পরী বাক্ (ঋ ৩/৫৪/১৬)। তিনি মনের রথে (The world is made of mind stuff - Eddington) চলেন (ঋ ১০/৮৫/১৫)। তিনিই সর্পরাজ্ঞী।

২। **বলৎ :** মধ্যপ্রাচ্যের কয়নানের দেশে 'প্রভু' শব্দকে বলা হ'ত বল্। তার সহধর্মিণীকে বলা হ'ত বলৎ। বাইব্লোস-এর দেবী হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। বলৎকে বলা হ'ত বলৎ-গেবল অর্থাৎ গেবলের দেবী। তাঁর সে মূর্তি ছিল তা ছিল মিশরীয় ধাঁচে। দেবী উপাধিষ্ট। হস্তে ধৃত মৃণালসহ পদ্ম (ভারতীয় বহু দেবীর হাতেও এই পদ্ম দেখা যায়। এটি তাঁদের নির্মলতার প্রতীক, বা কারণ সলিল থেকে স্বয়ংজাতা হবার প্রতীক। পদ্মকে আধুনিক বিজ্ঞানে নিউট্রন-ফিল্ড হিসেবেও ধরা হয়)। মিশরীয় দেবী আইসিসের সঙ্গে তাঁর আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে। মস্তিষ্কের কাছে মিশরীয় ধরনে সর্পও ছিল। সর্প শক্তির প্রতীক। দেবতা বল অর্থাৎ প্রভু বা ঈশ্বরের সঙ্গে একই কারণে সমুদ্র থেকে উত্থিতা বলে তিনি তাঁর ভগিনীও ছিলেন। অপর পক্ষে পত্নীও ছিলেন। এল (ঈশ্বর, কারণ সমুদ্র) ও আশেরথ (ঈশ্বরী, মা) থেকে উভয়েরই জন্ম। তবে বলের পত্নী হিসেবে তাঁকে অনিৎ-ও বলা হয়েছে। অনিৎ ছিলেন যুদ্ধের দেবী। অনিৎ সম্পর্কিত কাব্যে তাঁকে অনেকটা দেবী 'কালীর মত দেখা যায়— তিনি নরমুণ্ড গ্রথিত বস্ত্র প'রে অট্টহাস্য করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ভাই বল (প্রভু)-এর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। আসলে অনিৎ, অস্টার্ট, আনীথ, ইশতার মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন সব দেবীই হলেন বলৎ। কখনও তাঁরা রণদেবী, কখনও শস্যদেবী, কখনও প্রেমের দেবী। বলৎ হলেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন মহামাতৃকাশক্তি।

৩। **বদ্‌ব :** ইনি আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন আইরিশদের এক দেবী। আইরিশ দেবদেবীদের সবাই প্রধানতঃ যুদ্ধের দেবদেবী হলেও দেবীরাই রণদেবী হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তিনটি দেবীর নাম এ-ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে খ্যাত — মররিগণ, নেমন ও মচ্। মাঝে মাঝে দেবী বদ্‌ব এঁদের একজনের ভূমিকা নিতেন, যেমন মররিগণের ভূমিকা। বদ্‌ব শব্দের অর্থ ঝলসানো পাতী। বন্যার দেবী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। দেবতা নেট্-এর তিনি পত্নী ছিলেন। তিনি শত্রু-বিনাশিনীও ছিলেন। অনেকে 'বদ্‌ব' শব্দের অর্থ করেছেন ডাইনী। তিনি নদী পারাপারের পথ পরিষ্কার করেন বলে বিশ্বাস ছিল। এমনও মনে করা হ'ত যে, যে-সকল যোদ্ধার বর্ম তিনি ধুয়ে দেন তাঁদের মৃত্যু অনিবার্য।

৪। **ব-ভুক-চুয়া :** দূর প্রাচ্যে ইন্দোচীনের অন্নামের তিনটি দেবী একত্রে ব-ভুক-চুয়া নামে পরিচিতা। জনগণ এঁদের রীতিমত পূজো করেন। এই তিন মাতৃশক্তিকে লালবস্ত্র পরিয়ে প্রত্যেকটি বৌদ্ধ ও তাও মন্দিরের পাশে ছোট্ট ভজনালয়ে রাখা হয়। অন্নামীরা মনে করেন যে, এই তিনটি মাতৃমূর্তি হলেন প্রকৃতির তিনটি শক্তির প্রতীক, যেমন, অরণ্যের শক্তি, জলের শক্তি ও আকাশ ও বায়ুর শক্তি।

৫। **বহুচরাজী :** গুজরাটের কচ্ছের কাছে অনজার নামক স্থানে বহুচরাজী

নামে এক দেবীর মন্দির আছে। একে বলা হয় দর্পণের দেবী। এই দেবীর কাছে ভক্তেরা দর্পণে প্রতিফলন ও নিজের প্রতিবিম্বেরই পুজো করে। এর হয়তো বিরাট কোন অর্থ আছে। যোগীরা যোগে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে তাকে আত্মদর্শন তুল্য মনে করেন। হিন্দু গৃহীদের সাধারণ নিয়ম এই যে, ঘুম থেকে উঠে আগে দর্পণে নিজেকে দেখে নেবেন। এতে নাকি দিন ভাল যায়।

৬। **বেচরাজী** : গুজরাটের বরোদা অঞ্চলে বেচরাজীর এক মন্দির আছে। এখানে যে মাতৃ পূজা হয় তা সর্বপ্রাণবাদী চরিত্রের। প্রতি সকালে প্রধান পুরোহিত স্নান সেরে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে পঞ্চামৃত দিয়ে মূর্তিকে স্নান করান। বেদ থেকে মন্ত্রপড়া হয়। মূর্তির উপর আবীর ও ফুল চড়ানো হয়। দীপ জ্বালানো হয়। ধূপ ধুনো দেওয়া হয়। পুজোর পর ভোগ চলে। ভোগের সঙ্গে নারকেল থাকে। আগে যে দেবীর কাছে নরবলি দেওয়া হত এ তারই প্রতীক। পুজো শেষে কাঁসর ঘণ্টা বাজানো হয়। দুপুরে আবার ভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। তারপর দেবীকে স্নান করিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। দেবীর উদ্দেশে বলিও দেওয়া হয়। বলির রক্ত বেদীর উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। সেই কারণেই দিনে তিনবার বেদী প্রক্ষালনের প্রয়োজন হয়। আসলে ইনি দেবী কালী।

বেচরাজীর মন্দিরে বলি দেবার জন্য মোষ আনা হয়। আবীর ও ফুল এই মোষের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর একে পুজো করা হয়। এরপর মোষের পিঠে একটি শাদা চাদর চাপিয়ে দিয়ে দেবীর কণ্ঠের মালা তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। মন্দিরের প্রদীপ থেকে একটি প্রদীপ ধরিয়ে এনে মন্দিরের সামনে একটি পাষাণ বেদীতে রাখা হয়। মোষটিকে এর পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

৭। **বনদুর্গা** : বনদুর্গা হলেন অধুনা বাংলাদেশের এক হিন্দুদের আঞ্চলিক দেবী। ময়মনসিংহ জেলায় শিশুদের মঙ্গল কামনায় এঁর পুজো করা হয়। সম্ভবতঃ আদিবাসীদের কোন দেবী। কারণ, দেবীর উদ্দেশে কবুতর ও ছাগল বলি দেওয়া হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই এই দেবীর পুজো করে। অবশ্য পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যে-সব থান ও গ্রামদেবী আছে তার সবগুলোর উৎপত্তিই এই ভাবে নিম্নবর্ণের লোকেদের বিশ্বাস থেকে। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলির এর পেছনে কোন অনুমোদন নেই। পরে অবশ্য এঁরা ভারতীয় মহাদেবীর নাম গায়ে মেখে নিয়েছেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এই ভাবেই কলকাতার কালীঘাটের 'কালী' এবং বিভিন্ন পীঠস্থানের দেবীরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। মহাতীর্থ একান্নপীঠের বিভিন্ন দেবীও বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবী, একটি গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভারতীয় মহাদেবীর মর্যাদা অর্জন করেছেন।

বহু অলৌকিক কাহিনী এই সব থান ও দেবীর সঙ্গে যুক্ত। এই কালীঘাটের দেবী সম্পর্কে এমন সব বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ সাহেবরা পর্যন্ত তাতে বিশ্বাস

হয়েছেন। কোম্পানীর আমলে বহু ইংরেজ কালীঘাটে মাঁয়ের পুজো দিতেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় দেবী সম্পর্কে ইংরেজদের বিশ্বাসের নজির পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন "তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড ফ্রেজার (এখন রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) আমাকে লিখিয়াছেন, একবার শিশুপুত্র এন্ডারসনের জ্বর হইয়াছিল, তখন হিন্দু আয়া কালীঘাটে তাহাকে লইয়া গিয়া বলি দেওয়া পাঁঠার রক্তে স্নান করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই নাকি তাহার জ্বর সারিয়া যায়।"— "He got ill. The Ayah took him to Kalighat, a goat was decapitated, he was smeared with blood and mantras were recited. He recovered."

এখনও যদি কেউ নিশীথ রাতে কালীঘাটে কোন যথার্থ সাধকের দেখা পান তা হলে তিনি কিন্তু কালীঘাটের ঐ ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেও অদ্ভুত তত্ত্বের সন্ধান দেবেন। ত্রিকোণাকৃতি মুখটিকে তিনি বলবেন ব্রহ্মযোনির প্রতীক যা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়েছিল। কপালস্থ ত্রিনয়নকে বলবেন পিনিয়াল গ্লান্ড যা দূরদৃষ্টি দেয়। দীর্ঘ বিলম্বিত জিহ্বাকে বলবেন খেচরী মুদ্রার প্রতীক। চার হাতের যে ব্যাখ্যা দেবেন তার অর্থ দাঁড়ায় Black hole- এর বিস্ফোরণের ফলে symmetry Breaking থেকে জাত চারটি শক্তি— Strong nuclear force, Electromagnetic force, gravity ও weak nuclear force. গলার নরমুণ্ড মালাকে বলবেন একান্নটি বিস্ফোরণ জাত স্বতন্ত্র তরঙ্গ। হস্তধৃত মুণ্ডটি সৃষ্টির প্রতীক। মাঁয়ের নাম মাহীশ্বরী। আপনি এমন ধাঁধায় পড়বেন যে, শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝবেন না। আসলে এ-সব মনস্তত্ত্বের স্তরে ঘোরাফেরা করতে না পারলে কিছুই বোঝা যায় না।

৮। বন্দী : ইনি উত্তরপ্রদেশের দোসাধদের এক দেবী। আসলে কোন মহিলার প্রেতাত্মা — যিনি জ্ঞানে গুণে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। শূয়র ও মুরগী বলি দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করার চেষ্টা চলে। মদ্যজাতীয় পানীয় দিয়ে দেবীর বেদী ধুইয়ে দেওয়া হয়। একটা মাটির গোল ঢিবিতে দেবীর বাস বলে মনে করা হয়। সাতকাপ দুধ ও সাতটি পিঠে দিয়ে তাঁকে ভোগ দেওয়া হয়।

৯। বনজারী : ভারতবর্ষে ভ্রাম্যমান এক শস্যব্যবসায়ী জাত আছে যাদের বলে বনজার। সম্ভবতঃ এরা দ্রাবিড় জাতীয়। তবে বর্তমানে এরা উত্তর ভারতীয় রাজপুত বলে নিজেদের দাবি করে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় এদের দেখা যায়। মধ্য প্রদেশের ছত্তীশগড় এলাকায় এদের নিজস্ব উপজাতীয় দেবী আছেন। তাঁর নাম বনজারী। এই নরগোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তির তিনি ব্যক্তিরূপ। একটি পাথরের মধ্যেই দেবী থাকেন বলে বিশ্বাস। দেওয়ালীর সময় পাথরটিকে সিঁদুর চর্চিত করা হয় ও সেখানে দীপ জ্বালানো হয়।

১০। **বনসন্তী, বনসতী বা বনসুরী :** ভারতীয় আদি নরগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু দেবী আছেন। আসলে তিনি একই মহাদেবী, কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন নাম, যেমন, ওরাঁওদের ঝোপদেবী সরনা বুরহী, মুণ্ডাদের দেশওয়ালী অর্থাৎ অরণ্যমুক্ত ভূমির দেবী। তেমনই উত্তর প্রদেশের অর্ধসভ্য মুসাহরদের এক দেবী আছেন যার নাম বনসপ্তী (সম্ভবতঃ সংস্কৃত বনস্পতি, অরণ্যের অধিপতি শব্দ থেকে এসেছে)। তাঁকে বনসতী বা বনসুরীও বলা হয়। বিশ্বাস এই যে, তাঁর নির্দেশেই বৃক্ষে ফল ধরে। মাটিতে কন্দ জাতীয় খাদ্য তাঁর কৃপাতেই হয়। তাদের খাদ্য গোধিকা, নেকড়ে বাঘ, শেয়াল ইত্যাদি এই দেবীর কল্যাণেই বংশ বৃদ্ধি করে। শিশুদের জন্ম হয় এই দেবীর আশীর্বাদেই। বন্ধ্যা নারীরা তাঁরই কাছে সন্তান প্রার্থনা করে। ওঝারা এই দেবীর প্রসাদেই ভূতগ্রস্তদের দেহ থেকে ভূত ছাড়ায়। বনসতীর নামে যে মিথ্যা শপথ নেয়— তার দুঃখের অন্ত নেই।

ঘরের এক কোণায় দেবীর মাটির বেদী থাকে। নদীর জল ও গোবর দিয়ে তা নিকানো হয়। দেবীর কোন মূর্তি নেই। দেবীকে পূজা দেওয়া হয় সাধারণ ফল, ঘাস, কন্দ ইত্যাদি দিয়ে। যদি বিশেষ রকমের কিছু পাবার আশা করা হয়, তবে ভক্ত কুশ ঘাস দিয়ে হাতের আঙুলের অগ্রভাগ চিরে বেদীর উপর রক্ত দেয়। হয়তো প্রাচীন কালে মানুষ বলি দেবার ধারা ধরেই বর্তমান প্রথা এসেছে। প্রতিবছরই লিঙ্গ প্রধান ঘনসাম দেবতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। এই ঘনসাম শব্দটি আসলে ঘনশ্যাম শব্দ থেকে এসেছে। মৌসুমী মেঘের মত যিনি কালো তিনিই ঘনশ্যাম। এই কাহিনী সম্ভবতঃ পরে কৃষ্ণ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। কখনও কখনও ঘনশ্যামের বদলে আসেন ভৈরোঁ - যিনি শিবেরই এক রূপ মাত্র।

১১। **বসন্তী-বুরহী, বসন্তী চণ্ডী :** বসন্তী বুরহী শীতলা দেবীরই এক নাম। বসন্তী বুরহী অর্থ বসন্তের বৃদ্ধা দেবী। তাঁকে বসন্তী চণ্ডীও বলা হয় অর্থাৎ নিষ্ঠুর বাসন্তী দেবী। এই সময়ই গুটি জাতীয় রোগ মহামারী আকারে দেখা যেত বলেই দেবীর এই নাম। বঙ্গদেশেই এই নামে তিনি উপস্থিত আছেন।

১২। **বস্তু :** ইনি প্রাচীন মিশরের সিংহমস্তিকা এক দেবী। বস্তুকে বেড়াল দেবীও বলা হ'ত। বস্তুকে বলা হ'ত প্রাচ্যের দেবী। তিনি ছিলেন তাপ ও আলোর ব্যক্তিরূপ। তিনি সূর্যের শত্রুদেরও ধ্বংস করেন বলে বিশ্বাস ছিল। মৃতদের শত্রুদেরও তিনি দূরে রাখেন। প্রাচীন মিশরে মৃতদের সম্পর্কে সব চেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল। সেই জন্যই মিশরে পিরামিড সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সুতরাং সেই মৃতদের শত্রুদের দূরে রাখেন বলে এই দেবীর যে অপরিসীম গুরুত্ব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৩। **বস্তেৎ :** ইনি প্রাচীন মিশরীয় দেবী। এঁর মাথা ছিল বেড়ালের। তবে আলাদা ভাবে নাম না বললে দেবী সেখমেৎ থেকে তাঁকে পৃথক করে দেখা

কণ্ঠস্বর। তিনি যে আবেগের প্রতিনিধিত্ব করতেন তা হল পাশবিক বৃত্তি। বকসতিস নগরে তাঁর যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হ'ত তা খুবই জনপ্রিয় ছিল। অনুষ্ঠান ছিল যৌনধর্মী। পিরামিড-যুগের প্রথম ভাগে শিশকদের প্রাধান্যের কালে এই দেবী গৌরবের উচ্চশিখরে উঠেছিলেন। বেড়ালদেবী হিসেবে তিনি শিকারেরও পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন। পরবর্তী কালে গ্রীক দেবী আর্টেমিসের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখা হ'ত।

দেবী হ্যাথর ও বসতেৎ উভয়েই ছিলেন মাতৃদেবী। সেই জন্য তাদের নগ্না হিসেবে দেখানো হ'ত। হ্যাথরকে তো নর্তকীও বলা হ'ত। বসতেৎ উৎসবে বুবসতিস-এ পুরুষ ও মহিলারা নৌকোয় উঠে সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করত। শহরে নেমেও নাচগান করত এবং শহরের মহিলাদের বিদ্রূপ করত। কেউ কেউ তাদের পরিধানের বস্ত্র ধরে টানাটানিও করত। ফলে সমগ্র অনুষ্ঠান যৌনতার গন্ধে ভরে উঠত।

১৪। বেলন : ইনি প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের এলামাইটদের এক দেবী। এঁকেই রাজা অসুরবনিপল বিলন নামে উল্লেখ করেছেন। অনেকে এই নামের উচ্চারণ ভুল হবে বলে মনে করেন। এই নামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় বেলিলি বা বেলিলি অনলের সঙ্গে। বেলিলি হলেন অতল বা অতল অনলের স্ত্রী। এঁদের অনু ও অনতু বলা হয়েছে। বেলিলি সম্ভবতঃ সূর্য দেবতা তম্মুজের ভগ্নী ছিলেন। এলামাইট ও ব্যাবিলনীয় উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে জানতেন।

১৫। বেলিসম : বেলিসম হলেন প্রাচীন কেল্টদের দেবী। গলদের উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁকে দেবী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হয় তো দেবতা মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের দেবতার সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন। টলেমি তাঁকে মার্সি বলে উল্লেখ করেছেন।

১৬। বেলিৎ : প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের কয়ন ও ফিনিসীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন দেবতা বল, বিল বা বেল। বেল শব্দের অর্থ দেবতার দেবতা অর্থাৎ প্রধান দেবতা। তাঁরই শক্তি বা পত্নীর নাম বেলিৎ। এক সময় দেবতা বেল বা বলের গৌরব পড়ে এলেও বেলিৎ-এর মর্যাদা কখনও হ্রাস পায়নি। বেলের বদলে মধ্য প্রাচ্যে যখন মারডুক দেবতার প্রাধান্য হয় তখন তিনি তাঁরই পত্নী হিসেবে দেখা দেন। প্রাচীন আসিরিয়াতে বেলিৎকে নিয়্রেথ দেবী হিসেবে পূজো করা হ'ত, সম্ভবতঃ অনু বা অসুর (ইরানে ও আদি বৈদিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা অসুর)-এর পত্নী হিসেবে। আসিরিয় ইশতারের ক্ষেত্রেও এই উপাধি প্রযুক্ত হ'ত। রক্ষাকর্ত্রী দেবী হিসেবে বেলিৎ-এর ভূমিকা প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে কখনও শেষ হয় নি।

এই বেলিৎকে অনেকে ভারতবর্ষে দেবী হিংলাজ রূপেও কল্পনা করেন ইনিই কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় অঙ্কিত নন দেবী। একদা মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ

অঞ্চলে তাঁর পূজা হ'ত। কারো মতে ইনিই সুমেরীয় ইন্নিনী, প্যালেস্টিনীয় নিনা ও ঋগ্বেদের ননা। ইনিই হলেন ব্যাবিলনের ইশতার ও অথর্ববেদের রণদেবী ইন্দ্রাণী। ইনিই অথর্ববেদের বাক্, কিস্মৃতির অধিশ্বরী পিত্র্যারাষ্ট্রী। রাষ্ট্রী হলেন রাজ্ঞী— যাকেই মুসলিম শব্দে বলা হয় শাহী বা শাই। উচ্চারণ বেদে অনেকে বলেন কাই। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে দেবতা বলের প্রকৃতির নাম ছিল বেলিৎ বা বালিৎ বা সাইবেলি। উচ্চারণ ভেদে কাইবেলি বা সিবিলি। দেবতা বলের প্রকৃতির নাম অনেকের মতে বালুচী। এই বালুচীর স্থানই বর্তমান পাকিস্তানের বালুচীস্তান। বালুচীস্তানের দেবী হিংলাজই মধ্যপ্রাচ্যের বালিৎ, বেলিৎ বা সাইবেলি বা কাইবেলি বা সিবিলি। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষও বেলিৎ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না।

১৭। **বেলিৎ সেরি** : প্রাচীন ব্যবিলন ও আসিরিয়াতে পাতাল বা মৃত্যুলোকের দেবী ছিলেন এরেশ-কিগল বা অল্লতু। তাঁরই এক মহিলা ভৃত্যের নাম বেলিৎ-সেরি যিনি মৃতদের রেকর্ড রাখতেন। তাঁর ভূমিকা ছিল আমাদের দেশের চিত্রগুপ্তের মত। চিত্রগুপ্ত যেমন কোন দেবতা নন, দেবলোকে মৃতদের হিসেব রক্ষক মাত্র, তেমনই বেলিৎ-সেরিও।

১৮। **বেল্লোন** : বেল্লোন প্রাচীন রোমানদের এক যুদ্ধদেবী। খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৬ অব্দে যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সম্মানে একটি মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁকে ব্যক্তিরূপ দেওয়া হলেও তেমন গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ তিনি প্রাচীন কোন গ্রীক রণদেবীর ছায়া মাত্র। অনেকে তাঁকে ইটালীর সাবাইন জাতির প্রাচীন রণদেবী 'নেরিও' বলে মনে করেন। নেরিওকে দেবতা মঙ্গলের পত্নী হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। মঙ্গল ছিলেন প্রাচীন রোমানদের কাছে সাহস ও বীর্যের প্রতীক। তাঁর পত্নী হিসেবে সেই জন্য বেল্লোনাও রণদেবীর চরিত্র পেয়েছিলেন। তবে ভারতীয় সাধ্বীসতীরা যেমন স্বামী ও পুত্রের রোগ নিরাময়ের জন্য দেবীর (কালী) উদ্দেশে বুক চিরে রক্ত দিতেন, এই দেবীর উদ্দেশে রোমান পুরোহিতেরাও তেমনই কাঁধ চিরে তাঁর বেদীতে রক্তদান করতেন। তাঁর রক্তপিপাসা তাঁকে ভারতীয় মহাদেবী 'কালী ও 'দুর্গার সমতুল্য করে তুলেছিল।

১৯। **বেলতী, বেলতিস, বেলতু** : ইনি মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বল বা বেলের পত্নী। বেলিৎ এবং ইনি একই দেবী।

২০। **বিষহরি** : বিষহরি হলেন সর্পদেবী— আমাদের মা মনসার মতন। বিষহরি অর্থ যিনি বিষ নামান বা হরণ করেন। বিহারে ভূত ছাড়ানো, সর্পবিষ নামানো প্রভৃতি ব্যাপারে এক ধরনের গুণিন আছেন যাঁদের বলা হয় কাথী। এঁদের এক ধরনের ভর হয়। কারো কোন রোগের প্রতিকার বলার আগে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কাউকে সাপে কামড়ালে তাকে বিষহরির কাছে আনা হয়।

এক ঘট-জলের মধ্যে তাকিয়ে গুণিনরা কি দেখেন তাঁরাই জানেন। তারপর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ঘটের জল যদি ন'ড়ে উঠে তবে দেবী এসেছেন বলে মনে করা হয়। তাহলে সাপের বিষ নামবে বলে তারা মনে করেন।

বঙ্গদেশে মনসা বা বিষহরি দেবী যথেষ্ট প্রাধান্য অর্জন করে আছেন। বিশ্বাস, কেউ যদি মনসা পূজা না করেন তাহলে সেই পরিবারের কেউ না কেউ সর্পাঘাতে মারা যাবে। একটি গাছের নিচে (মনসা গাছ) সিঁদুর চর্চিত ঘট বসিয়ে এই দেবীর পূজা করা হয়। ঘটের চারদিকে মাটির সাপ জড়ানো থাকে। একে মনসার ঘট বলে। পদ্মা পূজার সময় ভাদ্র মাসে ঘরে ঘরে এই ঘট দেখা যায়। অশত্থ গাছের নিচেও এই দেবীর ঘট বসানো থাকে। এই দেবীর ভগ্নীর নাম করা হয় জগৎ গৌরী। গোখ্‌রো সাপ ও অন্যান্য সাপের উপর এর কর্তৃত্ব।

২১। **ব্রোডেনওয়েড্ড** : ইনি প্রাচীন কেল্টদের উষাদেবী তুল্য। স্বামীদের গোপন মনোভাব জেনে তিনি প্রণয়িনীদের হাতে তাদের তুলে দেন।

২২। **বুরবি পেন্নু** : ভারতবর্ষের আদি নরগোষ্ঠীর মধ্যে একটি নরগোষ্ঠী হল খন্দ বা খোন্দ। বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার কালাহাণ্ডি, পাটনা ও সম্বলপুর জেলাতে এদের দেখা যায়। অসমেও এরা আছে। এদের প্রধান দেবতার নাম বুরা পেন্নু বা আলোর দেবতা। তাঁর নিজের হাতে তৈরি পৃথ্বীদেবীর নাম ছিল তরি পেন্নু। তরিপেন্নু ছিলেন দুষ্টশক্তির দেবী। বুরবি পেন্নুও ছিলেন এমনই এক দেবী। তিনি ছিলেন নতুন শস্যের দেবী, প্রথম ফসলের দেবী।

২৩। **ব্রহ্মরম্ভা** : দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈলমে যে শিবের মন্দির আছে সেই শিবের পত্নীর নাম মাধবী বা ব্রহ্ম-রম্ভা। এখানে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই পূজো দিতে পারে। কন্নু বীরেরা এখানে তাদের মাথা ও জিব্‌ কেটে শিব ও দেবীকে উপহার দিত। গল্প আছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জ্যোতির্ময় দেহ লাভ করত। তাদের হ'ত তিন চোখ, পাঁচ মুখ ও পাঁচ জিহ্বা। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে মে-মাসের শেষ অবধি এই শিব ও দেবীর উদ্দেশে এখানে বিরাট উৎসব হয়।

২৪। **ব্রনওয়েন** : ইনি প্রাচীন কেল্টজাতির এক উর্বরা শক্তির দেবী। এই দেবীর সঙ্গে একটি জাদু-কটাহ বা কড়াই ছিল। এই কটাহ নৃতত্ত্ববিদদের মতে ভারতীয় দেবীর যোনিতুল্য। এই দেবী উর্বরা শক্তির দেবী হিসেবে যেমন ছিলেন পৃথ্বী-মাতা তুল্য তেমনই ছিলেন প্রেমেরও দেবী। এই দেবীর প্রীত্যর্থে রীতিমত পশুবলি দেওয়া হ'ত। ব্রনওয়েনকে বলা হয় শ্বেতবক্ষা, সমুদ্রদেবতার কন্যা। তাঁকে উত্তর-সমুদ্রের ভিনাসও বলা হয়।

২৫। **ব্রেহকিন্‌** : ইনি প্রাচীন টিউটন জাতি ও বাল্টিক অঞ্চলের স্লাভ জাতিদের এক সর্পদেবী। প্রত্যেককেই তিনি এই বলে সাবধান করে দিতেন, গৃহে সাপ ও ব্যাঙকে আঘাত করবে না।

২৬। **ব্রিগিট** : প্রাচীন কেল্টদের প্রধান দেবতা দগ্দ-এর কন্যা হিসেবে তাঁর পরিচয়। অনেকে তাঁকে দেবমাতা দনুর সঙ্গে এক করে ভাবেন। ব্রিগিটকে জ্ঞানের দেবীও বলা হয়। তিনি কাব্যের দেবী হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধা। কবিরা এই জন্য তাঁকে সম্মান করতেন। সেক্ষেত্রে তিনি আমাদের দেশের দেবী সরস্বতী তুল্যা। ব্রিগিট দেবীর সঙ্গে প্রাচীন রোমান ও গলদের মিনার্ভা দেবীরও অনেক মিল আছে। ব্রিগিটের মধ্যে উর্বরাশক্তি ও অগ্নি-শক্তির একত্র সমন্বয় ঘটেছিল। কখনও কখনও শুধু মহিলারাই তাঁর পূজা করতেন।

২৭। **বুয়ানন্ন** : প্রাচীন কেল্টদের প্রধান দেবতা দগ্দ-এর পত্নীর তিন ধরনের নাম ছিল— অনু, দনু ও বুয়ানন্ন। এঁদের বলা হ'ত দেবতা ও বীরদের মাতা। কেল্টরা এই ভাবে একসঙ্গে একদল মাতৃদেবতার নাম উচ্চারণ করতে ভালবাসত। এঁরা অত্যন্ত ভয়ঙ্করী ছিলেন। তবে এঁরা উর্বরা শক্তির দেবীও ছিলেন এবং সেই অর্থে পৃথ্বী-মাতা। এঁরা আবার প্রেম, প্রণয় অর্থাৎ যৌনতার দেবী হিসেবেও পরিচিতা ছিলেন। এঁদের ফর্সা মহিলা বলা হ'ত। অনেক সময় মানুষের সঙ্গেও তাঁদের প্রেম প্রীতি হ'ত, যে প্রীতি মধ্য প্রাচ্যের দেবী ইশ্‌তারের মধ্যে লক্ষ করা গেছে।

২৮। **বুতো, উতো** : ইনি প্রাচীন মিশরের এক জাদুকরী দেবী। তাঁকে বেরেৎ হীকেও বলা হ'ত। হীকে অর্থ জাদুরীতি। প্রাচীন মিশরীয়রা জাদু-শক্তিতে এতই নির্ভরশীল ছিল যে, এই শক্তি ব্যতীত জীবনকে অর্থহীন বলে মনে করত। এই দেবীকে মিশরের উর্ধ্ব অঞ্চলের দেবীও বলা হ'ত।

২৯। **বাক্** : ইনি ঋগ্বৈদিক এক দেবী। একে বাক্যের অধিশ্বরী বলা হয়। ঋগ্বেদে স্পন্দন বা শব্দের অন্তর্নিহিতা শক্তিকে বলা হয়েছে প্রকৃতি বা শক্তি। তাঁর নাম বাক্, গৌ, গায়ত্রী ইত্যাদিও। বাক্-গায়ত্রীর প্রথম স্ফুরণ ধ্বনি হল হিঙ্ (ওম্/ওঁ/ব্যোম্ = বিস্ফোরণের শব্দ)। এই জন্য দেবী হিংলাজ (হিঙ্‌লাজ)-কে অনেকে দেবী বাক্ বলে মনে করেন। তিনিই জ্যোতিস্বরূপা। বিস্ফোরণের ফলে যে জ্যোতি বিকিরিত হয়েছিল সেই জ্যোতি। বাক্ই আদি শক্তি, শব্দ ব্রহ্মণ। শব্দ মানে বর্ণ অর্থাৎ এক ধরনের তরঙ্গ। এই ধরনের একান্নটি তরঙ্গই সংস্কৃতে একান্নটি বর্ণ হয়েছে। আদি বর্ণ অনুচ্চারিত। কিন্তু পঞ্চাশটি বর্ণ উচ্চারিত। এই একান্নটি তরঙ্গই বিশ্বসৃষ্টি করেছে বলে বিশ্বাস। এই বর্ণতরঙ্গ অত্যন্ত ছন্দময়। এই বর্ণতরঙ্গ এক মাত্রীয় একটি সূত্রে তরঙ্গ তুলে বিশ্বসৃষ্টি করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানে একে বলে Superstring. এই Superstring-ই বাক্‌কে সরস্বতী রূপে কল্পনা করে তাঁর হাতে বীণা তুলে দিতে সাহায্য করেছে। এই তরঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে জীবন ছন্দপূর্ণ হয়, শিরাধমনায় ভরে উঠে ও পূর্ণ জ্ঞান হয়। জ্যোতিরূপে দেখাবার জন্য তাই সরস্বতীকে শ্বেতবর্ণে দেখানো হয়েছে। Superstring বুঝাবার

জন্য তাঁর হাতে বীণা দেওয়া হয়েছে। পূর্ণ জ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিতা দেবী হংসবাহনা হয়েছেন। হং (শ্বাস) ও স (প্রশ্বাস) উভয়ে একত্রে সাম্যে থাকলে কুম্ভক হয়। ফলে পূর্ণ জ্ঞান জন্মে। এই জন্যই পূর্ণজ্ঞানী সাধকেরা পরমহংস বলে গণ্য হন, দেবী সরস্বতী হংসবাহনা হন। এই বাক্ই ভারতে বাগ্দেবী বা সরস্বতী হয়েছেন।

৩০। **বাজর মাতা :** বাজর মাতা হলেন রাজপুতনার ভিলদের এক দেবী। ইনি শিবের পত্নী বলে বিশ্বাস। নিঃসন্তান মহিলারাই সন্তান কামনায় এই দেবীর পূজো করেন। মনস্কামনা পূরণের জন্য দেবীর কাছে ছাগল বলি দেওয়া হয়।

৩১। **বজ্রধাত্রীশ্বরী :** পরমশূন্যতারূপী যে বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধ, বজ্রধাত্রীশ্বরী হলেন তাঁরই পত্নী। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রে এই দেবীর অপরিসীম মূল্য আছে।

৩২। **বন্থ :** প্রাচীন ইতালীর ইউট্রাসকানদের ইনি ভাগ্যের দেবী। তিনি কার ভাগ্যে কি ঘটবে তাঁর নথি রাখেন, আমাদের দেশে যেমন বিধাতা কপালে লোকের সারা জীবনের ভাগ্য লিখে দেন। তিনি মৃত্যুদেবী হিসেবেও বোধ হয় স্বীকৃতা হতেন।

৩৩। **বারাহী :** ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার রূপ ধরে পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন তাঁর শক্তি বারাহী হিসেবে পরিচিতা হয়েছিলেন। তবে একান্ন শাক্ত পীঠের পঞ্চসাগর তীর্থে শাক্তদেবী হিসেবেও তিনি বারাহী নামে অধিষ্ঠান করছেন। না হলে বরাহ অবতারের পত্নী হিসেবে তাঁর বৈষ্ণবী হওয়া উচিত। তবে বৌদ্ধ দেবীও বারাহী নাম ধারণ করে আছেন এমন পাওয়া যায়। যেমন, বৌদ্ধ সাধন মালাতে বজ্রবারাহী নামে এক দেবীর উল্লেখ আছে।

৩৪। **বারুণী :** সমুদ্র মন্থনে যত দেবী উঠেছিলেন বারুণী তাঁদের মধ্যে একজন। বরুণদেবতার সুরা বা মদকেও বারুণী বলা হয়। কেউ তাঁকে বলেছেন বরুণ দেবতার কন্যা, কেউ পত্নী।

৩৫। **বৃদ্ধেশ্বরী বা বৃদ্ধিশ্বরী :** বৃদ্ধেশ্বরী অর্থ বৃদ্ধা রাণী। ব্রাহ্মণরা এখন তাঁকে দেবী দুর্গার অংশ বলে মনে করেন। কোন রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে এই দেবীকেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা রক্ষা কালী, ভদ্র কালী, কালী ইত্যাদি কল্যাণময়ী নামে পূজো দেয়। বিহারে তাঁকে ক্ষেমকরী নামে ডাকা হয়। ক্ষেমকরী অর্থ যিনি আশীর্বাদ দান করেন। মধ্যপ্রদেশে ইনি গ্রামদেবী হিসেবে সংক্রামক ব্যাধি দূর করেন। রুগীর দেহে তাঁর অধিষ্ঠান ঘটে বলে লোকেরা মনে করে। সেইজন্য যে ঘরে রুগী থাকে কেউ সেই রুগীকে দেখতে গেলে জুতো খুলে সেই ঘরে ঢোকে।

৩৬। **বিরাজ :** অথর্ববেদে (৮ : ১০) বিরাজ নামে এক দেবীর উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের মতে এই বিরাজই ছিলেন মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মানুষ এঁর থেকেই

তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ দোহন করে নিয়েছে। মানুষ তাঁকে লক্ষ্য করে এই ধরনের প্রার্থনা জানিয়েছে, "হে অন্নপূর্ণা দেবী এখানে অধিষ্ঠান করুন। বিবস্বত-এর পুত্র মনু হলেন আপনার বৎসা তুল্য। পৃথিবী দুগ্ধপাত্র তুল্য। বেনের পুত্র পৃথি আপনাকে দোহন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই চাষবাস ও শস্যাদি দোহন করে নেওয়া হয়েছিল।"

পৃথি বা পৃথুকে নিয়ে এই ধরনের গল্প আছে : ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়ে পৃথু তাঁর প্রজাদের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। তিনি পৃথিবীকে কর্ষণ করলেন। পৃথিবী গাভীর রূপ ধরে স্বর্গাঞ্চলে বিচরণ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি ধরা দিলেন এবং দুগ্ধ দান করে ভূমিকে উর্বরা করতে রাজি হলেন। এই গাভীই বিরাজ। পৃথু পাহাড় পর্বত উপড়ে ফেললেন। বৎসা হিসেবে স্বায়ম্ভুব মনুকে তৈরি করলেন। তিনি পৃথিবীকে দোহন করলেন। নানা ধরনের শস্য সমারোহে ধরণী ভরে উঠল। মৃত্তিকাতে পৃথু এইভাবে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন বলে মৃত্তিকা পৃথিবী নামে পরিচিতা হলেন। এর পর থেকে সকল প্রাণীই তাকে দোহন করতে লাগল।

৩৭। বঘাই দেবী : ভারতের অরণ্যবাসীরা বাঘকে পূজো করে থাকে। বিন্ধ্যাঞ্চলে ও কৈমুর পাহাড় অঞ্চলে বাঘীশ্বর নামে এক বাঘের দেবতার পূজা করা হয়। সাঁওতাল ও কিসানরা বনরাজা অর্থাৎ বনের রাজা নামে এঁর পূজো করে। তাদের ধারণা, বাঘের পূজো করা হলে বাঘ তাদের খাবে না। কুরকু উপজাতীয়রা বাঘদেও বা বাঘ নামে এক দেবতার পূজো করে। মহিলা বাঘ বঘাইদেবীরাও তারা পূজো দেয়। তাদের এক ধরনের পূজারী আছে যাদের বলে ভূমক। তারা এমন মন্ত্র জানে বলে বিশ্বাস, যার বলে নিজেরাতো আক্রান্ত হয়ই না তাদের দিয়ে যারা পূজো করায় তারাও বাঘের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়। এরা বিশ্বাস করে যে, দুষ্ট কিছু লোকই মনুষ্যবেকো বাঘে পরিণত হয়।

## ভ

১। ভগবতী : ইনি উত্তর ভারতীয় দ্রাবিড় জাতীয়দের এক দেবী। রোগশোক অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে তাঁর সাহায্য চেয়ে পূজো দেওয়া হয়। বিহারের গন্দোঁতারা এঁকে বলে জগদম্বা— অর্থাৎ বিশ্বজননী। ভগবতী হিসেবে এই দেবীকেই বিবাহসাদি, রোগশোকের সময় পূজা দেওয়া হয়। আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞরা এঁকে আরও বৃহত্তর অর্থ দান করেন। 'ভগ'-এর যিনি অধিশ্বরী তিনি ভগবতী। ভগ অর্থ যোনি অর্থাৎ মাতৃশক্তির প্রতীক। সেই অর্থে তিনি বিশ্বজননী। বাঙ্গালীরা ভগবতী বলতে দেবী দুর্গাকেই বুঝে থাকে। প্রচীন ইন্দোচীনেও এই দেবীর পূজার

ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই দেবীকে তারা বলত পো-নগর। পো-নগর অর্থ রাষ্ট্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিস্তৃত জানার জন্য দ-বর্গের দেবী 'দুর্গা' দেখুন।

২। **ভাগীরথী** ঃ গঙ্গারই এক নাম ভাগীরথী। কপিল মুনির শাপে ভস্ম হওয়া পিতৃপুরুষদের গঙ্গাস্পর্শে মুক্ত করার জন্য রাজা ভগীরথ স্বর্গ থেকে পতিতপাবনী এই গঙ্গাকে এনেছিলেন। তিনি এই নদীকে মর্ত্যে এনেছিলেন বলে এই দেবীর নাম হয়েছে ভাগীরথী। গঙ্গাকে হিন্দুরা দেবী হিসেবে মান্য করেন। সেইজন্য এই ধরনের প্রার্থনা আছে ঃ "জয় জয় দেবী ভাগীরথী গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে।" গঙ্গা অংশ দ্রষ্টব্য।

৩। **ভৈরবী** ঃ ভৈরবী অর্থ ভয়ঙ্করী। শিবকে বলে ভৈরব। ভৈরব অর্থ ভয়ঙ্কর। তাঁরই সহধর্মিণীর নাম ভৈরবী। সুতরাং তিনি ভয়ঙ্করী। তবে তন্ত্রালোকে অভিনব গুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন তাতে ভৈরব ভয়ের কিছু নয়। ভৈরব অর্থ ভীষণ। কিন্তু তিনি সেই অর্থে ভীষণ নন যে অর্থে আমরা শব্দটিকে নিই। যিনি সুখদুঃখাত্মক সংসার থেকে জগৎকে মুক্ত করেন তিনি মহাভীম বা ভীষণ। সুতরাং তাঁর শক্তি ভৈরবী যথার্থই কোন ভয়ঙ্করী দেবী নন।

নেপালে গল্প আছে যে, চারজন ভৈরবী পান করার জন্য পর্যাপ্ত রক্ত না পাওয়াতে নেপালে রাজতন্ত্র তৈরি করেন। শিবের অনুষ্ঠানে নেপালীরা অদ্যাবধি ভৈরবীকে তাঁর নিজের গৃহ দেবীঘাটে নিয়ে আসে। সেখানে দেবীর প্রীত্যর্থে মোষ বলি দেওয়া হয়। এই ধরনের বিশ্বাস থেকেই ভারতীয় মহামাতৃকা দেবী নানাস্থানে ভয়ঙ্করী মূর্তিতে অধিষ্ঠিতা আছেন। নৃতাত্ত্বিকেরা কলকাতার কালীঘাটের কালীকেও এই অর্থেই গ্রহণ করেন। বিন্ধ্যেশ্বরী থেকে চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডিকা, সবাই সেই অর্থে ভৈরবী।

তবে দশমহাবিদ্যা গল্পে ভৈরবীর যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সাধারণ অর্থে ভয়ঙ্করী নন, অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকের তত্ত্ব মতে ভীষণা। ভৈরবী অর্থ ভবের কারণ। মহাসলিল থেকে উঠেছে মহাপদ্ম। সেই পদ্মে আসীনা, পদ্মে পদস্থিতা হলেন চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি। তাঁর উর্ধ্ব বাম ও অধঃ দক্ষিণ করে আশীর্বাদ। উর্দ্ধ দক্ষিণে শঙ্খ এবং অধঃ বামে বেদ। আলোতে জগৎ আচ্ছন্ন করে আছেন ভৈরবী। শক্তির দুই রূপ— কোমল ও প্রচণ্ড। ভৈরবী চণ্ডশক্তি। অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হয়ে তন্ত্রের অষ্টনায়িকা।

৪। **ভারতী** ঃ ইনি ঋগ্বেদের এক দেবী। পরে তাঁকে বাক্-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরও পরে যুক্ত হয়েছেন দেবী সরস্বতীর সঙ্গে। ঋগ্বেদে সরস্বতী ছিলেন নদীর দেবী। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি জ্ঞান এবং বাক্যের দেবী হিসেবে আবির্ভূতা হয়েছেন। এই ভারতী দেবী কাশ্মীরে শারদা নামে পরিচিতা। কাশ্মীরের রক্ষয়িত্রী দেবীই এই শারদা। সেইজন্য কাশ্মীরের এক নাম

ছিল শারদা মণ্ডল। ঋগ্বেদেই তাঁকে মহী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অর্থে তিনি পৃথ্বী মাতাও।

৫। ভিয়রাণী : পৃথ্বী মাতার ভয়ঙ্করী রূপ যখন কল্পনা করা হয়েছে তখন তাকে সাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই হিসেবেই এল্লম্মা, দুর্গম্মা ইত্যাদি দেবীর দেখা পাই। মধ্য প্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে ভিয়রাণী হিসেবে তাঁকে পূজা করা হয়। ভিয়রাণী অর্থ মাটিতে বাসকারিণী। এই হিসেবে গুপ্তধন রক্ষাকর্ত্রী রূপেও সাপকেই ভাবা হয়।

৬। ভূ-দেবী : পৃথ্বী মাতাকে যখন ব্যক্তিরূপ দেওয়া হয়েছে তখন তাঁর মধ্যে দুটো রূপ ফুটে উঠেছে, একটি কল্যাণময়ী রূপ আর একটি ভয়ঙ্করী রূপ। তাঁর কল্যাণময়ী রূপ হিসেবে যত নাম আছে তার মধ্যে একটি নাম ভূ-দেবী। এছাড়া আর যে সব নাম আছে সেগুলি হল ধরতী মাঈ, বসুন্ধরা (ঐশ্বর্যদায়িনী) অম্ববাচী, বসুমতী ঠাকুরাণী ইত্যাদি। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ঘুম থেকে উঠেই তাঁর স্তব করে। মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে তাঁর কোল পাবার জন্য ভূমিতে নামানো হয়। গোবৎসা জন্মালে প্রথম দুগ্ধ পৃথিবী মাতার উদ্দেশেই দান করা হয়।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিনেই তিনি রজস্বলা হন বলে বিশ্বাস। এই সময় ভূমি কর্ষণ বন্ধ থাকে। চতুর্থ দিনে তাকে পরিশুদ্ধা করা হয়। একটি পাথরের দণ্ড মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। উপরিভাগ সিঁদুর চর্চিত হয়। ইনিই ভূ-দেবীর প্রতীক হিসেব কাজ করেন। হলুদ জল দিয়ে গৃহবধূরা এই পাথরটিকে স্নান করায়। কাছাকাছি একটি কাঠের উপর পানসুপারী রাখা হয়। এরপর পাথরটিকে ফুলে ফলে সাজানো হয়।

আগে এই ভূ-দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য বলি দেওয়া হত। এখন বলির বদলে সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়।

প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকায় যে সব মৃত্তিকা ফলক পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটিতে এই ভূ-দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্তিকা ফলকে উৎকীর্ণ লিপিটি এই ধরনের : ফলকের দক্ষিণ প্রান্তে একটি নারী মূর্তি। মস্তক নিম্নদিকে। পদদ্বয় উর্দ্ধ দিকে উত্থিত। উরুযুগল বিস্ফারিত। তাঁর বিস্ফারিত যোনি থেকে শস্যচাড়া নির্গত হচ্ছে। তারপর ছটি অক্ষর। বাঁ দিকে লম্ফপ্রদানপূর্বক দুটি মেষ যুদ্ধরত।

উল্টো দিকের চিত্র এই ধরনের : বাম প্রান্তে দণ্ডায়মান একটি পুরুষের এক হাতে একটি কাস্তে। অপর হস্ত কোমরে ন্যস্ত। তাঁর সামনে আলুলায়িতা কেশা এক রমণী দুই হাত তুলে এবং পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে যেন বিপন্না অবস্থায় ভূমিতে উপবিষ্টা। কাস্তেধারী ব্যক্তিটি যেন তাঁকে বধ করতে বা তাঁর কেশ কর্তন করতে উদ্যত। দুই হাত তুলে মহিলাটি প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ঐ নারীটিই হয়তো পৃথিবী বা ভূ-দেবী। পৃথিবীকে মাতা হিসেবে দেখার

প্রবণতা সেই প্রাচীন যুগ থেকে। ঋগ্বেদের মতে দ্যু-লোক পিতা এবং পৃথিবী মাতা— "দৌর্মে পিতা জনিতা, নাভিরত্র বন্ধুর্মে, মাতা পৃথিবী মহীয়ম" (ঋ ১/১৬৪/৩৩)। অথর্ববেদের মতে পৃথিবী অগ্নিগর্ভা, সুবর্ণ স্তনযুক্ত মাতা, পর্জন্য দেবের পত্নী (অথ ১২/১/২৬, ৪২, ১৯)। পৃথিবীকে নারী রূপে কল্পনা করার প্রবণতা সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই।

মানবজীবনে দেখা যায় নারী যোনিরন্ধ্রপথে গর্ভে পুরুষের বীর্য ধারণ করে। ঐ যোনিরন্ধ্র পথেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ কর্ষণ করে বা খনন করে শস্যের বীজ বপন করা হয়। অর্থাৎ পৃথিবী গর্ভে বীজ ধারণ করে। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ ভেদ করেই ঐ বীজ সন্তান আকারে বাইরে আসে। ভূ-পৃষ্ঠ হল ভূ-দেবীর যোনি বা জননেন্দ্রিয়। এই যোনিপথে তিনি পর্জন্য পুরুষের বৃষ্টিরূপ রেতঃ ধারণ করেন। ঐ যোনি কর্ষণ বা মন্থন ক'রে তাঁর গর্ভে বীজ বপন করা হয়। এবং ঐ যোনি পথেই সন্তান প্রসবিত হয়। অর্থাৎ পৃথিবী মাতা ঊর্ধ্বদিকে ঊরুযুগল মেলে যোনি উন্মুক্ত ক'রে রাখেন। এটাই তাঁর স্বভাব। সিন্ধু উপত্যকার মৃৎফলকে প্রাপ্ত উপরি উক্ত ফলকটি সেকথাই বলে। ঊর্ধ্বদিকে 'বিস্ফারিতা-যোনি' যে মহিলার চিত্র দেখা যাচ্ছে তিনিই ভূ-দেবী।

অথর্ববেদের মতে পৃথিবী অগ্নিগর্ভা। একথা ঠিক যে, পৃথিবীর গর্ভে উষ্ণতা বিদ্যমান। অগ্নি প্রাণ-শক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অগ্নিশিখার গতি লম্ফপ্রদানপূর্বক যুদ্ধরত দুটি মেষের ন্যায়। এর মধ্যে সবসময় একটি দ্বন্দ্ব চলছে। একটি গতি বাইরের দিকে যেতে চায়, আর একটি বহির্গমন রুদ্ধ করতে চায়। পৃথিবী গর্ভে উপ্ত বীজ থেকে শস্য উদ্গত হয়ে ফুল-ফলে ভারাক্রান্ত হবার সময় অনবরত এই ধরনের দুটি মেষের দ্বন্দ্বের মত দ্বন্দ্ব চলে। একটি বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ জন্মে ফুল হয় না, ফল ধরেনা। নবজন্ম ব্যাপী এ জন্য ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্ব চলে। এই দ্বন্দ্বে যে মেষটি বহির্গমন রুদ্ধ করতে চায় তার অবরোধ ব্যর্থ হয়। বৃক্ষ বাড়ে, ফুলফল ধরে।

আলোচ্যমান ফলকের বামপ্রান্তস্থিত মেষযুগলের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ প্রাণাগ্নি শক্তির স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের চিত্র। ফিনিসীয় রাজ্যের উগারিত্ নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন কেনানবাসীদের ভূ-দেবীর যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে ভূ-দেবীর হস্তিদন্ত মূর্তির উভয় পাশে দুটি ছাগল দেখা যায়। হয়তো ছাগল দুটি সিন্ধু ফলকের দ্বন্দ্বরত দুটি মেষতুল্য।

দ্যুলোক ও পৃথিবী সপ্ততল যুক্ত। উভয়ে মিলে চোদ্দ ভুবনের কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবী অগ্নিগর্ভা। তাঁর গর্ভ থেকে শস্যাদির প্রাণাগ্নি শক্তি উদ্ভূত (ভূঃ, ভুর) হয়। তাই পৃথিবীর নাম ভূ, ভূ-মা, ভূ-দেবী। তিনি মঙ্গলময়ী। সেইজন্য মঙ্গলবারের অপর নাম ভূ-বার। পৃথিবী থেকে উদ্গত শস্যাদি আকাশের দিকে

মাথা তোলে। হরপ্পাতে যে বর্ণমালা পাওয়া গেছে তা পাঠ করলে এই ধরনের শব্দ পাওয়া যায়— সপ্ত-ভূ-স্বরী। ডান দিক থেকে বাঁদিকে সাজালে শব্দগুলি এইভাবে আছে— ঋ ঋ উ ভ প্ত স। ই— আকাশবাচক শব্দ। ই— আকাশের প্রতি উন্মুখতা। ঋ— ঋতরশ্মি বাচক। এতে অন্যান্য চিত্রলিপির সাহায্যে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা এই ধরনের :— শস্য উদ্‌গত হয় একটি ছন্দময় গতি দ্বারা, যেমন, কাণ্ডের পর আসে শাখা, শাখার পর পত্র, পত্রের পর পুষ্প এবং পুষ্পের পর ফল। সবই সুনিয়ন্ত্রিত ঋতু ও ছন্দ অনুসারে উদ্‌গত ও বর্ধিত হয়। এর ব্যতিক্রম হলেই সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের বিশ্বাস— ভূ-দেবী মঙ্গলময়ী, স্নেহময়ী জননী। তাঁর গর্ভোৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করেই জীব জীবন ধারণ করে। তবে ঐ দেবীর একটি ভয়ঙ্করী রূপও আছে। ঐ রূপে তিনি রাক্ষসী ও বেশ্যা থেকেও অধম। তিনি চণ্ডালিনী।

বীজ বপন করা হল। পৃথিবী বীজ গর্ভে ধারণ করে সন্তান প্রসব করলেন। ঐ সন্তানরূপ শস্যাদ্বৃক্ষাদিকে নিজের বুকের রস দিয়ে পালনও করলেন। সন্তান বড় হল। যৌবনে পদার্পণ করল। তার মধ্যেও বীজ জন্মাল। ঠিক তখনই স্নেহময়ী জননী তার প্রতি রুষ্ট হয়ে রসপ্রদান বন্ধ করে দিলেন। ফলে সন্তানরূপ শস্য বা বৃক্ষটি মাতৃগর্ভেই ঢলে পড়ল। তিনি রাক্ষসী সেজে ঐ সন্তানকেই উদরস্থ করলেন। ঐ সন্তানের পক্কবীজ নিজের গর্ভে ধারণ করে আবার গর্ভবতী হলেন। এই রূপের চিন্তা করেই দেবীর ভয়ঙ্করী রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগে গ্রীস দেশের পার্শ্ববর্তী বহু দ্বীপে সেইসব দ্বীপরাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন পৃথিবী দেবীর সাক্ষাৎ প্রতিমা। তিনি প্রতি বৎসর এক বীরপুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে সারা বৎসর ব্যাপী তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতেন। আবার বৎসরের শেষে ঐ স্বামটিকে বধ করে নতুন স্বামী গ্রহণ করতেন। এর একটা ইঙ্গিত প্রাচীন বৃন্দাবনের মধ্যেও পাওয়া যায়। বৃন্দাবন অর্থ একদল দেবীর ঝোপ বা কুঞ্জ। এই দেবীদের সঙ্গেও প্রতিবছর একজন মানুষের বিবাহ হত। বৎসর শেষে তাকে বলি দেওয়া হত। এই নিয়ম ভঙ্গ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তবে একটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই নিয়ম থেকে যায়। একটি পবিত্র তুলসী গাছকে বৃন্দার প্রতিনিধি ধ'রে আজও প্রতি বছর কৃষ্ণের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়। হিড়ম্বা বা হিড়িম্বা রাক্ষসীও তারই প্রতীক।

প্রাচীন সুমেরিয় ইরা-ইলা-ইড়া-মাতাই স্থানান্তরে ইড়মা, ইড়, অম্বা, হিড়-মা, হিডম্বা বা হিড়িম্বা রাক্ষসী ও মহামায়ারূপে পূজিতা হয়েছেন। এখনও হিন্দ হিমাচল প্রদেশের কুলু মহকুমার মানালি শহরের ২৩ মাইল উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ডুংরি পর্বতের শিখরে পর্বত্য কানাইতি জাতির পুরোহিতেরা হিড়িম্বা দেবীর পূজা

করে। তাঁর নামে মূর্তি ও মন্দির রয়েছে। দশহরার দিন শোভাযাত্রা করে মূর্তিটি সুলতানপুরে আনা হয়। হিন্দু রাজারা তাঁকে মহামায়া রূপে পুজো ক'রে তাঁর সামনে একটি কালো রঙের মোষ বলি দেন। ঐ অঞ্চলেই মহাভারত বর্ণিত ভীমা দেবীর যোনিস্থান পীঠ প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু মহাকালীর মূর্তিতেও দেখা যায় যে, এক হাতে যোনি থেকে সন্তান বার করছেন অপর হাতে তাকেই ভক্ষণ করছেন।

পৃথিবী দেবীর ঐ রাক্ষসী মূর্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই সিন্ধু উপত্যকার সীল মোহরে ভূ-দেবীর চিত্র দেখা যায়। এখানে যে ভূ-দেবী কাস্তে হাতে পুরুষটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন তিনি ভূ-দেবীর রাক্ষসী রূপ। পক্বশস্য তাঁর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই একটি লোক কাস্তে হাতে অগ্রসর হচ্ছেন। পক্ব শস্য কেটে না নিলেই তা পৃথিবীর গর্ভে যাবে। পৃথিবী বা ভূ-দেবী এখানে রাক্ষসীরূপা।

উত্তর আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসী মায়া ও অ্যাজটেক জাতি শস্য পাকার আগেই একটা কুমারীকে নবজাত শস্যের শীষ দিয়ে সাজিয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থলে রেখে বলি দিত। এর নাম ছিল হইপ উৎসব। অর্থাৎ রাক্ষসী ভূ-দেবীকে ওরা বলি দিত। ভূ-দেবী পূজার এই হল বিচিত্র ইতিহাস।

৭। ভিনাস : ইনি প্রাচীন রোমানদের দেবী। তাঁকে ভিনাস বা ভেনাস-ও বলা হয়। সংস্কৃত 'বনস' শব্দের সঙ্গে এই নামের মিল আছে। এই শব্দ দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দপূর্ণতা, এই সব বোঝায়। আশা আকাঙ্ক্ষার দেবী হিসেবে তিনি যেমন আশাপূর্ণা, তেমনই যৌনতা ও প্রেম প্রণয়ের দেবীও। প্রাচীন গ্রীসের অফ্রোদিত, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ফ্রেয়া, ব্যাবিলনের ইশতার— এঁদের সমগোত্রীয়া তিনি। এক সময় সারা ইটালীতে তাঁর পূজার ধারা প্রচলিত ছিল। তাঁকে উদ্যান বা বাগানের দেবীও বলা হ'ত। গ্রীক দেবী অফ্রোদিতের সঙ্গে এই দেবীর চারিত্রিক মিল থাকাতে অফ্রোদিত রোমে প্রবেশ করলে তিনিই ভিনাসের স্থান নিয়ে নেন। তবে ভিনাস শব্দটি নির্ভেজাল ল্যাটিন। ভারতবর্ষে ভিনাসকে বলে শুক্র গ্রহ। শুক্র কাম-প্রধান,— সেইজন্য সৌন্দর্য ও অন্যান্য শিল্পবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। সেই হিসেবে ভিনাসও সৌন্দর্যের দেবী।

ভিনাসের চিন্তা ইটালীতে বাইরে থেকে এসেছে এরকম মনে হয়না। এই ভিনাস পোম্পে নগরীতেও পরিচিতা ছিলেন। তাঁকে ভিনাস পমসিয়ন বলা হ'ত। ভিনাস নামের মধ্যে একটা আকর্ষণী জাদু আছে। তিনি দ্রাক্ষালতার বৃদ্ধিতেও সাহায্য করতেন বলে বিশ্বাস ছিল। দ্রাক্ষামালঞ্চের রক্ষয়িত্রী দেবী হিসেবে তিনি মালিনী স্বরূপাও ছিলেন। গ্রীস থেকে অফ্রোদিত আসার পরে তিনি তাঁকেই আসন ছেড়ে দেন। অফ্রোদিতই হন ভিনাস।

৮। ভবানী : দেবী দুর্গারই এক নাম ভবানী। মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ের

বৈগারা দেবীকে ভবানী নামেই বেশি পূজো করে। তাঁর স্বামীর নাম দূল্হা দেও। এই দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য তারা নিষ্ঠুরভাবে দেবীর সামনে শূয়র কাটে। বঙ্গ দেশেও যখন আদি নরগোষ্ঠীর কাছে এই দেবী পরিচিতা হন তখন তিনি ভবানী নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ভবানীপুর গ্রামে একান্নপীঠের এক দেবী হিসেবে বিরাজ করছেন। সাধারণতঃ তিনি ভবানী নামেই পরিচিতা। তাঁর ইতিহাস নিলেই দেখা যাবে যে উত্তরবঙ্গের আদি নরগোষ্ঠী এই দেবীর পূজা করতেন। ইতিহাস নিলে এই ধরনের ইতিহাস পাওয়া যাবে :

স্থানটিকে একান্ন শাক্তপীঠ নির্ণয়ক পীঠনির্ণয় গ্রন্থে বলা হয়েছে করতোয়াতট। উত্তর ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে যেমন গঙ্গা বা ভাগীরথী তেমনই একদা উত্তরবঙ্গে ছিল পুণ্যসলিলা করতোয়া। তিস্তা, কোশী আর মহানন্দা একদিন ঘুমিয়ে ছিল এই করতোয়ার বুকেই। যদিও গায়ত্রী মন্ত্রে করতোয়ার নাম নেই, তবুও করতোয়া পুণ্যতোয়া ছিল অনেকদিন থেকেই। মৎস্যনারী সদৃশা নদীদেবী কৌশিকী একদা পূজা পেতেন সমগ্র দেশে অর্থাৎ করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে সমস্ত ভূ-ভাগে। গল্প আছে, দেবাদিদেব মহাদেবের করবারি ভূপতিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল করতোয়া নদী। দেবাদিদেবের করবারি থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলেই ব্রহ্মা নাম রেখেছিলেন করতোয়া। স্কন্দপুরাণে করতোয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে :

"করতোয়ে! সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠেতি বিশ্রুতে।"

হে করতোয়া, তুমি সরিৎ শ্রেষ্ঠা বলে বিশ্রুতা।

"পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।"

হর করোদ্ভবে তুমি প্রতিনিয়ত পৌণ্ড্রদেশকে প্লাবিত করছ, পাপ হরণ করছ।

"ত্বত্তুল্য রূপসী নদী ন কাচিৎ।"

তোমার তুল্য রূপবতী নদী নেই।

"রজো বিহীনা তরুণী যতোসি, ধন্যাসি সবিত্রাসি।"

যেহেতু তুমি তরুণী হয়েও রজোবিহীনা, অতয়েব তুমি ধন্যা ও পুণ্যা।

"শ্রীকণ্ঠ পাণি প্রভবে নমস্তে।"

তোমাকে নমস্কার করি।

এই করোতোয়াতটে এখানকার আদি নরগোষ্ঠীর কোন উপাস্যা মাতৃদেবী ছিলেনই। পরবর্তীকালে মহাতীর্থ একান্নপীঠের গল্পের সঙ্গে স্থানটি জুড়ে দিয়ে অনার্য কোন মাতৃদেবীকে আর্য মন্দিরে তুলে আনার ব্যবস্থা হয়। একটু বিস্তৃত ইতিহাস নিলেই ব্যাপারটিকে বোঝা যাবে।

একান্ন পীঠ নির্ণয়ক গ্রন্থ— 'পীঠনির্ণয়ে' বলা হয়েছে :

"করতোয়াতটে তল্পং (কর্ণো) বামে বামন ভৈরব।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা. করোদ্ভবা।"

অর্থাৎ পুণ্যতোয়া করতোয়ার যেখানে পড়েছে সতীর তল্প অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশের মাংস সেখানে দেবী হলেন অপর্ণা। তাঁর বামে হলেন ভৈরব বামেশ। স্রোতস্বিনী করতোয়া ব্রহ্মরূপিণী। মাহাত্ম্য প্রচার করছেন এই দেবীর।

করতোয়াতটের যে অংশে পড়েছিল দেবীর তল্প, গুলফ বা বামবর্ণ, একদা নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল সে অঞ্চল। এই অঞ্চল ছিল পাবনা জেলার উত্তরে ও বগুড়া জেলার দক্ষিণে প্রায় একশত বর্গমাইল জুড়ে। স্বভাবতই অনুমান করা যেতে পারে যে, অরণ্যচর অনার্য মানুষই ছিল এখানকার অধিবাসী। সম্ভবতঃ নগ্ন জাতি। তাদেরই নগ্না দেবী ছিলেন অপর্ণা অর্থাৎ পর্ণ বা পত্রদ্বারাও যিনি আবৃতা নন— বর্তমানে যিনি ভবানী নামে পরিচিতা। অদ্যাবধি সেখানে দেবীর যা ভোগ তা দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, প্রাকবৈদিক ভারতীয় আদি নরগোষ্ঠীরই তিনি কোন দেবী। প্রতিদিনই দেবীর চাই ছাগ মাংস। তাছাড়া তাদের দিনে তালবড়া বাধ্যতামূলক, তমলুকের বর্গভীমার দেবীর যেমন নিত্য প্রয়োজন সোলমাছ। এই অনার্য মৎস্যদেশ যে প্রাকবৈদিক ভারতীয় আদি জনগোষ্ঠীর বাসভূমি ছিল ইতিহাসেও তা প্রমাণিত।

এই দেবী, আদি নরগোষ্ঠীর নগ্না (অপর্ণা—যিনি পত্রদ্বারা আচ্ছা নন) দেবী, ভবানীপুর গ্রামে অধিষ্ঠিতা আছেন বলে বর্তমানে ভবানী নামেই পরিচিতা। দেবীর দেহাংশ শিলীভূত। নিজের কোন মূর্তি নেই। Aniconic (অবয়বহীন) পাষাণ পূজার এ হয়তো একটি নমুনা। বর্তমানে হাত দেড়েক যে কালীমূর্তি আছে তা পরে তৈরি করা। দেবীর সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। শুধুমাত্র সোনার তৈরি মুখ দর্শনীয়। তবে লোক-বিশ্বাস, যিনি যেমনভাবে তাঁকে দেখতে চান, তেমন ভাবেই তাঁকে দেখতে পান।

এই মহাপীঠের উদ্ভব নাকি সত্যযুগে। তবে দেবী তখন ভবানীপুরে ছিলেন না, ছিলেন গুলফপুরে। একান্ন শক্তপীঠের গল্পে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মনে করেন যে, দেবীর (সতীর) গুলফ পড়েছিল করতোয়াতটের অরণ্য অঞ্চলে। এই জন্য স্থানটির নাম হয়েছিল গুলফপুরী। মহাভারতেও ইঙ্গিত আছে গুলফপুরীর। দ্বাপরের শেষে গুলফপুরীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন শক্তি উপাসক পৌণ্ড্রপতি বাসুদেব। করতোয়াতটে এক সময় কমলপুর নামে গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। বঙ্গদেশে সেন রাজাদের এক জ্ঞাতিবংশ শাসন করতেন সেখানে। ভাগ্য বিপাকে যবনদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় এ জনপদ। কোন এক মহাপুরুষ মাকে তখন লুকিয়ে রেখেছিলেন মাটির গহ্বরে। সেখান থেকে দেবীকে তুলে এনে বসানো হয় ভবানীপুরে। সেও প্রায় ছ'শ বছর আগেকার কথা। ভবানীপুরের

নৈর্ঋত কোণে, মাইল পাঁচেক দূরে আজও আছে সেই গুলফাপুরীর ভগ্নাবশেষ। দেবীকে নতুন করে স্থাপন করা হয় ভবানীপুরে। সেই জন্য শাস্ত্র বর্ণনার সঙ্গে ভৈরবরূপ শিব ও দেবীর অধিষ্ঠানের কোন মিল নেই। শাস্ত্রে আছে ভৈরব বামেশ থাকবেন দেবীর বামে। কিন্তু এখানে তা ভিন্নরকম।

নানা গল্প আছে অপর্ণাকে নিয়ে। প্রায় দেড়শ বছর অন্তরালে থাকার পর যেভাবে তিনি আবার এসেছিলেন লোকচক্ষুর গোচরে সে সবই হল মনোরম কাহিনীর প্রসাদপুষ্ট। করতোয়াতটে এক শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা নিয়ে দেবী ভক্তজনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অস্তিত্বের কথা। করতোয়ার বুক থেকে হাত তুলে ভক্তজনকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি আছেন। একটা গাভীন গরু অরণ্যের ভিতর মৃত্তিকাতে দুধ বর্ষণ করতো। তা দেখেই ভূগর্ভে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় সতীর অঙ্গ।

জগজ্জননী যেখানে তাঁর শাঁখা দেখিয়েছিলেন ভক্তজনকে, আজ সেই পুণ্যতোয়া করতোয়া সেখানে নেই। করতোয়া মজে গেছে। সেই শাঁখার চিহ্ন বহন করার জন্য সেখানে একটি পুষ্করিণী খনন করে রাখা হয়েছে। মন্দিরে গেলে ভক্তজনেরা আজও সেই পুষ্করিণী দেখান। অপর্ণা যে আজ ভবানীতে রূপান্তরিত হয়েছেন তার পেছনেও ইতিহাস আছে। আকবর তখন দিল্লীর অধীশ্বর। টোডরমল আর মানসিংহ বঙ্গদেশে শান্তি আনলেন। রাজশাহী জেলার সাঁতেল গ্রামের রামকৃষ্ণ রায় আপন শ্রম ও অধ্যবসায়ে ভাতুরিয়া ইত্যাদি আটটি বড় বড় পরগণার অধিপতি তখন। আকবরের কাছ থেকে তিনি রাজা উপাধি পান। দেবী অপর্ণার মন্দির তৈরি করার জন্য তিনি আকবর বাদশার কাছ থেকে সনদ পান। সেই সনদে দেবীর থানের উল্লেখ ছিল 'ভবানী-থান' নামে। ফলে দেবী 'ভবানী' নামে নতুন করে অধিষ্ঠিতা হন। দেবীর জন্য রামকৃষ্ণ রায় যে মন্দির তৈরি করেছিলেন সে মন্দির আর নেই। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। গল্প আছে যে, নতুন বাঙ্গালা (মন্দির) এত মনোরম হয়েছিল যে, লোকে সেই বাঙ্গলা তাকিয়ে দেখত। তাতে মায়ের বড় দুঃখ। রাজাকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, তোর নক্সার বাঙ্গালায় লোকে আমাকে দেখেনা। দেখে তোর নক্সাকে। আমাকে পুরানো জোড় বাঙ্গলায় রেখে আয়। স্বপ্ন পেয়ে রাজা তাঁকে পুরানো বাঙ্গলায় রেখে আসেন।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই অজস্র শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন জগন্মাতা সেই মোগল আমল থেকে। আজ একটি পাকা মন্দিরে মা অধিষ্ঠিতা। মন্দিরের সামনে আটচালা এক নাটমন্দির। তার পশ্চিমে ভৈরব বামেশের পাকা মন্দির। আরও কিছু মন্দির আছে আশেপাশে। অবশ্য সবই প্রায় ভগ্ন বা অর্ধ ভগ্ন। কাছেই দু-একটা সাধনপীঠও রয়েছে। সব মিলিয়ে এখনও এখানে একটা অতীন্দ্রিয় পরিবেশ আছে। কাছে গেলে মধ্যযুগ থেকে বয়ে আসা নানা অলৌকিক গল্প শোনা যাবে। তখন

সত্যিই মনে হবে, অতীন্দ্রিয় একটি শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই জগন্মাতা সর্ব ঐশ্বর্যময়ী। তিনি চতুর্বর্গ ফল দান করেন। তিনি মোক্ষদাত্রীও। সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য ও কৈবল্য এই হল পাঁচ রকমের মোক্ষ।

দেবীর সঙ্গে একই লোকে বাস করলে হয় সালোক্য। তাঁর তুল্য রূপ হলে হয় সারূপ্য। তাঁর তুল্য ঐশ্বর্যশালিনী বা ঐশ্বর্যশালী হলে হয় সার্ষ্টি। দেবীর দেহে প্রবেশ করে বিষয় ভোগ করার নাম সাযুজ্য। মহামুক্তি হলে হয় কৈবল্য।

যিনি যেরকম প্রার্থনা করেন, এই দেবীর কাছে তিনি সেইরকম বরই পান। আদি নরগোষ্ঠীর গায়ে এ-সব সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের দার্শনিকদের সংযোজনা।

উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু স্থানে ভাড়িরা (ক্ষত্রীয় পিতার ঔরষ জাত ও ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভজাতদের বলা হয় ভাট়ি) ভবানী দেবীকে মাতৃশক্তির ভয়ঙ্করী দিক বলে মনে করে। এই জন্য রোগাদি মহামারীরূপে দেখা দিলে দেবীকে ভবানীরূপে তারা পূজো দেয়।

ঐতিহাসিকদের ধারণা— এই ধরনের দেবদেবী আদিতে ছিলেন অস্পষ্ট একটি প্রাকৃতিক শক্তি, যাকে অরণ্যচারী আদি নরগোষ্ঠী পূজা করত। যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে এরা যখন কৃষিকর্মে মনোনিবেশ করে তখন এঁরা উর্বরাশক্তির দেবদেবী, গৃহপালিত পশুরক্ষক দেবদেবী ও মানুষের রক্ষক দেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ধীরে ধীরে তাঁরা রূপ গ্রহণ করতে থাকেন। এই সব আঞ্চলিক মাতৃশক্তি ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে দেবীরূপে ও দক্ষিণ ভারতে গ্রামদেবতা ও অইয়নার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। হয়তো কয়েকটি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সীমান্ত অঞ্চলে এমন কিছু কিছু দেবী ছিলেন যাঁরা পূজারী গুণিনদের মাধ্যমে অলৌকিক কিছু শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে তাঁদের খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা ভারতীয় মহামাতৃদেবীর নামে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক দেবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। যেমন, কলকাতার কালী, বিন্ধ্যপাহাড়ের বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, অযোধ্যার দেবী পাটন এবং হায়দরাবাদের তুলজাপুরের ভবানী। এঁদের জাদুক্ষমতা, রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অন্যান্য গ্রামদেবতার চেয়ে বেশি ছিল। ফলে সারা দেশে এঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তুলজাপুরের ভবানী দেবীও এইভাবে আজ ভারত বিখ্যাত।

বিহার উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকার ডোম, যারা মঘইয়াডোম অপেক্ষা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেকটা কাছাকাছি, তারা যে মাতৃশক্তির পূজা করে সেই মাতৃশক্তিকেও ভবানী নামে আহ্বান করে থাকে।

ভারতের যাযাবর কন্‌জর নরগোষ্ঠী ভবানী নামে যে মাতৃশক্তির পূজা করে, তিনি আসলে পৃথ্বীমাতার ভয়ঙ্করী দিক। ভারতের শবর জাতের লোকেরা মাতৃশক্তিকে পূজা করে ভবানী নামে। এই ভবানী দেবীর আরও নানা নাম আছে।

বিশের এক দেবতার তারা পূজো করে যার নাম দুল্‌হা দেও। এ হল কোন তরুণ বর যিনি বাঘের হাতে মারা গিয়েছিলেন। পরে দেবতায় রূপান্তরিত হন। রান্না ঘরেই তাঁর বাস বলে ধারণা। এ রকম আরও কয়েকজন দেবতা আছেন, যেমন বুরহা দেও, বড় রাউল ইত্যাদি। এই নরগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মভুক্ত হলে এই সব দেবতা হিন্দুদের ভৈরব দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রাচীন নরগোষ্ঠীর ভৈরোঁ নামে পৃথ্বী দেবতাও এইভাবে ভৈরবে রূপান্তরিত হন। এদেরই ভবানী মাতৃশক্তি তখন ভারতীয় মহামাতৃকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুর্গা ও কালীর সমান মর্যাদা অর্জন করে। মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীর আরাধ্যা দেবীও ছিলেন ভবানী।

৯। **ভীমাদেবী :** প্রাচীন ভারতবর্ষে ভীমাস্থান নামে হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র ছিল। ভীমাস্থান অর্থ ভীমা নামে কোন মাতৃশক্তির ক্ষেত্র। এই স্থানটি ছিল ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলার শাহবাজগড়ির কাছে। করমর পর্বতশীর্ষে ছিল এই স্থান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিমাচলে ভীমা দেবীর উল্লেখ আছে। পুরাণে দেবীর যে ১০৮টি নাম আছে সেখানেও এমনতর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন 'ভীমাদেবী হিমাদ্রৌতু'।

সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন গন্ধার দেশে অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙই দেখেছিলেন এই ভীমাদেবীকে। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, পলুশের উত্তরপূর্বে ছিল বেশ বড় ধরনের একটা পর্বত। পর্বতটি দেখতে ছিল ঠিক মহেশ্বরের সহধর্মিণী ভীমা দেবীর মত, অর্থাৎ নীলাভ। মায়ের বর্ণের সঙ্গে মিল ছিল বলেই স্থানীয় লোকেরা একে পূজো করত স্বয়ম্ভূ মূর্তি বলে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মাতৃ-আরাধকেরা এখানে এসে পূজো দিতেন ও অনাহারে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল— ভীমাদেবী মানুষের প্রার্থনা শুনতেন। কখনও কখনও নাকি নিজের রূপ ধরে দেখাও দিতেন।

ভীমাদেবীর পর্বতের পাদদেশে ছিল মহেশ্বরের এক মন্দির। সেখানে থাকতেন ভস্মাচ্ছাদিত তীর্থিক অর্থাৎ পাশুপৎ যোগিনরা। তাঁরা পূজা আর্চা করতেন। দেবীর কাছাকাছি এই শিবমন্দিরের বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। এর অর্থ দেবীকে এককভাবে কল্পনা করা হ'ত না কখনও। সঙ্গে ভৈরবরূপে শিবও থাকতেন। তাছাড়া স্বয়ং হিউয়েন সাঙই বলেছেন, দেবী ছিলেন মহেশ্বরের পত্নী।

১০। **ভিক্টোরিয়া :** ইনি এক প্রাচীন রোমান দেবী। প্রাচীনকালে জড়, অজড়, নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা সব কিছুতেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করে পূজো করার পদ্ধতি চালু হয়েছিল। ভিক্টোরিয়া তেমনই এক রোমান দেবী। রোমানরা যুদ্ধজয়কে দেবী কল্পনা করে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করেছিল। তবে স্বতন্ত্র দেবী হিসেবে ভিক্টোরিয়া ঠিক কখন রোমান জগতে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন জানা যায় না।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৪ অব্দে প্যালটাইনে তাঁর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হবার পর তাঁর গৌরব অনেক বেড়ে যায়। রোমে ক্ষমতা লিপ্সু প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেকে কোন না কোন ভাবে এই দেবীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে মনে করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৯ অব্দে অগাষ্টাস শেষ পর্যন্ত সিনেটে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করেন। রোমান পৌত্তলিকরা এই দেবীর ছায়াতেই খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে তাদের শেষযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

১১। **ভিক্টরি** : ইনি এক গ্রীকদেবী। দেবী নাইককেই ভিক্টরি বা যুদ্ধজয়ের দেবী হিসেবে কল্পনা করা হ'ত। কখনও এই দেবীকে পক্ষযুক্ত অবস্থায় দেখা যায় কখনও দেখা যায় পক্ষহীন ভাবে। আলেকজাণ্ডারের আগে ভিক্টরি পূজার ধারা স্বতন্ত্রভাবে চালু হয়নি এবং এই দেবী গ্রীক-পুরাণ কাহিনীতেও স্থান পাননি।

১২। **ভার্জিনস** : ইনি প্রাচীন কেল্টদের এক দেবী। সম্ভবতঃ কোন জলদেবী ছিলেন। কেল্টরা তেমন কোন বিশেষ দেবদেবীর পুজো করতেন না। পরে তাদের অসংখ্য উর্বরাশক্তির দেবী আত্মপ্রকাশ করেছিল। এদের গায়ে প্রেম প্রণয়ের একটা গন্ধ মেখে দেওয়া হয়েছিল, যেমন, ডায়ানা। তিনি ভিনাস দেবীর চরিত্র পেয়েছিলেন। এঁরা মাতৃরূপে এসেছিলেন। এঁদের হাতে শিশুসন্তান দেখা যেত। কাঠ দিয়ে এদের নানা মূর্তি তৈরি হ'ত। প্রাচীন এই মূর্তিগুলির অনেকগুলিই এই কারণে পরবর্তীকালে মাতা মেরীর সম্মান পেয়েছিল।

১৩। **ভিরটাস** : ইনি প্রাচীন এক রোমান দেবী। রোমান সামরিক চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পোম্পের সময় এই দেবীর গুরুত্ব বাড়ে।

১৪। **ভোলটুমনা** : ইটালীর বারটি ইট্রাসকান নগররাষ্ট্রের তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্দিরের দেবী ছিলেন। এঁর ভূমিকা সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না।

১৫। **ভোর** : ইনি প্রাচীন টিউটন জাতির নর্সদের এক দেবী। শপথগ্রহণ ও সন্ধি স্থাপনের সময় এই দেবীর নামে তা করা হ'ত। এতে মনে হয় নর্সদের জীবনে এই দেবীর বিশেষ প্রভাব ছিল।